দাবানল

বিশেষ সংখ্যা : এপ্রিল, ২০১৩

সূচীপত্র :

প্রথম ভাগ : প্রসঙ্গ : চলমান রাজনীতি

পশ্চিমবাংলার রাজনৈতিক সন্ধিক্ষণ : বিপদ ও সম্ভাবনা। পৃষ্ঠা : ৩

দ্বিতীয় ভাগ : প্রসঙ্গ : আঞ্চলিক ক্ষমতা

(এক) আঞ্চলিক ক্ষমতা প্রয়োগের নতুন ধরন : কেরালার পরিস্থিতি। পৃষ্ঠা : ১৯

(দুই) স্থানিয় ক্ষমতা প্রয়োগের নতুন ধরন : পরিপ্রেক্ষিত পশ্চিমবঙ্গ। পৃষ্ঠা : ২৯

তৃতীয় ভাগ : বিপ্লবী তাত্ত্বিক দিশা।

(এক) মাওবাদী পার্টি : অজিত। পৃষ্ঠা : ৩৯

(দুই) দুই লাইনের লড়াইয়ের পার্টি : মাওবাদী দৃষ্টিকোণ। পৃষ্ঠা : ৪৪

চতুর্থ ভাগ : প্রসঙ্গ : অর্থনীতি

(এক) "বুর্জোয়াদের উপর সর্বাত্মক একনায়কত্ব প্রয়োগ করা প্রসঙ্গে" : চ্যাং চুন চিয়াও। পৃষ্ঠা : ৪৯

(দুই) চিনা বিকাশ : আজ - কাল - পরশু। পৃষ্ঠা : ৫৫

পঞ্চম ভাগ : আহ্বান

(এক) ব্রাহ্মণ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম প্রসঙ্গে। পৃষ্ঠা : ৬২

(দুই) বিশ্বের মার্কসবাদী-লেনিনবাদী-মাওবাদী পার্টি ও সংগঠনগুলির এক আন্তর্জাতিক সম্মেলনের জন্য। পৃষ্ঠা : ৬৩

(তিন) নেপালের কমিউনিষ্ট পার্টি – মাওবাদীর সপ্তম কংগ্রেসের উদ্দেশ্যে সি পি আই (এম-এল) নকশালবাড়ির বার্তা। পৃষ্ঠা : ৬৫

ই মেল : dn_2013@rediffmail.com

সম্পাদকীয়র বদলে

দাবানল : আত্মকথা

পরিস্থিতির দাবি মেনে 'দাবানল'-কে উসকে দেওয়া হল। চারিদিকে একটা বিভ্রান্তি সাজানো হয়েছে : সব্বাই গল্পের আলিবাবা। আর সমাজটা হল সোনা-হীরে-মনিমুক্তো বোঝাই চল্লিশ চোরের গুহা ! যে যত পার বস্তা বোঝাই করে নাও ! কারণ জীবনের লক্ষ্য : মস্তি আনলিমিটেড ! চারিদিকে মহাশোরগোল উঠেছে – হয় মানিয়ে নাও, নয়তো হারিয়ে যাও ! চলতি আড়াই দশকে মানুষ যেমন সুখী, এমনটা নাকি আর কখনো ছিল না ! বলা হচ্ছে, তোমার জন্য সবই আছে - "শুধু তুমি জানতি পার না" ! শুধু আর টি আই ফাইল করো – ঠিক উকিল আর ঠিক মুহুরিকে টাকা গেলাও সব পেয়ে যাবে ! ... কিন্তু কথায় বলে না জীবন উপন্যাসের চেয়েও চমকপ্রদ আর আকর্ষণীয়। তাই বিভ্রান্তির পর্দা ফাঁস হয়ে যাচ্ছে প্রতিদিন ! ধর্ষণের প্রতিবাদে উত্তাল দিল্লিকে মনে হচ্ছে তাহরির স্কোয়ার। মানুষের মনে দীর্ঘদিনের জমা ক্ষোভ হঠাৎ হঠাৎ সবাইকে চমকে দিয়ে ফেটে পড়ছে। পাহাড় বাঁধা পড়তে চাইছে না মমতার আঁচলে ! লালগড় আবার জেগে ওঠার 'দুঃস্বপ্নে' চমকে উঠে ঘুম ভেঙে যাচ্ছে শাসকশ্রেণির ! ছত্তিশগড় – গড়চিরোলি মাঝে মাঝেই উঠে আসছে খবরের শিরোনামে ! সাময়িক থমকে যাওয়ার পর্ব পেরিয়ে পস্কোকে ঘিরে আবারও শুরু হতে চলেছে বড় মাপের লড়াই। একদিকে এলাকাভিত্তিক রাজক্ষমতা দখলের বিপ্লবী সশস্ত্র সংগ্রাম – অন্যদিকে জনগণের দেশ কাঁপানো স্বতস্ফূর্ত বিক্ষোভ সংগ্রাম - দুয়ে মিলে তৈরি হচ্ছে সত্যিকারের পরিবর্তনের এক অভিন্ন পরিপ্রেক্ষিত। "দাবানল" নিজেকে এই পরিপ্রেক্ষিতেরই শরিক বলে মনে করে।

একমাত্র শাসকদল এবং তার তল্পিবাহকরা ছাড়া সকলেই মানছেন যে, গত পৌনে দুবছরের মেয়াদেই পশ্চিমবঙ্গে "পরিবর্তনের" রং একেবারে ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। কেন এমন হলো ? কিভাবেই বা হলো ? পরিস্থিতির বিপদগুলি কি কি ? সেগুলিকে ছাপিয়ে সম্ভাবনার দিকগুলিই বা কি কি ? পরিবর্তনের বিপ্লবী দৃষ্টিকোণ ঠিক কিরকম ? এসব প্রশ্নে উত্তর খোঁজার চেষ্টা হয়েছে "পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক সন্ধিক্ষণ : বিপদ ও সম্ভাবনা" লেখায়। এই লেখাটাই পত্রিকার প্রথম ভাগ : চলমান রাজনীতি।

আমাদের দেশে সাম্রাজ্যবাদ ও মুৎসুদ্দি আমলাতান্ত্রিক পুঁজিবাদ কিভাবে পুরাতন ধরনের জাতিবাদী সামন্ততন্ত্রকে নতুন রূপে পুনর্গঠিত করে নয়া জোতদার শ্রেণির হাতে আঞ্চলিক ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করছে এবং তার রাজনৈতিক তাৎপর্যই বা কি – এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজার জন্য বিপ্লবী গণ রাজনৈতিক সংগঠন স্ট্রাগল্ ইন্ডিয়া এবং গণ মুক্তি সংগ্রাম -এর যৌথ উদ্যোগে গত ২০১১ সালের নভেম্বর মাসে কলকাতায় একটি জাতীয় আলোচনা সভার আয়োজিত হয়। পত্রিকার দ্বিতীয় এবং তৃতীয় লেখা হলো এই প্রশ্নে যথাক্রমে কেরালা ও পশ্চিমবঙ্গের প্রেক্ষাপটকে ঘিরে। এই দুটি লেখা মিলে পত্রিকার দ্বিতীয় ভাগ : আঞ্চলিক ক্ষমতা।

পত্রিকার তৃতীয় ভাগ:বিপ্লবী তাত্ত্বিক দিশা। এই অংশের প্রথম লেখা "মাওবাদী পার্টি"। thenaxalbari.blogspot.com থেকে লেখাটি নেওয়া। লেখাটিতে দেখানো হয়েছে কমিন্টার্ন ধরনের কমিউনিষ্ট পার্টির মনোলিথিক পার্টি ভাবনার ঐতিহাসিক পশ্চাদপট কি ছিল – একেবারে লেনিন-স্তালিন থেকে মাও সে তুং পর্যন্ত এই প্রশ্নে বির্তকটি কোন্ খাতে প্রবাহিত হয়। মাওবাদ এই বিতর্কটিকে কোন্ উচ্চতায় তুলেছে এবং আমাদের কমিউনিষ্ট অতীতের ইতিবাচক দিকগুলিকে বিন্দুমাত্র খাটো না করে কেন বিপ্লব সম্পন্ন করার কমিউনিষ্ট পার্টিকে মাওবাদীই হতে হবে। দ্বিতীয় লেখা "দুই লাইনের লড়াই : মাওবাদী দৃষ্টিকোণ"। মাওবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিশেষত্ব হলো দুই লাইনের সংগ্রাম। ঠিক কোথায় কোথায় এবং কেন এই বিশেষত্বটি কমিউনিষ্ট আন্দোলনের মনোলিথিক পার্টি ঘরানার তুলনায় এক উচ্চতর বিকাশ হিসাবে চিহ্নিত হওয়ার যোগ্য – সাংস্কৃতিক বিপ্লবের আলোয় তার উত্তর খোঁজার চেষ্টা হয়েছে।

পত্রিকার তৃতীয় ভাগ : প্রসঙ্গ রাজনৈতিক অর্থনীতি। এই বিভাগের প্রথম লেখা চ্যাং চুন চিয়াওয়ের "বুর্জোয়াদের উপর সর্বাত্মক একনায়কত্ব প্রয়োগ করা প্রসঙ্গে"। চ্যাং চুন চিয়াও সর্বহারা সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সামনের সারির যোদ্ধা। চিনে পুঁজিবাদ ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে তেং শিয়াও পিং চক্রের প্রতিবিপ্লবের অন্তর্বস্তু বুঝতে লেখাটি একটি মাইলফলক। এই বিভাগের পরের প্রবন্ধ চিনকে ঘিরে সাম্রাজ্যবাদ ও তার দোসর শোধনবাদীরা যে উপকথা ঘনিয়ে তুলেছে, তাকে বিস্ফোরিত করা হয়েছে। দেখানো হয়েছে সমাজতন্ত্রের - মাওবাদের আদর্শ থেকে দুর্গন্ধময় নর্দমায় নেমে আসা এই চিন মোটেই বিশ্বমন্দার প্রত্যুত্তর নয়। চিনের প্রসাধনিক উন্নতির পিছনে কত অযুত শ্রমিক কৃষকের চোখের নোনাজল আর মেহনতের রক্ত ঘাম কাজ করে চলেছে বাস্তব ঘটনা থেকে তা দেখানো হয়েছে। সব কিছু ছাপিয়ে দেখানো হয়েছে অতি শোষণের বিরুদ্ধে শ্রমিক কৃষকের প্রতিরোধের মহাকাব্যের উষ্ণতাকে।

পত্রিকার চতুর্থভাগ : আহ্বান। এই বিভাগের সমস্ত লেখাই thenaxalbari.blogspot.com থেকে নেওয়া হয়েছে। এই বিভাগে রয়েছে ব্রাহ্মণ্যবাদের বিরুদ্ধে অগ্রণী সর্বহারার অবস্থান সম্পর্কিত একটি ছোট্ট নিবন্ধ। জাতিবাদী সামন্তবাদকে নগ্ন করা হয়েছে এই লেখায়। রয়েছে বিপ্লবী আন্তর্জাতিকতাবাদী আন্দোলন (রিম) সম্পর্কিত একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব। এই প্রস্তাবে নতুন বিপ্লবী আন্তর্জাতিক গড়ে তোলা সম্পর্কে দিশা হাজির করা হয়েছে। রয়েছে নেপালের সি পি এন - এম পার্টির সপ্তম পার্টি কংগ্রেসের উদ্দেশ্যে পাঠানো একটি বার্তা। নেপালে মাওবাদী আন্দোলন কোন্ দিশায় এগোচ্ছে – এ সম্পর্কে যাঁরা গভীরে ভাবতে ও বুঝতে চান তাঁদের এই বার্তাটি কিছুটা সাহায্য করবে বলে মনে হয়।

দাবানল পাত্রিকা প্রথমত, বিপ্লবী শিবিরে চলমান গুরুত্বপূর্ণ বিতর্কগুলির অংশীদার হতে চায় – মতাদর্শগতভাবে গভীরতর উপলব্ধিতে পৌঁছতে চায়। দ্বিতীয়ত, বৃহত্তর গণতান্ত্রিক ও দেশপ্রেমিক জনগণের মধ্যে নিজের অবস্থানের সঠিকতাকে যাচাই করে নিতে চায়। তৃতীয়ত, জনগণকে বিপ্লবী সংগ্রামে অংশগ্রহণের জন্য অনুপ্রাণিত করতে চায়। এই ত্রিফলা উদ্দেশ্য সাধনে আমরা পাঠকের কাছ থেকে শুধুমাত্র বাহবা নয়, তীক্ষ্ণ অথচ সদর্থক সমালোচনাও চাই। কারণ আমরা বিশ্বাস করি যুদ্ধে নামার আগে পাথরে কোপ মেরেই তরোয়ালের ধার পরখ করতে হয়।

পশ্চিমবাংলার রাজনৈতিক সন্ধিক্ষণ ঃ বিপদ ও সম্ভাবনা

আমাদের রাজ্য একটা অদ্ভুত ও ভয়ানক পরিস্থিতির মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছে। অনেকেই ভুলভাবে মনে করেছিলেন যে, সি পি এমকে সরিয়ে তৃণমূলকে ক্ষমতায় আনলে অবস্থার মৌলিক পরিবর্তন হবে। শাসকশ্রেণির প্রচার মাধ্যম, অনেক বুদ্ধিজীবী, এস ইউ সি-এর মত ছোট বামপন্থী দল, ভোটবাজ নকশালপন্থীরা জনগণকে বুঝিয়েছিল যে, মমতাকে যে কোন মূল্যে ক্ষমতায় আনতে হবে। তাহলে নাকি এরাজ্যে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হবে। এখন জনগণ নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকে দেখতে পাচ্ছেন যে, অবস্থার পরিবর্তন হওয়া তো দুরের কথা বরং সামনের দরজা দিয়ে বাঘ বেরিয়ে গেলেও পিছনের দরজা দিয়ে নেকড়ে ঢুকেছে। এই অবস্থায় আমাদের পরিস্কার করে বুঝে নিতে হবে যে ভোটের মধ্যে দিয়ে ২০১১ সালে এই রাজ্যে যে পরিবর্তন হয়েছে তার আসল চরিত্র কি ? এটা বুঝতে পারলে তবেই আমরা নতুন রাস্তা খুঁজে নিতে পারব। নচেৎ আবার আমাদের সি পি এমের ফাঁদে পড়তে হবে। আজকে পরিস্থিতির একটা ভয়ানক দিক হলো অপদার্থ তৃণমূলের জনবিরোধি চরিত্রকে ব্যবহার করে শাসকশ্রেণি ও তার পোষা কুকুর মিডিয়া সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম-লালগড়ের শিক্ষাগুলিকে ভুলিয়ে দিতে চাইছে। প্রথমত, আজকে প্রমাণ করার চেষ্টা হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদী ও আমলাতান্ত্রিক পুঁজিকে এরাজ্যে ঢোকার ব্যবস্থা করে দিলেই নাকি জনগণের সমস্যার সমাধান হবে, বেকারদের চাকরি হবে, রাজ্যের উন্নয়ন হবে। সাম্রাজ্যবাদ নির্দেশিত উন্নয়ন মডেলটাকে আবার জনগণের কাছে ন্যায়সংগত বলে চালানোর চেষ্টা হচ্ছে। নন্দীগ্রাম-লালগড়ের রক্তে হাত রাঙানো ফ্যাসিষ্ট বুদ্ধকে আবার সাদা ধুতি পাঞ্জাবী পরিয়ে শাসকশ্রেণি শিল্পায়ন, শান্তি, স্থৈর্য, মননশীলতা, ভদ্রতা, দূর্নীতিহীনতার প্রতীক হিসাবে বাজারে চালানোর চেষ্টা করছে। দ্বিতীয়ত, গায়ের জোরে পুলিশ পাঠিয়ে কৃষকদের উচ্ছেদ করে জমি দখল করাটাকে আবার সঠিক বলে প্রমাণ করার চেষ্টা হচ্ছে। এটা না করলে নাকি শিল্প হবে না। শিল্পপতিরা নাকি ভীষণ নরম প্রকৃতির লোক তাই তারা গরম দেখিয়ে জমি নিতে পারবে না। ভুলিয়ে দেওয়া হচ্ছে যে, মহারাষ্ট্রের রত্নগিরি থেকে ওড়িশার জগৎসিংহপুর থেকে উত্তরপ্রদেশের নয়ডা থেকে সারা ভারত জুড়ে বড় পুঁজিপতিরা পুলিশ লেলিয়ে দিয়ে, পয়সা দিয়ে পোষা গুন্ডা পাঠিয়ে কিভাবে কৃষকদের খুন করে জমি দখল করেছে। সাম্রাজ্যবাদ ও তার দালাল আমলাতান্ত্রিক পুঁজিপতি এই সমস্ত রক্তচোষা বজ্জাতদের আজকে ভদ্দরলোক বলে বাজারে চালানোর চেষ্টা হচ্ছে। তৃতীয়ত, সেজ গড়াটাকে আবার নতুন করে অত্যন্ত উচিত কাজ বলে প্রচার করা হচেছ। ভুলিয়ে দেবার চেষ্টা চলছে যে, সেজ আসলে পুঁজিপতিদের রক্তচোষার কারখানা। চতুর্থত, ধর্মঘট, ইউনিয়ন, রাজনীতি করাটাকে নোংরা কাজ বলে তুলে ধরার চেষ্টা হচ্ছে। সেজন্য ধর্মঘট, ইউনিয়ন না করার সপক্ষে জনমত গড়ে তোলা হচ্ছে। জনগণের লড়াই করে অর্জিত অধিকারকে কেড়ে নেবার চেষ্টা চলছে। বলা হচ্ছে রাজনীতি অতি নোংরা জিনিষ। কোন সন্দেহ নেই যে, ভোটবাজ রাজনীতি অতি নোংরা জিনিষ। কিন্তু, দেশের এই দুরবস্থার জন্য কি শুধুমাত্র রাজনৈতিক পরিচালকরাই দায়ী ? যাদের হাতে দেশের প্রায় সমস্ত সম্পদ জমা হয়েছে, যারা দেশে অর্থনৈতিক জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে সেই সাম্রাজ্যবাদের দালাল টাটা বিড়লার মত বড় পুঁজিপতিদের কি কোন দায় নেই ? তারা তো দেশের অর্থনৈতিক পরিচালক। তারা ও তাদের দালাল সরকার এমনভাবে অর্থনীতি পরিচালনা করেছে যাতে তাদের সম্পদ কয়েকশো গুণ বেড়েছে অথচ জনগণের ৭৭ ভাগ ২০ টাকার নিচে আয় করে। ঐসব বড় পুঁজিপতিদের আজকে ভালো লোক বলে চালানোর চেষ্টা চলছে। আজকের পরিস্থিতির মূল কথা হলো তৃণমূল শাসকশ্রেণির উদ্দেশ্য পূরণ করতে মোটের উপর ব্যর্থ হচ্ছে। এই অবস্থায় শাসকশ্রেণি আবার সামনের দরজা দিয়ে নেকড়ে বার করে পিছনের দরজা দিয়ে বাঘ ঢোকানোর চেষ্টা করছে। তাই আমাদের সামনে কর্তব্য হলো শাসকশ্রেণি এই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বাঘ-নেকড়ের খেলা থেকে মুক্ত হয়ে নতুন পথ খুঁজে বার করা। সেজন্য ২০১১ সালের পরিবর্তনটাকে গভীরভাবে বিশ্লেষণ করার দরকার আছে।

বিপ্লবী দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে এই পরিবর্তন আসলে কোন পরিবর্তনই নয়। এটা কেবলমাত্র ভোটের মধ্যে দিয়ে একটা “সংসদীয় পালাবদল” ছাড়া আর কিছুই নয়। সত্যিকারের পরিবর্তন মানে রাষ্ট্র ক্ষমতার পরিবর্তন। অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদ-আমলাতান্ত্রিক বড় বুর্জোয়া ও সামন্তবাদী জোতদার – জমিদারদের হাত থেকে রাষ্ট্র ক্ষমতা শ্রমিক-কৃষকের হাতে আসা। এটা কেবলমাত্র সমাজ বিপ্লবের মধ্যে দিয়েই আসতে পারে, ভোটের মধ্যে দিয়ে নয়। ভোটের মধ্যে দিয়ে যেটা হয় তা হল শাসকশ্রেণির এক গ্রুপের বদলে এখন অন্য আর এক গ্রুপ শাসন করবে। কিন্তু, সমাজের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কাঠামোটা একই থেকে যাবে। এককথায় বললে, বিড়ির মশলা একই থাকবে কিন্তু বিড়ি বাঁধার সুতোর রঙটা বদলে যাবে।

ভোটের মধ্যে দিয়ে ঢাকঢোল পিটিয়ে এরকম সরকার পরিবর্তন আমাদের রাজ্যে নতুন নয়। ৭৭ সালে কংগ্রেস বিরোধি ঢেউয়ের মাথায় চড়ে বিরাট আশা জাগিয়ে সি পি এম ক্ষমতায় এসেছিল। আবার ২০১১ সালে সি পি এম বিরোধি ঢেউয়ের মাথায় চড়ে তৃণমূল ক্ষমতায় এসেছে। ১৯৭৭ সালে এবং ২০১১ সালে পশ্চিমবাংলার বুকে যে পরিবর্তন ঘটেছিল তার মধ্যে দুটো মিল আছে। প্রথম মিলটা হল ৭৭ সাল ও ১১ সালের দুটো পরিবর্তনের পিছনে (পরোক্ষভাবে) নির্ধারক ভূমিকা নিয়েছিল বিপ্লবী নকশালপন্থীরা। দ্বিতীয় মিলটা হল দুবারই বিপ্লবী নকশালপন্থীদের আন্দোলন ধাক্কা খেয়েছিল। (যদিও এটা ঠিক যে, ২০১১-এর তুলনায় ষাট ও সত্তরের দশকের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি বিপ্লবীদের পক্ষে অনেক বেশি অনুকূল ছিল এবং সত্তরের নকশালপন্থী আন্দোলন সমাজের ব্যাপক অংশকে বিরাটভাবে আলোড়িত করেছিল। আজকের বিপ্লবী সংগ্রাম সমাজের সর্বস্তরে প্রভাব ফেললেও সত্তরের মত ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করতে পারে নি। এর একটা কারণ অবশ্যই সেই সময়কার অনুকূল পরিস্থিতি। কিন্তু প্রধান কারণ অবশ্যই চারু মজুমদারের নেতৃত্বে সেই সময়কার সি পি আই (এম – এল) পার্টির সর্বাত্মক জনযুদ্ধের লাইন। কারণ পরিস্থিতি যাই হোক না কেন পার্টির লাইনটাই নির্ধারণ করে দেয় যে কিভাবে আমরা পরিস্থিতিকে বিপ্লবের স্বার্থে ব্যবহার করতে পারব।) আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে, ষাটের দশকের শেষ ও সত্তরের দশকের শুরুর দিকে পশ্চিমবাংলার বুকে নকশালপন্থী বিপ্লবীদের নেতৃত্বে বিরাট আকারের সামন্তবাদ বিরোধী সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু হয়। এই সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে এই রাজ্যের গ্রাম এলাকায় পুরোনো জোতদার শ্রেণির কর্তৃত্ব খতম হয়ে যায়। কৃষকরা তাদের বহু জমি দখল করে নেয়। এর সাথে সাথে পুরানো জোতদারদের পার্টি কংগ্রেসের রমরমাও শেষ হয়ে যায়। কিন্তু, নকশালপন্থী আন্দোলন সত্তরের দশকের শুরুতে ধাক্কা খায়। ফাঁকা জায়গায় ঢুকে পড়ে সি পি এম। জনগণের মধ্যে কংগ্রেসের উপর ঘৃণাকে ব্যবহার করে ৭৭ সালে সি পি এম ক্ষমতায় আসে। একইভাবে ২০১১ সালে সি পি এমের শাসন শেষ করে দেবার পিছনে যে দুটি সংগ্রাম সবচেয়ে বড় ভূমিকা পালন করেছিল সেই নন্দীগ্রাম ও লালগড়ের সংগ্রামে সবচেয়ে বড় ভূমিকা পালন করেছিলেন মাওবাদী নকশালপন্থীরা। তাঁরাই অস্ত্র হাতে সি পি এমের সশস্ত্র গুন্ডাদের ও পুলিশের আক্রমণের মোকবিলা করেছেন ও সংগ্রামকে টিঁকিয়ে রেখেছিলেন। ফলে সারা রাজ্যজুড়ে মানুষ সি পি এমের বিরুদ্ধে নতুন শক্তি ও সাহস নিয়ে বিদ্রোহ করেন। জনগণের এই সি পি এম বিরোধি বিদ্রোহকে ভোটের বাক্সে ব্যবহার করে তৃণমূল ক্ষমতায় আসে। কিন্তু, সত্তরের দশকের মতই এবারও মাওবাদীদের সংগ্রাম ধাক্কা খায়। পশ্চিমবাংলায় ২০১১ সালের পরিবর্তনকে ঠিক মতো উপলব্ধি করতে হলে প্রথমে আমাদের বুঝে নিতে হবে যে ৭৭ সালের পরিবর্তন বাংলার বুকে কি পয়দা করেছিল।

৭৭ সালের পরিবর্তনের তাৎপর্য

ষাট ও সত্তরের দশকে নকশালপন্থীদের নেতৃত্বে জনগণ পুরোনো ধরনের বড় বড় কংগ্রেসী জোতদারদের কর্তৃত্বকে ধ্বংস করে দিয়েছিল। ৭৭ সালে ক্ষমতায় আসার পর সি পি এম সরকারি ক্ষমতাকে ব্যবহার করে পুরোনো জোতদারদের (মূলত উচ্চবর্ণের) কর্তৃত্বকে আরও খর্ব করে দেয়। সাম্রাজ্যবাদ নির্দেশিত

ও নিয়ন্ত্রিত সি পি এম মার্কা ভূমি সংস্কারের ফলে পুরোনো ধরনের জোতদারদের জমিজমাও অনেকটা হাতছাড়া হয়ে যায়। এছাড়াও জোতদার পরিবারের মধ্যে জমি ভাগাভাগির ফলেও বড় বড় জোতের সংখ্যা অনেকটা কমে যায় (যদিও এখনও কোন কোন এলাকায় বড় জোতদার রয়ে গেছে)। কংগ্রেস আমলে বড় জোতদাররা জমির একচেটিয়া মালিকানার জোরে কৃষকদের থেকে উদ্বৃত্তকে নিংড়ে নিত। অর্থাৎ, লেঠেল দিয়ে ক্ষমতার জোরে কৃষকদের থেকে খাজনা আদায় করত। পাশাপাশি, তারা কৃষকদের শোষণ করার জন্য জাতপাত প্রথাকে ব্যবহার করত। উঁচুজাতের লোকেরা (প্রধানত ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্য জাতের লোকরা) ছিল মূলত জমির মালিক। দলিতরা যেমন – বাগদি, বাউরি, ডোম, রুইদাস, নমশুদ্রা ছিলেন ভূমিহীন কৃষক। জাতপাত প্রথাকে ব্যবহার করে এঁদের জমির মালিকানা থেকে বঞ্চিত করে রাখা হয়েছিল এবং সামান্য মজুরী দিয়ে এঁদের জোতদারের জমিতে খাটতে বাধ্য করা হত। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই টাকায় মজুরী দেওয়া হত না, ধান-চাল বা আধপেট খাবার দিয়ে অমানুষিক খাটান হত।

সি পি এম ক্ষমতায় আসার পর পরিস্থিতির কিছু পরিবর্তন ঘটে। ষাট ও সত্তরের দশকের বিরাট লড়াইয়ের ফলে পুরোনো ধরনের বড় জোতদাররা অনেকটাই দুর্বল হয়ে গেলেও আশির দশক থেকে সি পি এমের মদতে গ্রামাঞ্চলে সাম্রাজ্যবাদ নির্দেশিত সবুজ বিপ্লবের কর্মসূচী লাগু করা শুরু হয়। এর মধ্যে দিয়ে পুরোনো ধরনের সামন্তবাদকে রূপান্তরিত করার একটা প্রক্রিয়া শুরু হয় এবং এক নতুন ধরনের পুঁজিবাদের বিকাশের প্রক্রিয়া জোরদার হয় (অর্থাৎ কৃষি ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদের অনুপ্রবেশ আরও গভীরতর হয়)। আধা সামন্তবাদকে রূপান্তরিত করার এই প্রক্রিয়ার মধ্যেকার ভেঙে ফেলা এবং টিঁকিয়ে রাখার দ্বন্দ্বের বিকাশের মধ্যে দিয়ে গ্রামাঞ্চলে একটা নয়া জোতদার শ্রেণি গড়ে ওঠে (তার মানে এই নয় যে, পুরোনো জোতদাররা শেষ হয়ে যায়। তারা নিজেদেরকে নতুন পরিস্থিতির সাথে খাপ খাইয়ে বদলে নেয়। নয়া জোতদারের অর্থ এরা শোষণের নতুন নতুন ধরনকে ব্যবহার করে। নয়া জোতদারদের মধ্যে পড়ে এলাকার পার্টি বস, সমবায়ের মাথা, পঞ্চায়েতের কর্মকর্তা, সামাজিক-ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান গুলির মাথা এবং অবশ্যই যে সব পুরোনো জোতদাররা এখনও টিঁকে আছে। সাধারণভাবে বললে, সেই সব লোকরা যারা গ্রামের রাজনৈতিক ক্ষমতার কাঠামোর শীর্ষে বসে আছে এবং নতুন নতুন রূপ ও পদ্ধতিকে ব্যবহার করে শোষণ চালাচ্ছে। জাতি-বর্ণগত দিক থেকে দেখলে উচ্চবর্ণের পাশাপাশি ও বি সি এবং এগিয়ে থাকা দলিতদের মধ্যে থেকে এরা এসেছে)।

নয়া জোতদারি শোষণের পদ্ধতি

(১) ভাগচাষ ঃ সি পি এমের আমলে তৈরি হওয়া এই সমস্ত নয়া জোতদাররা পুরোনো জোতদারদের মত এরা বিরাট বিরাট জমিদারির মালিক না হলেও এখনও গ্রামের বেশির ভাগ জমিই এদের হাতে আছে। সরকারি তথ্য বলছে, গ্রামের শতকরা মাত্র চারটে পরিবার মোট চাষের জমির তিনভাগের একভাগের মালিক। এরা পুরোনো জোতদারদের মতই জমিতে কোন শ্রম না দিয়েই কৃষকদের থেকে ফসলের ভাগ নেয় অথবা একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা নেয়। এরাজ্যের কমবেশী ১০ থেকে ১৬ ভাগ জমিতে ভাগচাষ হয়। ভাগচাষীরা মূলত গরিব ও ভূমিহীন চাষী। লড়াই করে ভাগচাষীরা তাঁদের ভাগ আগের থেকে বাড়াতে পেরেছেন। কিন্তু, এরাজ্যের ভাগচাষীরা মূলত গরিব কৃষক এবং মালিকরা জমির একচেটিয়া মালিকানার জোরে তাঁদের থেকে উদ্বৃত্ত কেড়ে নিচ্ছে। ষাট ও সত্তরের দশকে ভাগচাষীরা লড়াই করে জোতদারদের থেকে বহু জমি দখল করে নিয়েছিলেন। অনেক জায়গাতে মালিকরা ভয়ে কৃষকদের জমির একটা অংশ ছেড়ে দেয়। এজন্য পরবর্তীকালে মালিকরা ভাগচাষের বদলে ক্ষেতমজুর লাগিয়ে চাষ করার পদ্ধতি চালু করে।

(২) মজুরি প্রথা ঃ মজুর লাগিয়ে চাষ করার পদ্ধতির মধ্যেও পরিবর্তন ঘটেছে। আগেও মালিকরা মজুর লাগিয়ে চাষ করত। কিন্তু, ষাট ও সত্তরের দশকে মজুররা ছিলেন মালিকের কাছে বাঁধা দাসের মত। সামান্য কিছু ধান-চাল বা খাবারের বিনিময়ে তাঁরা বাধ্য থাকতেন জোতদারের জমিতে ও বাড়িতে দিন রাত কাজ করতে (যেমন, বাঁধা বা মাহিন্দরি প্রথা)। এখন অবস্থার বদল ঘটেছে। দীর্ঘ শ্রেণি সংগ্রামের ফলে বাঁধা দাস প্রথার অনেকটা বিলোপ ঘটেছে। এখন ক্ষেতমজুররা নির্দিষ্ট মজুরির বিনিময়ে দৈনিক ভিত্তিতে কাজ করেন। কিন্তু,কম মজুরি এবং কাজ পাওয়ার অনিশ্চয়তার (বছরে কৃষিতে খুব বেশি হলে মাত্র ১১২ দিন কাজ পাওয়া যায়) জন্য ক্ষেতমজুররা বাধ্য হন জোতদারদের সাথে বিভিন্নি রকম অর্থনীতি বহির্ভূত চুক্তি করতে (যেমন, চাষের মরশুমে কম মজুরিতে কাজ করার শর্তে দাদন নেওয়া, কম মজুরিতে কাজ করার শর্তে ঋণ পাওয়া প্রভৃতি)। ২০০৪-০৫ সালের কেন্দ্র সরকারের রিপোর্ট বলছে এরাজ্যের ৯৪.৫ শতাংশ ক্ষেতমজুর কেন্দ্র সরকার নির্ধারিত নূন্যতম মজুরির চেয়ে কম মজুরিতে কাজ করেন। অর্থাৎ গ্রামের নয়া জোতদাররা কংগ্রেস আমলের মতোই ক্ষেতমজুরদের শ্রমশক্তির দামের নিচে মজুরি দিয়ে খাটিয়ে নিচ্ছে। এভাবে তারা আধা সামন্তবাদী পদ্ধতিগুলিকে ব্যবহার করে ক্ষেতমজুরদের থেকে উদ্বৃত্ত নিংড়ে নিচ্ছে। তাই এ কথা বলাই যায় যে, ক্ষেতমজুররা এখন এক একজন জোতদারের বাঁধা দাস হিসাবে না থাকলেও তাঁরা সমগ্র কৃষিক্ষেত্রের সাথে বাঁধা দাসের মত অবস্থায় রয়েছেন।

(৩) জাতপাত প্রথা ঃ ঃ ভূমিহীন কৃষকদের একটা বড় অংশই হলো দলিতরা। ব্রাহ্মণ্যবাদ যুগ যুগ ধরে দলিতদের সম্পত্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে। আজও একই পরিস্থিতি চলছে। বাংলার ১ কোটি ৮০ লক্ষ দলিতদের অধিকাংশই ভূমিহীন কৃষক। যেমন, বাউরিদের মধ্যে ৫৫ ভাগ মানুষ ক্ষেতমজুর। বাগদীদের ৫৪ ভাগ ও মালদের ৬৪ ভাগ ক্ষেতমজুর। ষাট ও সত্তরের দশকের লড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে দলিতরা কিছু কিছু জমি দখল করেছিলেন। যদিও তার বেশিরভাগটাই চাষের খরচা চালাতে না পেরে অথবা সংসার চালাতে গিয়ে তাঁরা বেচে দিতে বাধ্য হয়েছেন। অনেক ক্ষেত্রেই সি পি এম নেতারা জমির পাট্টা আটকে রেখে দলিতদের নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করেছে (বিশেষ করে ও বি সি সম্প্রদায়ের ছোট কৃষকদের বিরুদ্ধে দলিতদের কাজে লাগানো হয়েছে এবং এভাবে জাতিগত অবিশ্বাস তৈরি করে শ্রেণি ঐক্যকে ভাঙা হয়েছে)। এই বিপুল দলিত জনগণ গ্রামের সস্তা শ্রমিক হিসাবে কাজ করেন। কিছু কিছু এগিয়ে থাকা দলিত জাতি, যেমন নমশূদ্র, পোদ্রক্ষত্রিয়, রুইদাস প্রভৃতিদের মধ্যে থেকে একটা ধনী অংশ তৈরি হয়েছে। বিশেষ করে ভোটবাজ পার্টির নেতাগিরি, ব্যবসা, সরকারী চাকরি প্রভৃতির মধ্যে দিয়ে এরা প্রচুর সম্পদশালী হয়ে উঠেছে এবং নয়া জোতদার শ্রেণিতে পরিণত হয়েছে। এই ঘটনাটা আমাদের দেখিয়ে দেয় যে, জোতদারদের বিরুদ্ধে যাঁরা সংগ্রাম করেছিলেন তাঁদের মধ্যে থেকে সাম্রাজ্যবাদ ও রাষ্ট্র কিভাবে একটা অংশকে তুলে নিয়ে এসে নতুন শাসক শ্রেণিতে পরিণত করে।

(৪) গরিব কৃষকদের শোষণ ঃ এরাজ্যের গ্রামের বিপুল জনগণ গরিব চাষী। গ্রামের মোট পরিবারের ৭৮ ভাগ হলো গরিব ও ভূমিহীন কৃষক। এঁদের সংখ্যাও দিন দিন বাড়ছে। গ্রামের নয়া জোতদার শ্রেণি এঁদেরকে বিভিন্নভাবে শোষণ করে। নয়া জোতদাররা পাম্প সেট, ট্রাকটার, পাওয়ার টিলার ভাড়া দিয়ে এবং সার, বীজ, কীটনাশক ধার দিয়ে গরিব কৃষকদের সাথে ফসল কমে দামে কিনে নেবার চুক্তি করে। চাষের খরচ দিন দিন বাড়ার ফলে গরিব চাষীরা বাধ্য হন এই ধরনের চুক্তি করতে। এটা করতে তাঁরা বাধ্য হন কারণ এলাকার ধান-চাল ও কৃষিজ ফসলের পাইকারি ব্যবসা নয়া জোতদাররা নিয়ন্ত্রণ করে। এদের বাদ দিয়ে গরিব কৃষকের পক্ষে সম্ভব হয় না ফসল মজুত করে পরে বেশি দামে বিক্রি করা। কারণ নয়া জোতদাররা তাদের রাজনৈতিক ক্ষমতার জোরে (পঞ্চায়েত ও প্রশাসনের সাথে যোগাযোগ এবং এরাই ভোটবাজ পার্টির নেতা অথবা পার্টিগুলিকে পয়সা দিয়ে কিনে রেখেছে) হিমঘরগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করে। আলুর বন্ডের উপর

এদের নিয়ন্ত্রণ এর সবচেয়ে বড় উদাহরণ। নয়া জোতদাররা পার্টি ও পঞ্চায়েত, প্রশাসনের সাথে যোগসাজসে গরিব চাষীদের উপর এই ধরনের অর্থনীতি বর্হিভূত শোষণ চালায়। এছাড়াও গরিব চাষীরা বছরের একটা বড় সময় ভূমিহীন কৃষকের মতই কম মজুরিতে জোতদারদের জমিতে কাজ করেন অথবা অসংগঠিত সস্তা শ্রমিক হিসাবে কাজ করতে শহরে বা অন্য রাজ্যে চলে যান।

(৫) জমির উপর নিয়ন্ত্রণ ঃ যদিও নয়া জোতদাররা পুরোনো জোতদারদের মত বিরাট বিরাট জমিদারির মালিক না হলেও পার্টি, প্রশাসন, পঞ্চায়েত ও পুলিশের মদতে এরা গ্রামের অনেক বেশি পরিমাণ জমিকে নিয়ন্ত্রণ করে। গরিব কৃষকদের নিয়ন্ত্রণ করার একটা বড় উপায় হলো পার্টি অফিসে জমির পাট্টা আটকে রাখা। একজনের পাট্টা অন্যকে দেওয়া এবং এই নিয়ে কৃষকদের মধ্যে বিরোধ লাগিয়ে দিয়ে দুপক্ষ থেকেই পয়সা খাওয়া। এরকম ঘটনা এরাজ্যের গ্রামে বহু ঘটে থাকে। ফলে একটা নতুন শব্দই তৈরি হয়েছে – পাট্টাদাস। এছাড়াও, খাস জমি বিলি না করে নিজেরা হজম করে দেওয়ার ঘটনা আকছার ঘটে থাকে। এই ঘটনাগুলি দেখিয়ে দেয় যে, কিভাবে পার্টি, পঞ্চায়েত, প্রশাসন ও পুলিশের জালটাকে এমনভাবে গড়ে তোলা হয়েছে যাতে গরিব কৃষকদের নিয়ন্ত্রণ করা যায় এবং অর্থনীতি বহির্ভূত উপায়ে উদ্বৃত্ত নিংড়ে নেওয়া যায়।

(৬) মহাজনি প্রথা ঃ কৃষকদের শোষণ করার একটা অন্যতম উপায় হিসাবে মহাজনি প্রথা আজও রমরমিয়ে চলছে। তবে আশির দশক থেকে মহাজনি শোষণের রূপ বদলেছে। সি পি এম আমলে গ্রামে গ্রামে বহু ঋণ সমবায় সমিতি গড়ে তোলা হয়েছে। প্রতিটি সমবায় সমিতিতে পরিচালন কমিটিগুলির সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশই হলো এই নয়া জোতদাররা। একটি তদন্তরিপোর্টে বলা হয়েছে যে, গ্রামের ধনী অংশটা মোট সমবায় ঋণের ৪৫ ভাগ নিচ্ছে, যারা গ্রামের জনগণের মাত্র ১১ ভাগ। গরিবরা যে ঋণ নিচ্ছেন তার বেশির ভাগটাই শোধ দিতে না পারার জন্য ব্যাংক বা সমবায় সমিতি থেকে আর ধার পাচ্ছেন না। ফলে গরিবদের মোট ঋণের ৬১ ভাগই হলো মহাজনদের কাছ থেকে নেওয়া। এমনকি সমবায় সমিতির মাথায় বসে থাকা কর্মকর্তারা নিজের প্রভাব খাটিয়ে সমবায় থেকে ঋণ নিয়ে অথবা ব্যাংকের লোকদের সাথে সাঁটগাঁট করে ব্যাংক থেকে ধার নিয়ে মহাজনী ব্যবসা খুলে বসেছে। ফসল উঠলে তা বাজার দরের চেয়ে কম দামে বেচতে হবে এই শর্তে গরিব কৃষকদের ঋণ দেওয়ার প্রথা অবাধে চলছে। কৃষকরা চাষের খরচ চালানোর জন্য এই নয়া জোতদারদের থেকে মোটা সুদে টাকা ধার করতে বাধ্য হয়। এভাবে মহাজনি করে নয়া জোতদাররা মোটা টাকা কামাই করে। আবার এদের ধার শোধ করার জন্য কৃষকরা বাধ্য হয় ফসল ওঠার সাথে সাথে এদের কাছেই কম দামে অভাবী বিক্রি করতে। এভাবে দালাল-ফড়ে গিরি করে মাঝখান থেকে মোটা টাকা কামাই হয়।

(৭) সমবায় ঃ সি পি এম ক্ষমতায় আসার পর ঢাকঢোল পিটিয়ে সমবায় অন্দোলন শুরু করেছিল। এই সমবায়গুলো আসলে গরিব চাষীদের অর্থনীতি বহির্ভূত উপায়ে শোষণ করার একটা অন্যতম হাতিয়ার। ঋণ সমবায়গুলিকে ব্যবহার করে নয়া জোতদাররা কিভাবে চাষীদের শোষণ করে তা আমরা আগেই বলেছি। উত্তর ২৪ পরগণার হাড়োয়া, শাসন, বেলেঘাটা প্রভৃতি অঞ্চলে সত্তর ও আশির দশকে কৃষকরা বিরাট লড়াই করে মাছের ভেড়ি গুলি থেকে বড় জমিদারদের উচ্ছেদ করে দেয়। এরপর ভেড়িগুলি পরিচলনার জন্য বহু সমবায় সমিতি গড়ে ওঠে। সি পি এমের নেতারা (এখন তৃণমূল) এই সব সমবায়ের মাথা হয়ে বসে। তারা সমবায়ের গরিব সদস্যদের সমান্য কিছু টাকা দিয়ে লাভের মোটা অংশটা নিজেরা হজম করে। এমনকি তারা পুরোনো জোতদারদের সাথে সাঁটগাঁট করে ঐ মালিকদেরই আবার ভেড়ি গুলি লিজে দেয় এবং গোপনে লাভের ভাগ নেয়। আর এই কাজের বিরুদ্ধে যাতে কেউ প্রতিবাদ করতে না পারে তার জন্য সশস্ত্র সংগঠিত গুন্ডা বাহিনী তৈরি করেছে। দুর্গের মতো বিরাট বিরাট পার্টি অফিসগুলি একদিকে পুরোনো জমিদারদের কাছারি বাড়ির মত, অন্যদিকে এলাকার লোকের এবং বাইরের লোকের কাজকর্ম ও চলাফেরার উপর নজরদারি করার জন্য পাহারাদারির চৌকি হিসাবে কাজ করে। এটা দেখিয়ে দেয় যে, এক সময়ের জমিদার বিরোধী আন্দোলনের নেতারা নিজেরাই কিভাবে নয়া জোতদার শ্রেণিতে রূপান্তরিত হয়েছে।

(৮) সাম্রাজ্যবাদের এজেন্ট ঃ সাম্রাজ্যবাদী ও দেশি দালাল বুর্জোয়ারা কৃষি ক্ষেত্রে উৎপাদিত পণ্য কম দামে কেনে এবং শিল্পজাত পণ্য বেশি দামে বিক্রি করে। এভাবে দামের কাঁচি চালিয়ে তারা কৃষি ক্ষেত্রকে শোষণ করে। এই কাজে তাদের আঞ্চলিক এজেন্ট হিসাবে কাজ করে নয়া জোতদার শ্রেণি। গ্রামাঞ্চলের পণ্য চলাচলের গোটা প্রক্রিয়াটাকে নিয়ন্ত্রণ করে এই নয়া জোতদার শ্রেণি। আশির দশক থেকে সবুজ বিপ্লবের প্রক্রিয়া এরাজ্যে কৃষিক্ষেত্রে চালু হবার পর থেকে সাম্রাজ্যবাদী ও তার দালাল দেশি বড় পুঁজিপতিদের হাইব্রিড বীজ, সার, কীটনাশক, আগাছানাশক, ট্রাকটার, পাওয়ার টিলার প্রভৃতি চাষের উপকরণ বিক্রি বেশ কয়েকগুণ বেড়ে যায়। দেশি-বিদেশি বড় বড় কোম্পানির ডিলার-ডিস্ট্রিবিউটার হিসাবে গ্রামে সার-বীজ-কীটনাশক-চাষের যন্ত্রপাতি বিক্রি করে নয়া জোতদাররা মাঝখান থেকে মোটা লাভ করে। এরা চাষের এইসব উপকরণ ধারে দিয়ে চাষীদের বাধ্য করে ফসল ওঠার পর তাদের কাছেই কম দামে বেচতে। চাষীদের থেকে কম দামে কিনে এর কৃষিজাত পণ্য শিল্পক্ষেত্রকে বিক্রি করে। শিল্পপতিরাও কম দামে কাঁচামাল পাওয়ার জন্য এদের উপর নির্ভর করে। সাধারণভাবে বলা যায় যে, সাম্রাজ্যবাদ ও তার দালাল পুঁজিপতিদের উৎপাদিত মাল বিক্রি এবং তাদের শিল্পের জন্য কমদামে কাঁচামালের জন্য তারা নয়া জোতদারদের উপর নির্ভর করে। এখানেও পুঁজিবাদী পণ্য সঞ্চালনের রুপের নীচে সামন্ততান্ত্রিক সম্পর্কগুলি কাজ করে চলেছে।

(৯) সাম্রাজ্যবাদের নয়া পরিকল্পনা ঃ সাম্রাজ্যবাদ এদেশের কৃষিক্ষেত্রের জন্য কিছু কিছু নতুন পরিকল্পনা নিয়ে হাজির হয়েছে। প্রথমত, চুক্তিচাষের মাধ্যমে কৃষির বাণিজ্যকরণ। অর্থাৎ, কৃষকরা ধান চাষ না করে পেপসি কোম্পানির জন্য আলু, টমেটোর চাষ করবে। প্রথম প্রথম চাষীদের লোভ দেখানোর জন্য ভালো দাম দেওয়া হবে। বেশি বেশি কৃষকরা যখন লাভের আশায় উৎপাদন করতে শুরু করবে তখন বড় বড় একচেটিয়া কোম্পানিরা নিজেদের সুবিধামত কম দাম ঠিক করবে। সরকারের পরিকল্পনা হলো পার্টি ও পঞ্চায়েতের মাতব্বর এই সমস্ত নয়া জোতদাররাই কোম্পানি ও কৃষকদের মধ্যে চুক্তির ব্যবস্থা করবে। আসলে এই শোষক নয়া জোতদাররাই বড় পুঁজির স্বার্থে কৃষকদের ভয় দেখিয়ে চুক্তিচাষে বাধ্য করার বা ভূল বুঝিয়ে, লোভ দেখিয়ে টেনে আনার দায়িত্ব নেবে। দ্বীতিয়ত, সরকার দ্বিতীয় সবুজ বিপ্লবের টার্গেট এলাকা হিসাবে বেছে নিয়েছে মূলত পূর্ব ভারতের কয়েকটি রাজ্যকে। পাঞ্জাব-হরিয়ানা-পশ্চিম উত্তরপ্রদেশের যে সমস্ত অঞ্চলে প্রথম সবুজ বিপ্লব হয়েছিল সে সব জায়গায় মাটির তলার অধিকাংশ জল ইতিমধ্যেই ফুরিয়ে গেছে, জমি নোনা হয়ে গেছে। ফলে এবার বহুজাতিক সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির শকুনের চোখ পড়েছে অতি উর্বর এবং জল সম্পদে সমৃদ্ধ পূর্ব ভারতের উপর। কিন্তু, এরাজ্যের অবস্থাও ভালো নয়। আশির দশক থেকে প্রথম সবুজ বিপ্লবের যে কর্মসূচী সি পি এম চালু করেছিল তার ফলে মাটির তলার জল ব্যাপক হারে তুলে বিশাল পরিমাণ জমিতে বোরো চাষ করে আমরা ধান চাষে প্রথম হয়েছিলাম। ফল হয়েছে বিশাল এলাকাজুড়ে আর্সেনিক দূষণ, জমির উর্বরতা শক্তি নষ্ট। এখন আবার দ্বিতীয় সবুজ বিপ্লবের (জিন বিপ্লবের) কর্মসূচী নামানো হচ্ছে। উদ্দেশ্য হলো পরিবেশ ও মানুষের পক্ষে ভয়ানক ক্ষতিকর বাঁজা বীজ প্রযুক্তির ব্যবহার করে কৃষি উৎপাদন বাড়ানো এবং বিদেশে অবাধে ফসল রপ্তানি করা। এর ফলে কৃষকরা আরও বেশি বেশি করে বাধ্য হবে কারগিল, মনস্যান্টো, মাহিকোর মত দেশি-বিদেশি বড় কোম্পানির থেকে জৈব প্রযুক্তির বীজ এবং এই ধরনের বীজের উপযোগী সার, কীটনাশক, আগাছানাশক কিনতে। এখানেও এজেন্ট হিসাবে কাজ করবে নয়া জোতদাররা। কৃষিক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদের এই অনুপ্রবেশের মধ্যস্থতাকারী হিসাবে

নয়া জোতদাররা থাকায় সাম্রাজ্যবাদেরও সুবিধা হবে। বড় বড় কৃষি ফার্ম গড়ে তোলার জন্য ছোট কৃষকদের উচ্ছেদ করার কাজটা এই নয়া জোতদাররা করবে। এক্ষেত্রে সাম্রজ্যবাদ, রাষ্ট্র ও নয়া জোতদারদের একটা আঁতাতকে পরিস্কারভাবে দেখা যেতে পারে। মমতা সাময়িকভাবে বাঁজা বীজ চাষ নিষিদ্ধ করলেও আগামী দিনে নতুন রূপে এগুলো আসতে চলেছে কারণ মমতা দ্বিতীয় সবুজ বিপ্লবের কর্মসূচী লাগু করতে শুরু করেছে। এজন্য দুদিন অন্তর হিলারি ক্লিন্টন, শারদ পাওয়ারদের সাথে মহাকরণে মিটিং চলছে। চুক্তি চাষের পরিকল্পনাও বাতিল হয় নি। খুব সম্ভবত মমতার পি পি পি মডেলের একটা রূপ হিসাবে আগামী দিনে চুক্তি চাষ চালু হতে চলেছে।

(১০) জমি অধিগ্রহণ ঃ সাম্রাজ্যবাদের সাথে নয়া জোতদারদের আঁতাতের ব্যাপারটা সবচেয়ে ভালোভাবে আমরা দেখেছি সিঙ্গুর, নন্দীগ্রাম ও অন্যান্য যেসব জায়গায় সাম্রাজ্যবাদ ও তার দালাল পুঁজিপতিরা জমি দখল করার চেষ্টা করেছে বা দখল করেছে। সবার আগে জমি দিয়েছে জোতদার ও নয়া জোতদাররা এবং তাদের হাতেই সবচেয়ে বেশি জমি থাকায় তারা লাখ লাখ টাকা কামাই করেছে। বড় বড় কোম্পানির জন্য জমি লুঠের জন্য এরা সমস্ত এলাকাতেই সমবায় ও সিন্ডিকেট এবং শক্তিশালী গুন্ডাবাহিনী তৈরি করেছে (এলাকার বেকার ছেলেদের এই কাজে লাগিয়েছে) এবং এই কাজের জন্য পুঁজিপতিদের থেকে মোটা কমিশন খেয়েছে। জমি দখলের পর আবাসন, হোটেল, শপিং মল, জুয়াখানা, অত্যাধুনিক বেশ্যা পট্টি প্রভৃতি নির্মাণ করার জন্য মাটি ফেলা, রাস্তা তৈরি, নির্মাণ সামগ্রী সরবরাহ, শ্রমিক যোগান দেবার ঠিকাদারিও পেয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই জমি অধিগ্রহণ বিরোধী আন্দোলনে জনগণকে প্রথম যে শত্রুর মোকাবিলা করতে হচ্ছে তারা হল সি পি এম আমলে তৈরি হওয়া এই নয়া জোতদার শ্রেণিটাই। এখন তৃণমূলীরা সিন্ডিকেট গঠন করে কৃষকদের থেকে জমি দখল করে বেশি দামে বেসরকারী কোম্পানিকে বিক্রি করা, মালপত্র সরবরাহ করে মোটা টাকা খাওয়া প্রভৃতি কাজ শুরু করেছে। এই নিয়ে নিজেদের মধ্যে ব্যাপক খুনখারাপীও চলছে।

(১১) জনগণের সম্পদ চুরি ঃ যেকোন পঞ্চায়েত এলাকায় ব্যায় করার জন্য বরাদ্দ সরকারি টাকার (জনগণের টাকা) খরচের ব্যাপারটা এরাই নিয়ন্ত্রণ করে। কারণ পার্টি ও পঞ্চায়েতের মাথায় এরাই বসে আছে। প্রশাসনের বিভিন্ন পদে এরাই বসে আছে। এদের প্রায় প্রতিটি পরিবার থেকে অন্তত একজন সরকারি চাকরি করে (মোটা ঘুষ দিয়ে বা যোগাযোগের মাধ্যমে এদের পক্ষেই সম্ভব সরকারি চাকরি, ইস্কুল মাস্টারি জোটানো। জাতপাতের সম্পর্ক এবং পারিবারিক যোগাযোগ এখানে একটা বড় ভূমিকা পালন করে।) বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের টাকা বা মালপত্র এরা প্রায় পুরোটাই ঝেড়ে দেয়। সি পি এম ও তৃণমূলের এত মারামারি আসলে জনগণের সম্পদের উপর নিয়ন্ত্রণকে কেন্দ্র করে নয়া জোতদারদের নিজেদের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব। এই সব পার্টির নেতারা প্রশাসনকে নির্দেশ দেয় কোন্ টাকা কাকে দেওয়া হবে বা কোন্ খাতে ব্যায় হবে। সরকারি টাকা বা ক্ষমতার উপর নিয়ন্ত্রণ শুধুমাত্র জনগণের সম্পদ শোষণ করার জন্যই নয় বরং একাজে তাদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্যও আছে। এগুলিকে ব্যবহার করে তারা জনগণের একটা অংশকে কিনে নিয়ে নিজেদের গণভিত্তিকে বাড়ানো ও গুন্ডা বাহিনী তৈরির চেষ্টা করে এবং এগুলির বিলি বন্টনকে কেন্দ্র করে জনগণের মধ্যে বিরোধ তৈরি করা ও জিইয়ে রাখার চেষ্টা করে। এই ঘটনাগুলি নয়া জোতদার শ্রেণি এবং রাষ্ট্রের আঁতাতকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়। একটা জিনিষ দিনের আলোর মত স্পষ্ট – নয়া জোতদারদের বিরুদ্ধে গ্রামের গরিবের লড়াই জনগণের এই বিপুল সম্পদ লুঠের বিরুদ্ধে লড়াইও।

(১২) উদ্বৃত্তের ব্যবহার ঃ সাম্রাজ্যবাদ ও রাষ্ট্রের মদতে তৈরি হওয়া গ্রামাঞ্চলের এই নয়া জোতদার শ্রেণিটার সামন্ততান্ত্রিক চরিত্র আরও স্পষ্ট হয় তাদের উদ্বৃত্ত ব্যবহারের ধরন থেকে। এটাকে তারা মহাজনি, ইটভাটার ব্যবসা, বাস-লরির ব্যবসা, ঠিকাদারি, ছেলে-মেয়েকে বাইরের বড় ইস্কুলে পড়ানো, গ্রামে বা কাছের শহরে আধুনিক বাড়ি তৈরি, মজুতদারি, রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার (জনগণের একটা অংশকে কিনে নেওয়া, গুন্ডা পোষা, ভোটে দাঁড়ানো) প্রভৃতি কাজে লাগায়। অর্থাৎ, কৃষকদের আরও বড় আকারে অর্থনীতি বহির্ভূত শোষণের কাজে অথবা অকৃষি ক্ষেত্রে কাজে লাগায়। ফলে কৃষির কোন উন্নতি হয় না এবং সমগ্র কৃষি ক্ষেত্র একটা বদ্ধ জলায় পরিণত হয়। সেজন্য আমরা দেখছি যে, গত কয়েক বছর ধরে এরাজ্যের কৃষি উৎপাদন বিকাশের হার কমছে। তাই এটা বলা চলে যে, আমাদের রাজ্যের গ্রামের নয়া জোতদার শ্রেণি প্রধানত একটি সামন্ততান্ত্রিক শ্রেণি এবং এদের মধ্যে যে পুঁজিবাদী চরিত্র এসেছে তা আসলে দালাল ও আমলাতান্ত্রিক চরিত্রের।

সাধারণভাবে বলা যায় যে, আশির দশক থেকে পশ্চিমবাংলার গ্রামে সামন্তবাদের ভিত্তির উপর, সাম্রাজ্যবাদের নিয়ন্ত্রণের অধীনে এবং রাষ্ট্রীয় মদতে এক বিশেষ ধরনের পুঁজিবাদের বিকাশ ঘটানোর প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল। সেজন্য এই পুঁজিবাদের চরিত্র সামন্ততান্ত্রিক, দালাল এবং আমলাতান্ত্রিক। এই পুঁজিবাদ পুরোনো ধরনের সামন্ততান্ত্রিক সম্পর্কগুলিকে পরিবর্তিত করে এবং নতুন রূপ দেয়। এই প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে একটা নতুন ধরনের (আমলাতান্ত্রিক পুঁজিবাদী) জোতদার শ্রেণিকে গড়ে তোলে। আজকে যখন সাম্রেজ্যবাদ দ্বিতীয় সবুজ বিপ্লবের নামে আরও গভীরভাবে কৃষি ক্ষেত্রকে নিজের থাবার তলায় নিয়ে আসতে চাইছে তখন এই নয়া জোতদার শ্রেণিটাই তার হাতিয়ার হিসাবে কাজ করছে।

৭৭ সালের পর থেকে গ্রামাঞ্চলে রাজনৈতিক ক্ষমতা কাঠামোয় পরিবর্তন

আমরা উপরের আলোচনায় দেখেছি যে, নয়া জোতদারদের শোষণের উৎস ও ধরন বহুমুখী। পুরোনো শোষকদের শোষণের উৎস ছিল মূলত জমি, মহাজনি এবং ফসলের ব্যবসা। কিন্তু, নয়া জোতদারদের ক্ষেত্রে বিষয়টা এতটা সহজ ও প্রকাশ্য নয়। অনেক ক্ষেত্রেই এদের জমি খুব বেশি নয় এবং শোষণের প্রধান উৎস জমি নয়। ফলে অর্থনীতিবিদরা যখন জমির পরিমাণের ভিত্তিতে গ্রামের লোকের মধ্যে শ্রেণি বিভাজন করেন তাঁরা এটা ভুলে যান যে, যাদের তাঁরা জমির পরিমাণের ভিত্তিতে হয়তো মধ্য কৃষক বা গ্রামীণ বেকারের সারিতে ফেলেছেন তার মধ্যে হয়তো এই নয়া জোতদাররা পড়ে গেছে। নয়া জোতদারদের এই বহুমুখী শোষণকে টিঁকিয়ে রাখার জন্য একটা জটিল ও সর্বগ্রাসী রাজনৈতিক কাঠামোকে গড়ে তোলা হয়েছে। গ্রামের রাজনৈতিক ক্ষমতার এই কাঠামোটাকে বোঝাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। নচেৎ এই রাজ্যে আধা সামন্তবাদ বিরোধী সংগ্রাম গড়ে তোলা যাবে না।

পুরোনো জোতদারদের আমলে এলাকার রাজনৈতিক ক্ষমতা ছিল বড় জোতদার, মহাজন এবং ব্যবসাদার চক্রের হাতে। গ্রামের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনকে তারাই নিয়ন্ত্রণ করতো। কেন্দ্রীয় রাষ্ট্র ব্যবস্থা তাদের মাধ্যমেই এলাকার উপর নিজের শাসনকে প্রয়োগ করতো। জোতদারদের এলাকাগুলি ছিল অনেকটা স্বাধীন প্রজাতন্ত্রের মত। সামাজিক মেরুকরণ ও শ্রেণি দ্বন্দ্ব ছিল খুবই তীক্ষ্ণ এবং জনগণের এই সমস্ত শত্রুদের সহজেই চিহ্নিত করা যেত। ফলে তাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে খুব দ্রুত কৃষক জনগণকে শ্রেণি সংগ্রামের ময়দানে সমাবেশিত করা যেত। পঞ্চায়েত বলে তেমন কিছু ছিল না এবং শাসকশ্রেণির পার্টিগুলির এলাকার মাথা ছিল বড় জোতদার নিজে। পার্টি কাঠামো বলে তেমনকিছু ছিল না। আশির দশক থেকে অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। এখন আমরা দেখতে পাই যে, নয়া জোতদাররা প্রত্যক্ষ্য শাসনের বদলে পার্টি ও পঞ্চায়েতের মাধ্যমে শাসন চালায়। এগুলির উপর নিয়ন্ত্রণই তাদের ক্ষমতার উৎস।

তারা গ্রামাঞ্চলে পার্টি-পঞ্চায়েত-প্রশাসন-পুলিশের একটা জটিল চক্রকে গড়ে তুলেছে। এর মধ্যে নেতৃস্থানীয় ভূমিকা পালন করে পার্টি। এই প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের মাথায় বসে আছে নয়া জোতদাররা এবং এটাই তাদের ক্ষমতার উৎস। এই ক্ষমতাকে ব্যবহার করে তারা এলাকার অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনের প্রতিটি দিককে নিয়ন্ত্রণ করে। ওপর ওপর দেখলে মনে হবে সামন্ততান্ত্রিক ধাঁচে রাজা বা জমিদারের ব্যক্তিগত শাসনের বদলে এখন পুঁজিবাদী ধাঁচে নির্বাচিত প্রতিষ্ঠান, রাজনৈতিক দল, কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রীয় প্রশাসন প্রভৃতির শাসন কায়েম হয়েছে। কিন্তু, মনে রাখতে হবে যে এই সব প্রতিষ্ঠান বা দল কোন শ্রেণি উর্দ্ধ প্রতিষ্ঠান নয়। এগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করে গ্রামের নয়া জোতদার শ্রেণি এবং এই নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমেই তারা তাদের রাজনৈতিক শাসন চালায়। সেজন্য বলা চলা যে, পুঁজিবাদী রূপের শাসন কাঠামোটা আসলে গ্রামের জাতিবাদী–সামন্ততান্ত্রিক কর্তৃত্বকে টিঁকিয়ে রেখেছে। মূল কথা হলো বিষয়টার অন্তর্বস্তুকে বিচার করে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের নামে পঞ্চায়েতগুলিকে গড়ে তোলা হলেও আসলে একদিকে, এগুলি কেন্দ্রীয় রাষ্ট্র ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণকে একেবারে নিচ অব্দি প্রসারিত করে (জনগণের মধ্যেও একধরনের স্বশাসনের মোহ তৈরি হয়) এবং অন্যদিকে, এগুলিকে নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে নয়া জোতদাররা বিপুল পরিমাণ সরকারি টাকা এবং এলাকার উপর তাদের কর্তৃত্বকে বজায় রাখে । রাজ্য সরকারের একটা রিপোর্ট (২০০৪) বলছে যে, পঞ্চায়েত সদস্যদের মধ্যে জোতদার, ব্যবসাদার, শিক্ষক, চাকরিজীবীদের সংখ্যা বাড়ছে। এমনকি বেকার ও অন্যান্য সেবামূলক কাজে যুক্ত লোকদের সংখ্যা ৩০ থেকে ৪০ ভাগ। এরা কারা ? এদের বেশির ভাগটাই হল এলাকার পার্টি বস। এদের জমি না থাকলেও (বা কম থাকলেও) গ্রামের সমবায়, ইস্কুল কমিটি প্রভৃতিকে এরা নিয়ন্ত্রণ করে। সরকারি টাকার ভাগ বাটোয়ারা এদের হাতেই। এছাড়াও আছে সরকারি ঠিকাদারি, ব্যবসা প্রভৃতি। এই নিয়ন্ত্রণকে ব্যবহার করে এরা নামে বেনামে বিপুল সম্পদের মালিক হয়েছে। দেখা যাচ্ছে যে, এই ধরনের অকৃষিজীবী লোকের সংখ্যা পঞ্চায়েত সদস্যদের ৬০ভাগ। এটাই প্রমাণ করে যে, শুধুমাত্র জমির মালিকানার পরিমাণ দিয়ে গ্রামের শাসকদের চিহ্নিত করা যাবে না। বরং, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ এবং ক্ষমতার গোটা পরিপ্রেক্ষিতটাকে বিবেচনা করতে হবে।

আঞ্চলিক ক্ষমতার কাঠামোর অন্যতম স্তম্ভ (নেতৃত্বকারী) হল পার্টি। পার্টির ভূমিকাটাকে গভীরভাবে বোঝা দরকার। একেবারে তলার স্তর অব্দি শাখা প্রশাখা বিস্তৃত জালের মত পাটি ও গণ সংগঠনের কাঠামো পুরোনো জোতদারদের পার্টি কংগ্রেসের ছিল না (সি পি এমের থেকে সংগঠন তৈরি করাটা পরবর্তীকালে কংগ্রেস বা তৃণমূল শিখেছে)।

১. ক্ষমতায় আসার পর সি পি এম সরকারি ক্ষমতাকে ব্যবহার করে পার্টি ও গণ সংগঠনের একটা বিশাল জালকে গড়ে তোলে। সি পি এমের নেতারা নিজেরাই নয়া জোতদারে পরিবর্তিত হয় বা তাদের দালালে পরিণত হয়। পুরোনো জোতদারদের একটা বড় অংশ রঙ পাল্টে সি পি এমে ভিড়ে যায়। এখন যেমন সি পি এম পন্থী নয়া জোতদাররা রঙ পাল্টে তৃণমূলে ভিড়ে যাচ্ছে। সি পি এম ও তৃণমূলের মারামারি বা এখন প্রতিদিন তৃণমূলের দুই গ্রুপের যে মারামারি, খুনোখুনি হচ্ছে তার পিছনে আসল কারণ হলো সরকারি টাকা, ঠিকাদারি, সমবায়গুলির নিয়ন্ত্রণ ও শোষণের ভাগ নিয়ে নয়া জোতদারদের মধ্যেকার লড়াই। সি পি এমের মতো সংগঠিত পার্টি না হলেও তৃণমূলও এখন একেবারে নিচ অব্দি বিস্তৃত সংগঠন গড়ে তুলছে।

২. পুরোনো জোতদারদের লেঠেল বাহিনীর জায়গায় এসেছে পার্টিগুলির সংগঠিত ক্যাডার/গুন্ডা বাহিনী। এই ব্যাপারেও এরাজ্য অন্যদের থেকে এগিয়ে। সরকারি সুযোগ সুবিধা দিয়ে এমনকি খেটে খাওয়া মানুষের মধ্যে থেকে কিছু লোককে ক্যাডার/গুন্ডা/দালাল বানানো হয়েছে। এরা অনেক বেশি সংগঠিত এবং এদের হাতে রয়েছে বিপুল পরিমাণ আগ্নেয়াস্ত্র।

৩. পার্টির নেতারাই ঠিক করে দেয় সরকারি টাকার কতটা, কোথায় খরচ করা হবে, কাকে লোন পাইয়ে দেওয়া হবে, এমনকি জলের কল কোন পাড়ায় কার বাড়ির সামনে বসবে। এগুলির মাধ্যমে তারা বিশেষত গরিব মানুষের মধ্যে সামাজিক ভিত্তি তৈরি করে। যে কোন প্রতিবাদ আন্দোলন দমন করার জন্য তারা এই সামাজিক ভিত্তিটাকে কাজে লাগায়। বিভিন্ন পার্টিগুলি সুবিধা দিয়ে নিজেদের সামাজিক ভিত্তি তৈরি করে এবং নিজেদের এলাকার উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার জন্য জনগণের একটা অংশের সাথে আরেকটা অংশকে লড়িয়ে দেয়। গত তিরিশ বছরে বহু ঘটনা ঘটেছে যেখানে বিপ্লবীদের দমন করার জন্য সি পি এম গরিব মানুষকে জড়ো করেছে। এখন এই কাজটা তৃণমূল করছে। জনগণের মধ্যে গণ ভিত্তি তৈরি করা এবং সেটাকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করার এই ফ্যাসিবাদী পদ্ধতি আজকের দিনে পার্টিগুলির কর্ম পদ্ধতির একটা অন্যতম অঙ্গ।

৪. শাসক শ্রেণির পার্টি ও গণ সংগঠনগুলির প্রধান কাজ হলো রাষ্ট্রের প্রসারিত হাত হিসাবে কাজ করা। তাদের এই পার্টি জালটার কাজ হলো প্রতক্ষ্য রাষ্ট্রীয় বাহিনীর হস্তক্ষেপের আগে ও পাশাপাশি প্রতিটি সংগ্রামকে দমন করা। সেজন্য ছাত্রদের ন্যায্য সংগ্রাম দমন করার জন্য প্রথম হামলা চালাত এস এফ আই, শ্রমিক আন্দোলনে সিটু, কৃষক আন্দোলনে কৃষক সমিতি, কর্মচারীদের জন্য আছে কোঅর্ডিনেশন কমিটি। এখন ঠিক এই কাজগুলো করছে তৃণমূলের গণ সংগঠনগুলি। এরা শুধু রাষ্ট্রের প্রসারিত হাত হিসাবেই কাজ করে না, এছাড়াও চোখ কান হিসাবে কাজ করে। এরা এলাকার প্রতিটি লোকের উপর নজরদারী চালায় এবং পুলিশের কাছে সময়মতো রিপোর্ট করে। প্রশাসন ও পুলিশের সাথে যোগাযোগ রাখার জন্য পার্টির কয়েক জনকে বিশেষ দায়িত্ব দেওয়া হয়। সেজন্য বিপ্লবীদের এমন ধরনের সংগঠনের জাল গড়ে তুলতে হবে যাতে ওদের চোখ কানকে ফাঁকি দেওয়া যায়। পার্টিগুলির এই অক্টোপাসের মত সংগঠন জনগণের জীবনের প্রত্যেকটি দিককে নিয়ন্ত্রণ করে। ফলে গ্রামাঞ্চলে এক দম বন্ধ করা পরিবেশ তৈরি হয়েছে। পারিবারিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের প্রতিটি দিককে নিয়ন্ত্রণ করে পার্টি। পার্টি ও পঞ্চায়েত অফিসগুলি পরিণত হয়েছে পুরোনো জোতদারদের কাছারি বাড়ির মত। গ্রামের বিচার সালিশ থেকে শুরু করে গ্রামের প্রত্যেকটা বিষয়কে নিয়ন্ত্রণ করা হয় পার্টি অফিস থেকে। যে কোন পারিবারিক, সামাজিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক বিরোধে পার্টি মাথা গলায় এবং পার্টির মতামত ছাড়া এই সব সমস্যার সমাধান করার অর্থ পার্টির বিরুদ্ধে কার্যত বিদ্রোহ। জনগণের জীবনের যে সব দিক নিয়ে পুরোনো জোতদাররা মাথা ঘামাত না সে সব বিষয় এখন পার্টির নিয়ন্ত্রণে এসেছে। মন্দির-মসজিদ কমিটি, যুবকদের ক্লাব, ইস্কুল কমিটি, ব্যবসায়ী সমিতি প্রভৃতির উপর পার্টির কড়া নিয়ন্ত্রণ এবং এই নিয়ে নিজেদের মধ্যে মারামারিও চলে। এমনকি বিভিন্ন জাতের নিজস্ব নেতৃত্বস্থানীয় কমিটিগুলিকেও নিয়ন্ত্রণ করে পার্টি। সবচেয়ে বড় উদাহরণ হলো মতুয়া সম্প্রদায়ের সর্বোচ্চ কমিটিকে নিয়ন্ত্রণের জন্য সি পি এম ও তৃণমূলের মারামারি। পার্টিগুলি এরকম বিরাট সংগঠন এবং গণ ভিত্তি গড়ে তোলার ফলে শাসক শ্রেণির পক্ষেও গ্রামের জনমতকে রাজনৈতিকভাবে প্রভাবিত করা এবং নিজেদের দিকে ঘোরানোও অনেক সুবিধা জনক।

সাধারণভাবে বললে, পুরোনো জোতদারদের আমলের তুলনায় আজকের দিনে গ্রামে সাম্রাজ্যবাদের আরও বড় আকারে অনুপ্রবেশের সাথে সাথে কেন্দ্রীয় রাষ্ট্র ব্যবস্থা তার কাঠামোকে গ্রাম স্তর অব্দি প্রসারিত করেছে। একাজে তার হাতিয়ার হল পার্টি এবং পঞ্চায়েত। উপরের আলোচনায় আমরা দেখলাম কিভাবে গ্রামাঞ্চলে শাসন চালানোর জন্য পার্টি-পঞ্চায়েত-পুলিশ-প্রশাসনের একটা চক্রকে গড়ে তোলা হয়েছে যার মাথায় বসে আছে পার্টি। আর গ্রামের ক্ষমতার চূড়ায়

বসে থাকা এই সব লোকেরাই হলো নয়া জোতদার যারা তাদের এই ক্ষমতাকে ব্যবহার করে প্রতক্ষ্য উৎপাদকদের কাছ থেকে উদ্বৃত্ত নিংড়ে নিচ্ছে। সি পি এম আমলে তৈরি হওয়া এই নয়া জোতদারদের সর্বগ্রাসী শাসনে গ্রামাঞ্চলে একটা দমবন্ধ করা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল। এদের বিরুদ্ধে মানুষ বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে বিদ্রোহ করেছেন। সি পি এম সব সময় এই বিদ্রোহগুলিকে দমন করেছে। কিন্তু, এবারে নন্দীগ্রাম-লালগড় তাদের সব হিসাব গড়বড় করে দিয়েছিল। এই দুই জায়গাতেই জনগণ মাওবাদী বিপ্লবীদের নেতৃত্বে সি পি এমের সশস্ত্র গুন্ডা ও পুলিশের আক্রমণকে সফলভাবে রুখে দেয়। বিদ্রোহের আগুন দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়ে। বিভিন্ন এলাকায় জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে সি পি এমের কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে শুরু করেন। কিন্তু জনগণের এই বিদ্রোহকে বিপ্লবী দিশা দিতে এবং এই বিদ্রোহের উপর ভিত্তি করে জনযুদ্ধকে একটা নতুন উচ্চতায় তুলতে বিপ্লবীরা সফল হন নি (কেন সেটা পরে আলোচনা করা হয়েছে)। ফাঁকা জায়গায় ঢুকে পড়ে তৃণমূল।

২০১১ সালের পরিবর্তনের বিশ্লেষণ

শাসক শ্রেণির প্রচারমাধ্যম ও পোষা বুদ্ধিজীবীরা প্রচার করছে যে সি পি এমের অত্যাচারে মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছিল এবং মমতা এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিল। মমতার আত্মত্যাগে মানুষ উদ্বুদ্ধ হয়ে ব্যাপকভাবে তৃণমূলকে ভোট দেয়। ফলে তৃণমূল ক্ষমতায় আসে। কিন্তু, ব্যাপারটা এত সোজা ছিল না। সি পি এমের বিরুদ্ধে লড়াই দুটো ধারায় চলেছিল। প্রধান ও সত্যিকারের লড়াকু ধারাটা ছিল মাওবাদী বিপ্লবীদের নেতৃত্বে পরিচালিত সংগ্রাম। আগেও সি পি এমের বিরুদ্ধে জনগণ লড়াই করেছেন। কিন্তু, প্রতিবারেই সি পি এম তার নিজস্ব সশস্ত্র গুন্ডাবাহিনী ও পুলিশের সাহায্যে আন্দোলনগুলোকে দমন করেছে। গত ৩৫ বছরে এই প্রথমবার নন্দীগ্রাম ও লালগড়ের জনগণ বিপ্লবীদের নেতৃত্বে সি পি এমের সশস্ত্র গুন্ডা ও পুলিশকে আটকে দিতে সফল হয়। মাওবাদীদের নেতৃত্বে পরিচালিত এই সশস্ত্র সংগ্রাম ছাড়া মমতাকে নন্দীগ্রাম থেকে একটা বড় দশ টাকা দামের রসগোল্লা নিয়ে বাড়ি আসতে হত। সুতরাং, এটা পরিস্কারভাবে আমাদের বলতে হবে যে, সি পি এমের রাজত্বকে খতম করে দেবার পিছনে নির্ধারক ভূমিকা পালন করেছে মাওবাদী বিপ্লবীদের সশস্ত্র বাহিনী এবং তাঁদের পরিচালিত সশস্ত্র প্রতিরোধ। এটা ছাড়া সি পি এমের লাশের বোঝাকে কখনোই ঝেড়ে ফেলা যেত না।

কিন্তু, বিপ্লবীদের লড়াইয়ের ধারা ছাড়াও সি পি এম বিরোধিতার আরও একটা ধারা ছিল। জনগণ ও বিপ্লবীরাই কেবলমাত্র সি পি এমের বিরোধিতা করছিলেন তাইই নয়, বরং খোদ শাসকশ্রেণির মধ্যে একটা বড় অংশই সি পি এমকে ক্ষমতা থেকে সরাতে চাইছিল। জনগণ সি পি এমের উপর রেগে গিয়ে তাদের বিরুদ্ধে ভোট দিলেন তাই সি পি এম হেরে গেল, তৃণমূল ক্ষমতায় এসে গেল -- খেলাটা এত সহজ নয়। মনে রাখতে হবে কোন্ পার্টি ক্ষমতায় বসবে সেটা শেষ বিচারে নির্ভর করে শাসকশ্রেণির ইচ্ছার উপর (অবশ্য যখন বিপ্লবী সংগ্রামের প্রচন্ড অগ্রগতির ফলে বিপ্লবীরা নির্ধারক শক্তি হিসাবে উঠে এসেছে সেরকম পরিস্থিতিতে শাসকশ্রেণির সামনে খুব বেশি বিকল্প রাস্তা খোলা থাকে না)। বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় জনগণ এবং সরকারের পরিবর্তনের মধ্যেকার সম্পর্কটাকে নিয়ন্ত্রণ করে ও মধ্যস্থতা করে শাসকশ্রেণি (নয়া জোতদার, আমলাতান্ত্রিক বড় পুঁজিপতি ও সাম্রাজ্যবাদীরা)। তারা এটা বিভিন্নভাবে করতে পারে। তারা তাদের প্রচার মাধ্যমকে ব্যবহার করে জনগণের মতামতকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করার চেষ্টা করে। প্রশাসন, বিচার ব্যবস্থা, পুলিশকে (প্রয়োজন পড়লে এমনকি মিলিটারিকে) ব্যবহার করে এমন একটা পরিস্থিতি তৈরি করে যাতে সবার সামনে সরকার অপদার্থ বলে প্রমাণিত হয়। গ্রামের নয়া জোতদাররা তাদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক ও ধর্মীয় বা জাতপাতের প্রভাব প্রতিপত্তিকে ব্যবহার করে জনগণের একটা বড় অংশের ভোটকে ঘুরিয়ে দিতে পারে। বিরোধী পার্টির পিছনে ব্যাপকভাবে পয়সা ঢেলে তাদের শাসকপার্টির বিরুদ্ধে সমস্ত শক্তি নিয়ে লেলিয়ে দেওয়া হয়। মমতার ক্ষেত্রে আমরা এর প্রত্যেকটাকে দেখতে পেয়েছি। প্রচার মাধ্যমে এমনভাবে প্রচার করা হল যেন মমতা দুনিয়ার সবচেয়ে বড় লড়াকু। অথচ মমতার লড়াইয়ের পুঁজি কতটা ? ২৫-২৬ দিনের অনশন আর দু-একটা লাঠির বাড়ি খেয়ে একটু আধটু মাথা ফাটা (?), চুলের মুঠি বা ঘাড় ধাক্কা দিয়ে অবস্থান বিক্ষোভ থেকে জোর করে তুলে দেওয়া। ৭০-এর দশকে বিপ্লবী নকশালপন্থীরা জেলে এর থেকে তিন গুণ বেশি দিন অনশন করেছেন। আর বাকি যেটুকু লড়াই মমতা করেছে ঐটুকু লড়াই করে বিপ্লবী পার্টির সদস্যপদ তো দুরের কথা, এমনকি বিপ্লবী নকশালপন্থীদের কোন গণ সংগঠনের সাধারণ সদস্যপদও পাওয়া যায় না। সামান্য এটুকু লড়াইকে পাম্প বালিশের মত ফুলিয়ে বিরাট প্রচার করা হল। মমতার প্রচারের পিছনে ব্যাপকভাবে পয়সা ঢালা হল। মমতার ঐসব পচা ছবি পুঁজিপতিরা কোটি কোটি টাকায় কিনল। মমতার ভোটের প্রচারে পয়সার যোগানও হল, আবার পুঁজিপতিদের কালো টাকা সাদাও হল। এই পয়সার জোরে মমতার হেলিকপ্টার গ্রামেগঞ্জে ধুলোর ঝড় তুলে দিল। প্রশাসনের পুরোনো মাথারা (মনীশ গুপ্ত, সুলতান সিং -এর মত লোকেরা যারা একসময় মমতার মিছিলেই গুলি চালিয়েছিল) এবং শাসকশ্রেণির পোষা কিছু বুদ্ধিজীবীরা মমতার চারপাশে জড়ো হলো। কিন্তু, প্রশ্ন হলো শাসকশ্রেণি সি পি এমকে উচ্ছেদ করতে চাইছিল কেন ? এর একটাই উত্তর। সি পি এম শাসকশ্রেণির স্বার্থ পূরণ করতে ব্যর্থ হচ্ছিল। ৭৭ সালে যখন জনগণের প্রচন্ড লড়াইয়ের সামনে পুরোনো জোতদারী ব্যবস্থা ও তাদের পার্টি কংগ্রেসের শাসন আর টিঁকিয়ে রাখা যাচ্ছিল না তখন শাসকশ্রেণি সি পি এমকে ক্ষমতায় নিয়ে আসে। ৩৫ বছর ধরে সি পি এম একমনে শাসকশ্রেণির দালালি করে গেছে। হঠাৎ এমনকি হল যাতে সি পি এম শাসকশ্রেণির কাছে মরা কুকুর হয়ে গেল ? শাসকশ্রেণির এই ইচ্ছাটাকে বিশ্লেষণ করার দরকার আছে, তবেই আমরা ২০১১ সালের পরিবর্তনের আসল চরিত্রটাকে বুঝতে পারব।

শাসকশ্রেণি কেন সি পি এমের পিছনে লাগল সে সম্পর্কে দু-চার কথা বলা যেতে পারে। প্রথম, সাম্রাজ্যবাদী ও আমলাতান্ত্রিক বড় পুঁজিপতিরা চাইছিল আরও বড় আকারে এই রাজ্যে তাদের পুঁজি ঢোকাতে যাতে এখানকার সস্তা শ্রম ও প্রাকৃতিক সম্পদকে আরও বড় আকারে লুঠ করা যায়। এর জন্য দরকার ছিল চাষীদের উচ্ছেদ করে বিরাট পরিমাণ জমির দখল নেওয়া, চুক্তি চাষের ব্যবস্থা করা, খুচরো ব্যবসায় বিদেশী পুঁজির অবাধ ঢোকার ব্যবস্থা করা, শিক্ষাক্ষেত্রে দেশী-বিদেশী বড় পুঁজির ঢোকার ব্যবস্থা করা ইত্যাদি। সি পি এম এই কাজগুলি গত ৩০ - ৩৫ বছর ধরে ভালই করে আসছিল। কিন্তু, ২০০৪ - ০৫ সাল থেকেই জনগণ এসবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে শুরু করেন (মনে রাখতে হবে যে, সিঙ্গুর বা নন্দীগ্রামের সংগ্রামের কোনটাই মমতা বা তৃণমূল শুরু করে নি, জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই সংগ্রামগুলি শুরু করেছিলেন)। সাম্রাজ্যবাদের দালাল হিসাবে সি পি এমের দায়িত্ব ছিল এই সংগ্রামগুলিকে দমন করার। কিন্তু, সি পি এম এই কাজ করতে ব্যর্থ হচ্ছিল। দ্বিতীয়, নয়া জোতদার শ্রেণিও সি পি এমের উপর বিরক্ত হয়ে উঠেছিল। সি পি এমের আমলে প্রথম দিকে কৃষি উৎপাদন কিছুটা বাড়লেও ২০০০ সালের পর থেকে কৃষি একেবারে বদ্ধ জলায় পরিণত হয়েছিল। সার, বীজ, কীটনাশকের দাম বেড়ে যাচ্ছে অথচ ফসলের দাম কমে যাবার কারণে কৃষি থেকে লাভ প্রায় কিছুই ছিল না। এতে নয়া জোতদারদের ক্ষতি হচ্ছিল। এছাড়াও, নয়া জোতদারদের যে অংশটাকে বঞ্চিত করে সি পি এম একাই সব কিছু হজম করছিল তারাও রাগে ফুঁসছিল এবং সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। এরাই গ্রামের জনগণকে সি পি এমের বিরুদ্ধে ক্ষেপায়। তৃতীয়, এরাজ্যের জনগণকে শাসন করার জন্য সি পি এম একটা বিরাট পার্টি ও গণ সংগঠনের কাঠামোকে গড়ে তুলেছিল। জালের মত বিস্তৃত এই পার্টির মাধ্যমে তারা জনগণের জীবনের প্রতিটি দিককে নিয়ন্ত্রণ করতো। বিশেষ করে গ্রাম এলাকায় একটা দমবন্ধকরা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল। জনগণ এই সামাজিক ফ্যাসিবাদী শাসনের ফাঁস থেকে মুক্তি চাইছিলেন। তাঁরা বিভিন্ন সময় বিদ্রোহে ফেটে পড়ছিলেন। ফলে শাসকশ্রেণির পক্ষে সি পি এমের মাধ্যমে শাসন চালানোটা বিপজ্জনক হয়ে উঠেছিল। কারণ যে কোন মূল্যে সি পি এমের শাসন

চালিয়ে গেলে পরিস্থিতি হাতের বাইরে চলে যেতে পারে। কারণ গত ৮ – ১০ বছর ধরে জনগণের মধ্যে বিপ্লবী নকশালপন্থীদের দিকে চলে যাবার প্রবণতা বাড়ছিল। বিশেষ করে লালগড়ের সংগ্রাম তাদের বিপদে ফেলে। নন্দীগ্রামে তৃণমূলকে খাড়া করে কোন রকমে পরিস্থিতি সামাল দেওয়া গেলেও (তারা এটা করতে পেরেছিল কারণ নন্দীগ্রাম মাওবাদীদের প্রধান কাজের এলাকা থেকে অনেকটা দূরে পড়ে) লালগড়ে তারা বেকায়দায় পড়ে গেছিল। জনগণ দৃঢ়ভাবে বিপ্লবীদের নেতৃত্বে সংগঠিত হয়েছিলেন। সেজন্য পরিস্থিতি হাতের বাইরে যাবার আগেই তারা মমতাকে বিকল্প হিসাবে খাড়া করে। চতুর্থ, দেশী –বিদেশী বড় পুঁজির আরও বড় আকারে এরাজ্যে ঢোকার জন্য দরকার ছিল গতিশীল প্রশাসন যন্ত্র, দরকার সরকারি কর্মচারীদের চাবকে বুর্জোয়া শৃঙ্খলা শেখানো, শ্রমিকদের যথেচ্ছ শোষণ করার লাইসেন্স। কিন্তু, দীর্ঘদিন লড়াই করে শ্রমিক – কর্মচারীদের অর্জিত ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার ও অন্যান্য অধিকার গুলি কেড়ে নেওয়া সি পি এমের পক্ষে মুস্কিল ছিল কারণ এটা করতে গেলে তার নিজের সামাজিক ভিত্তিতে ফাটল ধরত। তাই অর্থনৈতিক – রাজনৈতিক সমস্ত দিক থেকেই সি পি এম শাসকশ্রেণির স্বার্থ পূরণ করতে ব্যর্থ হচ্ছিল। এই পরিস্থিতিতে শাসকশ্রেণি তাদের তরফ থেকে বিকল্প হিসাবে তৃণমূলকে সামনে নিয়ে আসে (কংগ্রেসকে দিয়ে এই কাজটা হতো না কারণ কংগ্রেস সি পি এমের বিরোধিতা করার চাইতে ভাগ বাঁটায়োরা করে খাওয়াতেই বেশি সময় দিত, তাছাড়া কেন্দ্রে মাঝেমাঝেই তাদের সি পি এমকে দরকার পড়ে)।

সুতরাং, আমরা দেখলাম যে সি পি এম বিরোধি লড়াইয়ের দুটো ধারা ছিল। প্রধান ধারা, বিপ্লবীদের নেতৃত্বে জনগণের সংগ্রামের ধারা। দ্বিতীয় ধারা, শাসকশ্রেণির ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে তোলা বিকল্প তৃণমূলের ধারা। বিপ্লবীদের কিছু ভুলত্রুটি এবং ধাক্কা তৃণমূলের কাজটাকে সহজ করে দেয়। জনগণের সি পি এম বিরোধি ক্ষোভকে ভোটের বাক্সে ব্যবহার করে তারা ক্ষমতায় আসতে সফল হয়।

২০১১-এর পরিবর্তনের ফলাফল

অনেকেই আশা করেছিলেন যে, মমতা ক্ষমতায় এলে অবস্থার মৌলিক পরিবর্তন হবে। কিন্তু, শাসকশ্রেণির দালাল মমতা স্বাভাবিকভাবেই শাসকশ্রেণির দালালি করবে। করছেও তাই। তবে সি পি এমের থেকে কিছুটা অন্য স্টাইলে। মমতার এই নতুন স্টাইলটাকে বোঝা দরকার। কয়েকটি উদাহরণ দিলে মমতার নতুন স্টাইলের দালালিটাকে বোঝা যাবে।

প্রথমত, মমতার সবচেয়ে বড় দায়িত্ব হলো সাম্রাজ্যবাদ ও তার দালাল দেশী আমলাতান্ত্রিক বড় বুর্জোয়ার পুঁজি ঢোকার পথ পরিস্কার করা। সি পি এম যেটা করতে গিয়ে পদে পদে হোঁচট খাচ্ছিল। সেজন্য মমতা এই কাজে খুব সতর্কভাবে হিসাব করে এগোচ্ছে। কারণ মমতার সামনে সিংগুর – নন্দীগ্রামের উদাহরণ আছে। সে জানে যে সি পি এমের স্টাইলে গা জোয়ারি করতে গেলে জনগণ আবার বিদ্রোহ করতে পারেন। মমতা এটা জানে যে, জমিতে হাত পড়লে কৃষকরা কোন পার্টির পরোয়া করবে না। সে এটাও জানে যে, সিংগুর বা নন্দীগ্রামের আন্দোলনের কোনটাই তৃণমূল শুরু করে নি। স্বতঃস্ফূর্তভাবে জনগণ পুলিশের জিপ জ্বালিয়ে, সি পি এমের ক্যাডারদের পেঁদিয়ে আন্দোলন শুরু করেছিলেন। সেজন্য মমতা পুলিশ, প্রশাসনকে ব্যবহার করে কেন্দ্রীভূত পদ্ধতিতে জমি দখল নেবার তীব্র বিরোধি। বরং মমতা বেশি জোর দিচ্ছে এলাকায় এলাকায় তৃণমূলী গুন্ডাদের দিয়ে সশস্ত্র বাহিনী (সিন্ডিকেট) গঠন করার উপর। এই সশস্ত্র গুন্ডারা এলাকায় এলাকায় কৃষকদের ভয় দেখিয়ে জমির দখল নেবে। আঞ্চলিক নয়া জোতদাররা এই বাহিনীর নেতৃত্ব দিচ্ছে। ইতিমধ্যেই উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগণার ভাঙড়, ক্যানিং, রাজারহাট এলাকায় আরাবুল চক্রের কার্যকলাপ থেকে এটা পরিস্কার। এর মধ্যে দিয়ে দেশি-বিদেশি বড় পুঁজির জন্য জমির ব্যবস্থা করা যাবে, আবার আঞ্চলিক নয়া জোতদারদের জন্য মোটা আয়ের ব্যবস্থা করা যাবে। পাশাপাশি, কিছু বেকার ছেলেদের আয়ের ব্যবস্থা করে তৃণমূলের সামাজিক ভিত্তিকেও প্রসারিত করা যাবে।

দ্বিতীয়ত, মমতা জানে যে, ঘন বসতি এলাকায় জমি নিতে গেলে জনগণ বিদ্রোহ করতে পারেন। তাই সে বিশেষ করে জোর দিচ্ছে জঙ্গলমহল, বর্ধমান–বীরভূম বা উত্তর বঙ্গের যেসব অপেক্ষাকৃত ফাঁকা জায়গা আছে সেই সব এলাকায় দেশি-বিদেশি পুঁজি নিয়ে যেতে। যেমন, উড়িষ্যার পিছিয়ে পড়া কেওনঝড়–জাজপুর এলাকা এখন একটা বিরাট শিল্পাঞ্চল। মমতা এই মডেলটাকে ধরে এগোতে চাইছে। এজন্য সে প্রতি মাসে মাসে জেলা সফরে যাচ্ছে যাতে প্রশাসনকে সচল করে তোলা যায়।

তৃতীয়ত, ক্ষমতায় আসার আগে মমতা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে, তার সরকার সেজ গড়তে দেবে না। মুখে অন্তত এখনও সে সেজের বিরোধিতা করে যাচ্ছে। অথচ আবার সে শিল্পপতিদের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে যে, সেজ গড়তে না দিলেও সেজে শিল্পপতিরা শ্রমিকদের শোষণ করার যে সমস্ত ঢালাও অধিকার পায় তার সবটাই সে দেবে। তার শিল্পমন্ত্রী দিল্লি গিয়ে দরবার করছে যাতে উইপ্রো – ইনফোসিসকে সেজের সমস্ত অধিকার দেওয়া হয়। এখানে আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে, ২০০5 সালে মমতা সেজ আইনের বিরোধিতা করে নি।

চতুর্থত, মমতা খুচরো ব্যবসায় বিদেশী পুঁজি ঢুকতে দিতে রাজি নয়। এটা করলে তার সামাজিক ভিত্তিতে টান পড়তে পারে কারণ খুচরো ব্যবসার সাথে বিশাল অংশের মানুষ জড়িত। এছাড়াও এরাজ্যের বড় (পাইকারি) ব্যবসাদার শ্রেণিটা মমতার পার্টিকে ভালো পয়সা দেয়, তাই তাদের স্বার্থে মমতার পক্ষে সরাসরি আঘাত করা সম্ভব নয়। সেজন্য এক্ষেত্রে সে ধাপে ধাপে এগোতে চায়। প্রথম ধাপে মমতা এখন চেষ্টা করছে খুচরো ও পাইকারি ব্যবসার গোটা কাঠামোটাকে ভেঙে ফেলা। যাতে পরের ধাপে বড় পুঁজি এই ক্ষেত্রটাকে দখল করতে পারে। সেজন্য মমতা বিভিন্ন জায়গায় গুপ্ত কায়দায় হকার উচ্ছেদ করছে। যেমন, হাওড়ায় পাঁচ হাজার হকারকে রাতের অন্ধকারে উচ্ছেদ করা হয়েছে। মমতা সবচেয়ে বেশি জোর দিচ্ছে ফসলের খুচরো ও পাইকারি ব্যবসার যে কাঠামোটাকে সি পি এম এতদিন ধরে চালিয়ে আসছিল সেটাকে ভেঙে দেওয়ার উপর। আমাদের আলোচনায় আমরা দেখেছি যে, কৃষিপণ্যের পাইকারি ব্যবসাকে নিয়ন্ত্রণ করে মূলত নয়া জোতদাররা। সাম্রাজ্যবাদ চাইছে আগামি দিনে এরাজ্যে দ্বিতীয় সবুজ বিপ্লবের কর্মসূচী লাগু করতে। এই সাম্রাজ্যবাদী পরিকল্পনার অংশ হিসাবে সাম্রাজ্যবাদ ও বড় পুঁজি চাইছে কৃষিপণ্যের খুচরো ও পাইকারি ব্যবসাকে নিজেদের হাতে নিতে। মমতা ঠিক এই পরিকল্পনা মোতাবেক এগোচ্ছে। প্রথম অবস্থায় পাইকারি ব্যবসা থেকে নয়া জোতদারদের উচ্ছেদ করলে তারা ক্ষেপে যেতে পারে। কিন্তু, পরবর্তী পর্যায়ে তাদের বড় পুঁজির ছোট শরিক বা আঞ্চলিক এজেন্ট হিসাবে জুড়ে নেওয়া হবে। সাম্রাজ্যবাদ যখনই সামন্তবাদকে রূপান্তরিত করে ও নতুন রূপে রক্ষা করে তখন ঠিক এটাই ঘটে। আশির দশকে যখন পুরোনো জোতদারদের সরিয়ে দিয়ে নয়া জোতদারদের তুলে আনা হয় তখন আমরা দেখেছি যে, পুরোনো জোতদাররা শোষণের নতুন ধরনগুলিকে রপ্ত করে নিয়ে নিজেদের নয়া জোতদারী ব্যবস্থার মধ্যে মিলিয়ে দেয়। সাম্রাজ্যবাদের এই পরিকল্পনা মোতাবেক মমতা এখন দালাল-ফড়েদের পিছনে লেগেছে। মমতা দালাল-ফড়েদের কৃষি পণ্যের ব্যবসা করতে দেবে না, আবার কৃষকদের থেকে ফসল কেনার জন্য ঠিকমতো সরকারি ব্যবস্থাও করবে না। অর্থাৎ গোটা ব্যবস্থাটাকে জনগণের চোখে পচিয়ে দেওয়া যাতে বড় পুঁজির ঢোকার

পক্ষে জনমত তৈরি করা যায়। সেজন্য মমতার মুখে আমরা এখন প্রায়ই শুনছি যে, বেসরকারি পুঁজির সহযোগিতায় পি পি পি মডেলে হিমঘর গড়ে তোলা হবে। সোজাকথায়, কৃষি ক্ষেত্রে দ্বিতীয় সবুজ বিপ্লবের সাম্রাজ্যবাদী পরিকল্পনা লাগু করার কাজ মমতা নতুন স্টাইলে শুরু করে দিয়েছে।

পঞ্চমত, সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির আর একটা বড় টার্গেট হল শিক্ষাক্ষেত্র। সাম্রাজ্যবাদ ও দেশীয় বড় পুঁজির স্বার্থে মমতা এখন শিক্ষাক্ষেত্রে বিভিন্ন রকম সংস্কার করতে শুরু করেছে। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচালন সমিতি থেকে ছাত্র ও কর্মচারীদের বাদ দেবার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এটা করার উদ্দেশ্য হলো যে সমস্ত বিদেশি বা দেশি বড় বড় শিক্ষা ব্যবসায়ী এদেশে শিক্ষা দেবার দোকান খুলবে সেই সব দোকান চালানোর কাজে ছাত্র বা শিক্ষা কর্মচারীরা কোন রকম হস্তক্ষেপ করতে না পারে কারণ তাতে তাদের (কু)শিক্ষা বিক্রি করে মোটা মাল কামাই করার কাজে বাধা আসতে পারে। এই কাজে তাদের আরও সুবিধা করে দেবার জন্য মমতা এখন ছাত্র ইউনিয়নগুলির অধিকার কেড়ে নেবার ব্যবস্থা করছে। ইতিমধ্যেই বিদেশি শিক্ষা ব্যবসায়ীদের এরাজ্যে সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলার অনুমতি দিয়েছে মমতার সরকার। সবচেয়ে বড় কথা বিভিন্ন কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার জন্য মমতা অমর্ত্য সেন, সুগত বসু, সুগত মারজিতদের মত সাম্রাজ্যবাদের দালালদের জড়ো করেছে মমতা। এই সব দালালরাই শিক্ষা ক্ষেত্রকে কিভাবে বিদেশিদের জন্য খুলে দেওয়া যায় তার পরামর্শ দিচ্ছে মমতাকে।

ষষ্ঠত, সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির আর একটা বড় পরিকল্পনা হল এরাজ্যে দ্বিতীয় সবুজ বিপ্লবের কর্মসূচী লাগু করা। এই লক্ষ্যে হিলারি এসে মমতার সাথে গোপন বৈঠক করে গেছে। কেন্দ্রীয় কৃষি মন্ত্রী শারদ পাওয়ার দুদিন অন্তর কলকাতায় এসে মমতার সাথে বৈঠক করছে। কেন্দ্র সরকার পূর্ব ভারতে দ্বিতীয় সবুজ বিপ্লবের জন্য বরাদ্দ ৪০০ কোটি থেকে বাড়িয়ে ১০০০ কোটি টাকা করেছে। প্রথম সবুজ বিপ্লবের ধাক্কায় পাঞ্জাব-হরিয়ানার কৃষি ধ্বংস করার পর সাম্রাজ্যবাদী শকুনদের এবার চোখ পড়েছে পূর্ব ভারতের দিকে। কারণ পূর্ব ভারতে প্রচুর বৃষ্টি হয়, প্রচুর নদনদী আছে, জমি খুবই উর্বর। অথচ সি পি এমে আমলে সাম্রাজ্যবাদী প্রথম সবুজ বিপ্লবের কর্মসূচীর অংশ হিসাবে ব্যাপকভাবে বোরো চাষ শুরু হয়। বোরো চাষের জন্য মাটির নিচ থেকে বিপুল পরিমাণ জল তোলার জন্য আমাদের রাজ্য বিরাট আর্সেনিক দূষণের কবলে পড়েছে। আমাদের রাজ্যের ৮১ টা ব্লক আর্সেনিক এবং ৪৯ টা ব্লক ফ্লোরাইডের বিষে আক্রান্ত। অথচ সাম্রাজ্যবাদের দালাল বুদ্ধিজীবীরা প্রচার করে চলেছে যে এটা এমন কোন বড় ব্যাপার নয়, এখনও ২৪০ টা ব্লক আছে যেখানে ততটা আর্সেনিকের বিপদ নেই। এদের যুক্তিটা হলো আর্সেনিকের বিষে গোটা বাংলার সমস্ত মানুষ পঙ্গু না হওয়া অব্দি চিন্তার কিছু নেই। মমতাও এই সব দালাল বুদ্ধিজীবীদের যুক্তি মেনে নিয়ে ইলেকট্রিক পাম্প লাগিয়ে মাটির নিচ থেকে জল তোলার উপর যে নিষেধাজ্ঞা ছিল সেটা তুলে নিয়েছে, এমনকি এই ধরনের পাম্প লাগানোর জন্য ইলেকট্রিক খরচাও কমিয়ে দিয়েছে। রাজ্য সরকারের টার্গেট হলো এই বছরের মধ্যে গ্রামাঞ্চলে আড়াই লক্ষ ইলেকট্রিক পাম্পের লাইন দেওয়া। মমতা দ্বিতীয় সবুজ বিপ্লবের কর্মসূচী লাগু করে একদিকে যেমন সাম্রাজ্যবাদীদের নির্দেশ মতো কাজ করছে তেমনি একই সাথে মমতা নয়া জোতদারদের স্বার্থ রক্ষা করার ব্যবস্থা করছে। (১) দ্বিতীয় সবুজ বিপ্লবের কর্মসূচী লাগু করার ফলে চাষের কাজে যন্ত্রপাতির ব্যবহার বাড়বে (যেমন, ইলেকট্রিক পাম্প প্রভৃতি)। তেমনি নতুন ধরনের বীজ (বাঁজা বীজ), সার, কীটনাশক, আগাছানাশক প্রভৃতির ব্যবহার বাড়বে। দেশি-বিদেশি বড় কোম্পানিরা এসব বিক্রি করে মোটা কামাই করবে। আবার তাদের আঞ্চলিক এজেন্ট হিসাবে নয়া জোতদাররাও এই ব্যবসা থেকে লাভের ভাগ পাবে। (২) যন্ত্রপাতি ব্যবহার বাড়লে নয়া জোতদারদের আর একটা দিক থেকেও লাভ আছে। তারা যন্ত্রপাতির ব্যবহার বাড়িয়ে ক্ষেতমজুরদের মজুরি কমিয়ে রাখতে পারবে। আমরা আগেই আলোচনা করেছি যে কিভাবে ক্ষেতমজুররা সমগ্র কৃষিক্ষেত্রের সাথে বাঁধা পড়েছে। যন্ত্রপাতির ব্যবহার এই বিরাট সংখ্যক (৯৪ লক্ষ) ক্ষেতমজুরদের কম মজুরিতে কাজ করতে বাধ্য করবে (এমনিতেই তারা এখন অনেক কম মজুরিতে কাজ করেন)। (৩) আগেই আমরা আলোচনা করেছি যে, কিভাবে ফসলের পাইকারি ও খুচরো ব্যবসার ক্ষেত্রে বড় বড় কোম্পানির আঞ্চলিক এজেন্ট হিসাবে নয়া জোতদারদের জুড়ে নেওয়া হবে। সাধারণভাবে বলা চলে যে, সাম্রাজ্যবাদ এই দ্বিতীয় সবুজ বিপ্লবের কর্মসূচীর মধ্যে দিয়ে গ্রামাঞ্চলের জাতিবাদী-সামন্তবাদকে আর একবার পুনর্গঠন করতে চলেছে এবং এই কর্মসূচীর মধ্যে দিয়ে এদেশের কৃষিক্ষেত্রে তাদের অনুপ্রবেশকে আরও প্রসারিত ও গভীরতর করা হবে। তারা এই কর্মসূচী লাগু করার হাতিয়ার হিসাবে মমতাকে ব্যবহার করছে। মমতার লক্ষ্য হলো এই কাজের মধ্যে নয়া জোতদারদের একটা নতুন অংশকে তুলে নিয়ে এসে নিজের শ্রেণি ভিত্তিকে সংহত করা এবং এইভাবে নিজের ক্ষমতাকে সংহত করা (ঠিক যেভাবে সি পি এম নয়া জোতদার শ্রেণিকে গড়ে তোলার কাজে সাম্রাজ্যবাদীদের হাতিয়ার হিসাবে কাজ করেছিল)। যারা মমতার কেলোর কীর্তিগুলি দেখে মমতাকে নির্বোধ ভাবছেন এবং মনে করছেন মমতা নিজের জালে জড়িয়ে খুব সহজেই উল্টে পড়বে তাঁরা মমতা নিঃশব্দে যে সব সংস্কার কর্মসূচী নিয়েছে তার দূরবর্তী প্রভাবকে লক্ষ্য করছেন না।

জনগণের অধিকার ও সংগ্রামের উপর আক্রমণ

সাম্রাজ্যবাদী ও তাদের দালাল আমলাতান্ত্রিক বড় বুর্জোয়ার ঢোকার পথ পরিস্কার করতে হলে প্রথম যেটা দরকার তা হল সিংগুর-নন্দীগ্রাম-লালগড় আন্দোলনের সময়কার গরম পরিস্থিতিকে ঠান্ডা করার। ক্ষমতায় আসার পরেপরেই সাম্রাজ্যবাদের দালাল মমতা ঠিক এই কাজটা সবার আগে করতে শুরু করেছে। মমতা প্রথম যে সংগ্রামকে ধ্বংস করার টার্গেট নেয় তা হল মাওবাদী বিপ্লবীদের সংগ্রাম। কারণ মমতা জানত এরাজ্যের জনগণের সমস্ত সংগ্রামের মেরুদন্ড হিসাবে কাজ করছে ও সাহস যোগাচ্ছে মাওবাদী বিপ্লবীদের সংগ্রাম। সেজন্য মমতা মাওবাদীদের জন্য একদিকে শান্তিচুক্তির ফাঁদ পাতে, অন্যদিকে কেন্দ্রের কাছ থেকে আরও বাহিনী এনে মাওবাদীদের উপর প্রচন্ড আক্রমণ শুরু করে। মমতার উদ্দেশ্য ছিল মুখে শান্তির কথা বলে সময় কেনা। শান্তিচুক্তির টোপ ঝুলিয়ে মমতা জঙ্গলমহলে তৃণমূলের সামাজিক ভিত্তিকে সংহত করা শুরু করে, একের পর এক এলাকায় নয়া জোতদার, সি পি এমের গুন্ডা বাহিনীর প্রাক্তন সদস্য, তৃণমূলের গুন্ডা, পুলিশের দালাল, আত্মসর্মপণ করা নকশালদের নিয়ে তৃণমূলের নেতৃত্বে আঞ্চলিক সশস্ত্র বাহিনী গড়ে তোলে। সেজন্য মাওবাদীরা একতরফাভাবে অ্যাকশন বন্ধ করার কথা ঘোষণা করলেও মমতা এটা ওটা অজুহাত দেখিয়ে সরকারি বাহিনীর অপারেশন বন্ধ করতে অস্বীকার করে। এরপর মমতা দুদিক থেকে সর্বাত্মক আক্রমণ শুরু করে। একদিকে তৃণমূলের বাহিনী অন্যদিকে সরকারি যৌথ বাহিনী। একের পর এক মাওবাদী নেতা-কর্মীকে খুন করতে শুরু করে। কিন্তু, দুঃখের বিষয় যখন শাসকশ্রেণি প্রচন্ড সর্বাত্মক আক্রমণ শুরু করার প্রস্তুতি নিচ্ছে বা আক্রমণ শুরু করেছে তখন মাওবাদীরা একতরফা শান্তি ঘোষণা করলেন। শাসকশ্রেণি যখন জনগণের মধ্যে শান্তির মোহ তৈরি করে সর্বাত্মক আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে তখন তার বিরুদ্ধে লড়াই করে শান্তির আসল চরিত্রকে জনগণের সামনে খুলে ধরার বদলে মাওবাদীরা নিজেরাই শান্তি ঘোষণা করলেন। শাসকশ্রেণির সর্বাত্মক আক্রমণের মুখে বিপ্লবী আন্দোলন সাময়িক ধাক্কার মুখে পড়ে।

এরপর মমতা বাকি আন্দোলনগুলিকে দমন করার কাজ হাতে নেয়। হাওড়ায় হকারদের উচ্ছেদ বিরোধি আন্দোলনকে দমন করা হয়। সবচেয়ে বড় উদাহরণ নোনাডাঙার সংগ্রাম। ক্ষমতায় আসার আগে মমতার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে উচ্ছেদ হবে না। কিন্তু, ক্ষমতায় আসার পরপরই নোনাডাঙায় উচ্ছেদ শুরু হয়। বাধা দিতে গেলে শুরু হয় ব্যপক দমন পীড়ন। এরপরে ঘটে দুবরাজপুরের লোবাতে কৃষকদের উপর গুলি চালানোর ঘটনা। শুধু সংগ্রামগুলিকে দমন করাই নয়

মমতা এখন শ্রমিক - কর্মচারীদের দীর্ঘ সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে অর্জিত অধিকারগুলিকে খতম করে দেবার কাজ হাতে নিয়েছে। শ্রমিক - কর্মচারী - ছাত্রদের ইউনিয়ন, সংগঠন করার অধিকার মমতা কেড়ে নিচ্ছে। জনগণের এই সব অধিকার সাম্রাজ্যবাদী শোষণের পথে বড় বাধা। মমতা এই সব বাধা পরিস্কার করার কাজে নেমেছে।

মমতা আরও একটা কাজ হাতে নিয়েছে। সমস্ত সামাজিক প্রতিষ্ঠান, ক্লাব, পঞ্চায়েত, স্কুল / কলেজ কমিটি, সমবায়, এমনকি ধর্মীয় সংগঠনের নেতৃত্ব দখল করার কাজে নেমেছে তৃণমূল। এর পিছনে মূল উদ্দেশ্য হলো এই সমস্ত সামাজিক প্রতিষ্ঠানকে নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে নয়া জোতদাররা জনগণের জীবনের প্রতিটি দিককে নিয়ন্ত্রণ করতে চায় এবং বিপুল সরকারি (জনগণের) টাকা পকেটে পুরতে চায়। গ্রামাঞ্চলের নয়া জোতদাররা রঙ বদলে এখন তৃণমূলকে মদত দিচ্ছে বা তৃণমূলের নেতা হয়ে বসেছে। ঠিক সি পি এমের কায়দায় পার্টি-পঞ্চায়েত-পুলিশ-প্রশাসনের একটা জালকে গড়ে তোলা হয়েছে নয়া জোতদারী শাসন -শোষণকে টিঁকিয়ে রাখা ও যেকোন প্রতিবাদকে গুঁড়িয়ে দেবার জন্য।

মমতার সবচেয়ে বড় সমস্যা

এই সমস্ত কাজ ঠিকঠাক করার পথে মমতার কতগুলি সমস্যা আছে। প্রথম, মমতার সবচেয়ে বড় সমস্যা হল সে নিজে। মমতা প্রশাসক হিসাবে একেবারেই ফালতু। বুর্জোয়া রাষ্ট্র - প্রশাসন চালাতে মমতা চরম ব্যর্থ। রেলের মন্ত্রি থাকার সময়ই মমতার অপদার্থতা প্রমাণিত হয়েছে। এখনও মমতা এমন সব কাজ করছে যাতে এমনকি শাসকশ্রেণিও ক্ষেপে যাচ্ছে। শাসকশ্রেণি চায় নন্দীগ্রাম - লালগড়ের সময়ের অস্থির পরিস্থিতি ঠান্ডা হোক। যাতে তারা অবাধে এরাজ্যের জনগণের সস্তা শ্রম, জমি, জল, জঙ্গল, খনিজ সম্পদ প্রভৃতি লুঠ করতে পারে। তাদের পুঁজি নিয়োগের পথের সমস্ত বাধা দুর হয়। এসবের জন্য প্রথম তাদের দরকার রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে ঠান্ডা করার। অথচ মমতা এমন সব কাজ করছে যাতে পরিস্থিতি ঠান্ডা হবার বদলে বরং গরম হয়ে যাচ্ছে। যেমন, ধর্ষণের ঘটনাগুলোকে ছোট ঘটনা বলা, অধ্যক্ষ পেটানো, কোন খবরের কাগজ পড়তে হবে তাও ঠিক করার চেষ্টা, তৃণমূলের ধেড়ে গুন্ডাগুলোকে ছোট ছোট ছেলে বলা, তৃণমূলের লোকদের অবাধে জামিন যোগ্য ধারা দিয়ে ছেড়ে দেওয়া, কার্টুন আঁকার অপরাধে অধ্যাপককে সারারাত ধরে পিটিয়ে জেলে পোরা প্রভৃতি। এছাড়াও, গুন্ডামো, ডাকাতি, ধর্ষণ প্রচন্ড বেড়ে যাচ্ছে, তৃণমূলের এক গ্রুপ আরেক গ্রুপকে খুন করছে, এমনকি গ্রামের নয়া জোতদারদের সি পি এমপন্থী অংশটাকেও আক্রমণ করছে তৃণমূলীরা, বিরোধি কথা বললেই ধোলাই চলছে। এমনকি সি পি এমপন্থী শিল্পপতিদেরও আক্রমণ করছে মমতার লোকজন। যেমন, হলদিয়াতে এ বি জি কোম্পানিকে তাড়ানোর জন্য শুভেন্দু অধিকারী উঠেপড়ে লেগেছে। এ বি জির বদলে মমতার চামচা টুটু বোসের হাতে মাল খালাসের দায়িত্ব তুলে দিতে চায় শুভেন্দু। শাসকশ্রেণি মমতার এই স্টাইলকে ভালভাবে নিচ্ছে না। এসবের ফলে জনগণও ক্ষেপে যাচ্ছেন। শাসকশ্রেণি ভয় পাচ্ছে যে, এর ফলে রাজ্যে একটা নৈরাজ্যের পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে। দ্বিতীয়, আর একটা সমস্যা হল মমতা ছাড়া বাকি তৃণমূলের নেতারা আরও অযোগ্য। তাদের একটাই কাজ সারাদিন-রাত ধরে দিদির ভজনা করা। এই সব নব্য তৃণমূল নেতাদের বেশির ভাগই আবার চরম দূর্নীতিগ্রস্থ, মস্তান। আবার মমতা সোমেন, সৌগতর মতো পুরোনো কংগ্রেসি বুড়ো ঘুঘুগুলোকে মাথা তুলতে দিতে চায় না কারণ এরা সুযোগ পেলেই মমতার গদির পায়া খুলে নিতে পারে। ফলে অন্য কেউ নেই যে এগিয়ে এসে পরিস্থিতি সামাল দিতে পারে। তৃতীয়, মমতার আর একটা সমস্যা হল তার হাতে সি পি এমের মতো পার্টি - গণ সংগঠনের একটা সুসংগঠিত জাল নেই। ফলে তার পক্ষে সমাজের সমস্ত দিককে নিয়ন্ত্রণ করাও মুস্কিল। জনগণকে নিয়ন্ত্রণ করতে গিয়ে তার ক্যাডাররা এমন সব কাজ করছে যেগুলোর নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা মমতার নেই। ধরে আনতে বললে বেঁধে আনছে। এর ফলে পরিস্থিতি আরও জটিল হচ্ছে।

মমতার এই সব কার্যকলাপের ফলে শাসকশ্রেণি ক্ষেপে যাচ্ছে। সেই জন্য শাসকশ্রেণির সংবাদ মাধ্যম মমতার বিরুদ্ধে আদাজল খেয়ে লেগেছে। তাদের টার্গেট হলো হয় মমতা নিজেকে শুধরে নিক নয়তো তারা একদিকে কংগ্রেসকে মমতার বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেবে (অথবা তৃণমূলের ভিতর থেকেই মমতা বিরোধি একটা অংশকে তুলে আনবে), অন্যদিকে আবার সি পি এমকে ফিরিয়ে আনবে। সেজন্য আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, সর্বভারতীয় শাসকশ্রেণির দল কংগ্রেস আজকাল মমতা সম্পর্কে কড়া অবস্থান নিয়েছে। কংগ্রেসের এখন একটাই কাজ - মমতাকে অযোগ্য, অপদার্থ হিসাবে তুলে ধরা। সেজন্য তারা রাজ্য সরকারের পাওনা টাকা দিতে টালবাহানা শুরু করেছে, রেলমন্ত্রী থাকার সময় মমতা যেসব দূর্নীতি করেছে বা মমতার শাকরেদরা চিট ফান্ডের নামে যে বিশাল টাকা চুরি করেছে সেসব নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে। কংগ্রেসের টার্গেট হলো মমতা ও তার কয়েকটা কট্টর শাকরেদকে বাদ দিয়ে গোটা তৃণমূল পার্টিটাকে গিলে খাওয়া। শিখা, শোভনদেব, রবীন্দ্রনাথের বিদ্রোহের পর সেই সম্ভাবনা উজ্জল হয়ে উঠেছে। সি পি এম আবার শাসক শ্রেণির সংবাদ মাধ্যমের কাছে ভালো হয়ে গেছে। মমতার এই সব কার্যকলাপের ফলে জনগণও ক্ষেপে যাচ্ছেন। সেজন্য বিভিন্ন জায়গায় আবার নতুন করে প্রতিরোধ শুরু হয়েছে। যেমন, নোনাডাঙা। সি পি এমের মুখোশ মানুষের কাছে খুলতে বেশকিছু বছর লেগেছিল। কিন্তু, মমতার মুখোশ খুলতে কয়েক মাসও লাগছে না। ফলে আজ পশ্চিমবাংলায় শাসকশ্রেণির দুটো প্রধান পার্টির চরিত্র মানুষের কাছে পরিস্কার হয়ে গেছে। এটা বিপ্লবী সংগ্রাম গড়ে তোলার পক্ষে সুবিধাজনক।

মমতার বাঁচার চেষ্টা

অনেকে এটা বলছেন যে, এই অবস্থা থেকে মমতার পক্ষে বেরিয়ে আসা অসম্ভব। কাজটা মমতার পক্ষে খুবই কঠিন। ঘটনা যেদিকে গড়াচ্ছে তাতে মমতা আরও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে। মমতা এমন সব কার্যকলাপ শুরু করেছে যার কোন মাথামুন্ডু নেই। কিন্তু, সত্যিই কি মমতার সামনে কোন পথই খোলা নেই ? এই ব্যাপারটা আমাদের ভালভাবে বুঝে নিতে হবে। নচেৎ আমরা সঠিক সময়ে সঠিক কৌশল নিতে পারব না। মমতা প্রধানত দুটো উপায়ে বাঁচবার চেষ্টা করছে। (১) আমরা আগেই আলোচনা করেছি যে, এরাজ্যে সাম্রাজ্যবাদ দ্বিতীয় সবুজ বিপ্লবের কর্মসূচী লাগু করতে শুরু করেছে। মমতা চাইছে এই কর্মসূচীকে ব্যবহার করে সাময়িকভাবে কৃষি সমস্যার সমাধান করে গ্রামাঞ্চলে তার সামাজিক ভিত্তিকে প্রসারিত করতে। ঠিক এই কাজটাই সি পি এম ৭৭ সালে ক্ষমতায় আসার পর করেছিল। মমতাও চাইছে দ্বিতীয় সবুজ বিপ্লবের কর্মসূচী লাগু করে সাময়িকভাবে কৃষি উৎপাদন বাড়াতে এবং গ্রামের বিপুল পরিমাণ ক্ষেতমজুরদের কিছুটা কাজের ব্যবস্থা করে সাময়িকভাবে কৃষির সমস্যার সমাধান করতে এবং এইভাবে জনগণের মধ্যে তার ভিত্তিকে কিছুটা বাড়াতে। পশ্চিমবাংলার গ্রামের জাতিবাদী-সামন্তবাদী ব্যবস্থাকে নতুন করে পুনর্গঠনের এই কর্মসূচীর মধ্যে দিয়ে মমতা নয়া জোতদারদের একটা নতুন অংশকে তুলে এনে তার শাসনের শ্রেণি ভিত্তিকে সংহত করার চেষ্টা করছে। (২) মমতা মায়াবতীর ধাঁচে এরাজ্যে স্যোশাল ইঞ্জিনিয়ারিং চালাতে চায়। আমাদের রাজ্যের দলিত-আদিবাসী-মুসলিমরা দীর্ঘকাল ধরেই চরম দুরবস্থার মধ্যে রয়েছেন। ভোটবাজ বামপন্থীরা কোনকালেই তাঁদের বঞ্চনা - শোষণের বিরুদ্ধে মুখ খোলে নি। নকশালপন্থীদের একটা বড় অংশই মনে করে যে, বিপ্লব হলে এসব সমস্যার সমাধান এমনিতেই হয়ে যাবে। এই সব শোষণ বঞ্চনার বিরুদ্ধে আলাদা করে লড়াই করার কোন মানে হয় না। এমন একটা পরিবেশ তৈরি করা হয়েছে যেখানে দলিতদের বা মুসলিমদের বঞ্চনা নিয়ে কথা বললেই তার উপর জাতপাতের রাজনীতি বা সাম্প্রদায়িক রাজনীতি বলে ছাপ্পা মেরে দেওয়া হবে।

বাংলার বাবু সমাজে জাতপাতের কথা বলা বা মুসলমানদের কথা বলা মানে মহা অপরাধ। (কিছুদিন আগে এমনকি এক বাঙালী বাবু আশিষ নন্দী পরিস্কার বলেছে যে, দলিতরা চোর হয়। তাকে বাঁচানোর জন্য অনেক বাঙালী বুদ্ধিজীবী বাবুরা ময়দানে নেমে গা গরম করছে।) বাঙালী বাবুদের কাছে এটা খুবই গর্বের বিষয় যে, এরাজ্যে বিহার বা উত্তর প্রদেশের মত জাতপাতের রাজনীতি হয় না। অথচ বাস্তবটা হলো জাতপাতের শোষণ বা মুসলমানদের শোষণের ব্যাপারে এরাজ্য কোনমতেই পিছিয়ে নেই। আমাদের রাজ্যে সমস্ত ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার বা সরকারি উচ্চপদ একচেটিয়াভাবে দখল করে রেখেছে মূলত ব্রাহ্মণ, কায়স্থ বা বৈদ্যরা। তারাই গ্রামের অধিকাংশ জমির মালিক। দলিত-আদিবাসী-মুসলিমরা হয় শহরের অসংগঠিত ক্ষেত্রের দিনমজুর বা গ্রামের ক্ষেতমজুর যাঁরা খুবই কম মজুরিতে কাজ করেন। সরকারি চাকরি তাঁদের জোটে না বা জুটলেও সরকারি অফিসের বেয়ারা, নাইট গার্ড বা সাফাই কর্মচারীর কাজ জোটে কারণ বাবুরা ঐ কাজগুলি কোনদিনই করে না। এমনকি অধিকাংশ পার্টির নেতারা ঐ তিন উচ্চজাতি থেকে এসেছে (এমনকি নকশালপন্থীদের মধ্যেও বড় নেতারা প্রায় সবাই উচ্চজাতির থেকে আসা। সত্তরের দশকে চারু মজুমদার গরিব ভূমিহীন কৃষকদের নেতৃত্বে তুলে আনার লাইন নেওয়ার ফলে অনেক দলিত-আদিবাসী-মুসলিম আঞ্চলিক নেতা হিসাবে উঠে এসেছিলেন। কিন্তু, তখনও এই প্রশ্নে একটা সুস্পষ্ট লাইন গড়ে তোলা হয় নি।)। এরাজ্যে জাতের বা ধর্মের বাইরে বিয়ের ঘটনা খুবই সামান্য। বাংলা গল্প, নাটক, টিভি সিরিয়াল ও সিনেমার নায়করা বা প্রধান চরিত্ররা সব সময় ব্রাহ্মণ, কায়স্থ বা বৈদ্য, কখনোই বাগদি বা বাউরি বা রুইদাস নয়। ছোঁয়াছুঁয়ির ব্যাপারটা বেশ ভালরকম আছে। কিছুদিন আগেই এরাজ্যের গ্রামে একটি স্কুলে একজন রুইদাস মহিলার হাতে রান্না করা খাবার খেতে উচ্চজাতির ছাত্র-ছাত্রীরা অস্বীকার করে, এমনকি বি ডি ও নিজে গিয়েও ঐসব ছাত্র-ছাত্রীদের অভিভাবকদের বুঝিয়ে রাজি করাতে পারে নি। এরকম ঘটনা এরাজ্যে আকছার ঘটে। এসবের বিরুদ্ধে বললে তাকে জাতপাতের রাজনীতি করার দায়ে অভিযুক্ত করা হবে। আসলে এই রাজ্যে জাতপাতের রাজনীতির বিরোধিতার আড়ালে ব্রাহ্মণ্যবাদকে টিঁকিয়ে রাখা হয়েছে। কিন্তু, দীর্ঘকাল দলিত-আদিবাসীরা বা মুসলিমরা তাঁদের উপর এই ব্রাহ্মণ্যবাদী শোষণের বিরুদ্ধে চুপ করে থাকবেন না। ইদানীং তাঁদের মধ্যে ব্রাহ্মণ্যবাদী শোষণের বিরুদ্ধে সংগঠিত হবার চেষ্টা দেখা যাচ্ছে। যেমন, মুসলিমদের মধ্যে সাচার কমিটির রিপোর্ট বের হবার পর সংগঠিত হবার প্রবণতা দেখা গেছে। কিন্তু, দুঃখের বিষয় নিপীড়িত জাতি বা মুসলিমরা মূলত তাঁদের সম্প্রদায়ের মধ্যে যারা কিছুটা পয়সাওয়ালা, ব্যবসাদার বা নয়া জোতদার তাদের নেতৃত্বে সংগঠিত হচ্ছেন। এটা বিপ্লবী আন্দোলনের একটা মারাত্মক দূর্বলতাকে দেখিয়ে দেয়। ব্রাহ্মণ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের গুরুত্ব ও এই প্রশ্নে একটা সুস্পষ্ট লাইন গড়ে তুলতে বিপ্লবীদের দূর্বলতার কারণে এটা হতে পারছে। মমতা ঠিক এই জায়গাটাকেই ব্যবহার করতে চাইছে। মমতা এখন কয়েকটি বিশেষ সম্প্রদায়ের মাথাদের মদত দিতে শুরু করেছে। বিশেষ করে মতুয়া, মুসলিম, আদিবাসীদের মাথাদের সাথে ঐক্য গড়ে তোলার উপর মমতা গুরুত্ব দিচ্ছে কারণ এটা একটা বিরাট ভোটব্যংক। এই সম্প্রদায়ের মাথাদের মন্ত্রী করা, তাদের কিছু পাইয়ে দেবার উপর মমতা জোর দিচ্ছে। তাছাড়া কিছু সরকারি চাকরি, নানা রকম সুবিধা পাইয়ে দিয়ে (বিশেষ করে আদিবাসীদের পুলিশে নিয়োগ করে) একটা দালাল অংশকে তৈরি করতে চাইছে মমতা। তার উদ্দেশ্য এদের মাধ্যমে এইসব সম্প্রদায়ের ভোটটাকে হাতে রাখা। বিপ্লবীদের দায়িত্ব হলো শাসকশ্রেণির এই নয়া কৌশলকে বুঝে সেই মতো ব্রাহ্মণ্যবাদ বিরোধি সংগ্রামের প্রশ্নে একটা সঠিক লাইন গড়ে তোলা এবং এই সংগ্রামের কর্তব্যকে নিজেদের কাঁধে তুলে নেওয়া ও বিপ্লবের বড় লক্ষ্যের সাথে এই সংগ্রামকে যুক্ত করা। নচেৎ শাসকশ্রেণির পার্টিগুলি তাদের স্বার্থে এই সমস্ত নিপীড়িত জাতি ও সম্প্রদায়কে ব্যবহার করবে।

এছাড়াও মমতা কিছু রাজনৈতিক কৌশল ব্যবহার করে দীর্ঘকাল ক্ষমতায় থাকার পরিকল্পনা করেছে। যেমন, মমতা জানে যে এরাজ্যে দীর্ঘকাল যাবৎ কমিউনিষ্টদের নেতৃত্বে বহু সংগ্রাম পরিচালিত হয়েছে। ফলে জনগণের মধ্যেও সি পি এমের উপর ঘৃণা থাকলেও বামপন্থার প্রতি একটা স্বাভাবিক টান বা ঝোঁক রয়েছে। এরাজ্যের জনগণ সকল সময় অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদকে প্রশংসার চোখে দেখেন। জনগণের এই মনোভাবকে ব্যবহার করার জন্য মমতা বিভিন্ন প্রশ্নে বামপন্থী প্রতিবাদী হাবভাব বজায় রাখতে চেষ্টা করছে। সে দেখাতে চায় যে, সে সবচেয়ে বড় বামপন্থী। এটা করে সে সি পি এমের ভোট ব্যংককে খাবলা মারতে চায়। সেজন্য আমরা দেখি যে, খুচরো ব্যবসায় বিদেশী বিনিয়োগের প্রশ্নে সে সি পি এমের চেয়ে বেশি হুঙ্কার দিতে শুরু করেছে। সিঙ্গুর সমস্যাটাকে মমতা খুব কায়দা করে বাঁচিয়ে রাখছে যাতে সময় সুযোগ বুঝে (খুব সম্ভবত পঞ্চায়েত ভোটের আগে) আবার টাটার জমি দখলের হাওয়া তুলে নিজের জঙ্গী বামপন্থী ভাবমূর্তিকে তুলে ধরা যায়। বামপন্থী মুখোশ পরার জন্য মমতা এখন সি পি এমের সাথে পাল্লা দিচ্ছে। মমতার এই বামপন্থী সাজার নক্সাটা সম্পর্কে জনগণকে সতর্ক করাটা বিপ্লবীদের দায়িত্ব। তাছাড়া মমতা আর একটা কৌশল নিয়ে চলছে – কংগ্রেসকে মুছে দেবার চেষ্টা। মমতা জানে কংগ্রেসের কিছু বাঁধা ভোট আছে (বিশেষ করে পুরানো জোতদার পরিবারগুলির ভোট)। যে ভোটটাকে ভাঙতে না পারলে তার একার পক্ষে জেতা সম্ভব নয়। সাম্প্রতিককালে দেখা যাচ্ছে দলে দলে এমনকি ব্লক ও জেলাস্তরেও কংগ্রেসি নেতারা তৃণমূলে যোগ দিচ্ছে। তবে মমতা যত গাড্ডায় পড়বে তত এই প্রবণতাটা ঘুরতে থাকবে। ফলে আগামী পঞ্চায়েত বা অন্য ভোটগুলিতে মমতা খারাপ ফল করলে তৃণমূল থেকে কংগ্রেসে ফেরার প্রবণতাটা বাড়বে। সাধারণভাবে বলা যায়, মমতার উদ্দেশ্য হলো একদিকে, বামপন্থী সেজে বাম ভোটে খাবলা মারা এবং অন্যদিকে, কংগ্রেসকে শেষ করে দিয়ে কংগ্রেসের বাঁধা ভোটটাকে পকেটে পোরা।

সাধারণভাবে যুব সমাজ মমতার উপর বিরক্ত কারণ তারা আশা করেছিল যে, মমতা ক্ষমতায় এলে চাকরি হবে। কিন্তু, জন্মদিন পালন, পায়খানা-বাথরুমের উদ্বোধন, জগাই-মাধাই (ত্রিফলা) আলো, নীল রঙ, মেলা-উৎসব প্রভৃতি করার পর মমতার হাতে আর পয়সা নেই। সে এমনকি সরকারি কর্মচারীদের মাইনে দিতে পারছে না, নতুন চাকরি তো দুরের কথা। উল্টে অবসরের বয়স ষাট থেকে বাষট্টি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কিন্তু, তার মানে এই নয় যে, মমতা তার সরকারি ক্ষমতাকে ব্যবহার করে নিজের সামাজিক ভিত্তিকে বাড়াতে চাইছে না। সরকারি চাকরি বা বেসরকারি পুঁজি এনে বেসরকারি ক্ষেত্রে চাকরির ব্যবস্থা করতে না পারলেও মমতা তার স্টাইলে পাইয়ে দেবার রাজনীতি শুরু করেছে। যেমন, ত্রিফলা আলো লাগানোর কাজটা বড় কোম্পানিকে দিয়ে না করিয়ে ছোট ছোট ভাগে ভাগ করে এলাকার যুবকদের (বিশেষ করে তৃণমূলের ছেলেদের) দিয়ে দিয়েছে, এলাকায় এলাকায় তৃণমূলের নেতারা যুবকদের নিয়ে সিন্ডিকেট গঠন করে দাদাগিরি করে ঠিকাদারি-প্রমোটারি-মাছের ভেড়ি- ঘরবাড়ি তৈরির মাল সাপ্লাই প্রভৃতি শুরু করেছে, চিট ফান্ড তৈরি করে জনগণের কাছ থেকে বিরাট পরিমাণ টাকা তুলছে, বিভিন্ন কোম্পানির থেকে ভালো পরিমাণ চাঁদা আদায় করছে, তৃণমূলের নেতারা মোটা টাকা খেয়ে রেল বা পরিবহন বা প্রাথমিক স্কুলের মাস্টারি প্রভৃতি চাকরি জুটিয়ে দিচ্ছে। এসব করে এলাকার যুবকদের একটা অংশকে তৃণমূলের গুন্ডা-লুম্পেন বাহিনী হিসাবে গড়ে তোলা হচ্ছে। এদের দাদাগিরি, মস্তানি, চুরি, ডাকাতি, খুন, ধর্ষণ প্রভৃতি করার লাইসেন্স দিয়ে দেওয়া হয়েছে, পুলিশ চোখ বুজে থাকছে। ফলে আজকাল আমরা দেখতে পাচ্ছি চুরি, ডাকাতি, ধর্ষণ, মস্তানি ব্যপক হারে বেড়ে গেছে। এলাকার উপর কর্তৃত্ব চালানোর জন্য তৃণমূল এই লুম্পেন বাহিনীটাকে ব্যবহার করছে।

মমতা এখন প্রায় প্রতিদিন নিয়ম করে বিবেকানন্দ, বিদ্যাসাগর, রামমোহন প্রভৃতিদের জন্মদিন পালন করছে। মোড়ে মোড়ে রবীন্দ্রনাথের গান বাজছে, জ্যোতি বোসের বাড়ির নাম বদলে নজরুল ভবন করে দেওয়া হয়েছে। এসব করার পিছনে মমতার আসল উদ্দেশ্য হলো বাঙালি উগ্র জাতীয়তাবাদে সুড়সুড়ি দেওয়া। মমতা দেখাতে চাইছে যে এতদিন সি পি এম মার্কস, লেনিনের মত বিদেশিদের মাথায় তুলে নেচেছে। সেজন্য এখন তার সরকার বাঙালি মনীষিদের তুলে ধরছে। মমতা চাইছে বাঙালি উগ্রজাতীয়তাবাদে সুড়সুড়ি দিয়ে নিজের ভিত্তিকে প্রসারিত করতে এবং বিশেষ করে মধ্যবিত্ত সমাজের মধ্যে নিজের ভিতকে শক্তিশালী করতে।

মমতা আমাদের ভুলিয়ে দিতে চায় যে, রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র ও অন্যান্য যেসব মনীষির জন্মদিন সে পালন করছে তাদের বেশির ভাগই ইংরেজদের দালালি করেছিল এবং হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদকে মদত দিয়েছিল। আমাদের ভুলিয়ে দিতে চায় যে, বংলার নবজাগরণ ছিল মূলত একটা ভুয়ো নবজাগরণ যা সাম্রাজ্যবাদের মদতে গড়ে ওঠা দালাল শ্রেণির নবজাগরণ ছাড়া আর কিছুই ছিল না। এছাড়াও নবজাগরণের নায়কদের প্রায় প্রত্যেকেই ছিল গ্রামের জমিদার। সি পি এমও মমতার সাথে এব্যপারে পাল্লা দেবার জন্য গণসঙ্গীত বাদ দিয়ে রবীন্দ্রসঙ্গীত শুরু করেছে, বংলার ভুয়ো নবজাগরণের নায়কদের মাথায় তুলে নাচছে। কিন্তু, মমতার এই রসুন সংস্কৃতির দুধে চোনা মেরে দিচ্ছে তার ছোট ছোট ছেলেরা ক্যাবারে ডান্স করে।

সি পি এমের কৌশল

এবারে আমাদের বিচার করতে হবে সি পি এম আবার ক্ষমতায় ফিরে আসার জন্য কি ধরনের কৌশল নিয়ে এগোচ্ছে। কারণ মমতা বিরোধি ক্ষোভকে ব্যবহার করার চেষ্টা যেমন বিপ্লবীরা করবে তেমনি সি পি এমও করবে। বিপ্লবীরা চেষ্টা করছে জনগণকে বিপ্লবের পথে নিয়ে যাবার জন্য, তেমনি সি পি এমও চেষ্টা করছে জনগণকে ভোটের লাইনে এনে ভোট বাড়াতে। সেজন্য জনগণকে আবার সি পি এমের দিকে যাওয়াটাকে আটকানোর জন্য আমাদের সি পি এমের কৌশলটাকে বুঝতে হবে। নচেৎ আমরা সি পি এমের সাথে রাজনৈতিক প্রতিযোগিতায় হেরে যাব।

সি পি এম এখন একটা নেতিবাচক কৌশল নিয়ে চলছিল। যার মূল কথা অপেক্ষা করা ও পরিস্থিতির উপর নজর রাখা। তাদের হিসাবটা হল, যত সময় যাবে মমতা তত নিজেকে পচিয়ে ফেলবে। তারা ভালই জানে মমতা যে সব বড় বড় প্রতিশ্রুতি দিয়ে সাড়া জাগিয়ে ক্ষমতায় এসেছিল তার অধিকাংশই মমতা পূরণ করতে পারবে না। এভাবে মমতা জনগণের চোখে পচে যাবে এবং তারা সেই সুযোগটাকে কাজে লাগিয়ে ক্ষমতায় ফেরত আসবে। সেজন্য তৃণমূল সরকার ক্ষমতায় আসার পর পরই সি পি এমের নেতারা বলতে শুরু করেছিল যে, মমতাকে সময় দিতে হবে। তাদের একথা বলার আসল উদ্দেশ্য হলো মমতাকে পচতে সময় দিতে হবে। এখন যখন মমতা অনেকটা পচে গেছে তাই তারা আবার ময়দানে নেমে গর্জন করতে শুরু করেছে। বুদ্ধ ঘোমটা সরিয়ে আবার ফিল্ডিং করতে নেমেছে।

সি পি এমের নেতিবাচক কৌশলের আরেকটা দিক হল তারা তাদের পলিসির কোন পরিবর্তন করে নি এবং কোন আন্দোলন গড়ে তোলার কর্মসূচী হাতে নেয় নি। এখনও সি পি এমের নেতারা গলাবাজি করে যাচ্ছে যে সিংগুর – নন্দীগ্রামে কৃষকের জমি দখল করার সিদ্ধান্ত সঠিক ছিল এবং তাদের শিল্পায়ন নীতিতে কোন ভুল নেই। ক্ষমতায় আসার জন্য মমতা সি পি এমের বিরুদ্ধে জনগণের কাছে বিরাট বিরাট প্রতিশ্রুতির বন্যা বইয়ে দিয়েছিল এবং সিংগুর–নন্দীগ্রামের আন্দোলনকে ব্যবহার করে জনগণের মধ্যে সি পি এম বিরোধি ক্ষোভকে উসকে দিয়েছিল। সি পি এম সেই পথে হাঁটতে চাইছে না। তারা কোন প্রতিশ্রুতির ধার দিয়ে যাচ্ছে না। তাদের লক্ষ্য হলো নীতির বা পলিসির কোনরকম পরিবর্তন না করে অপেক্ষা করা এবং মমতার উপর ক্ষুব্ধ জনগণ তাদের একটা সময় এমনিই ফিরিয়ে আনবে। সেজন্য সি পি এম তাদের সাম্রাজ্যবাদের দালালি করার কর্মসূচীতে কোন পরিবর্তন আনে নি। শুধুমাত্র বলেছে ক্যাডারদের ঔদ্ধত্য কমাতে হবে, জনগণের সাথে ভদ্রভাবে কথা বলতে হবে। সি পি এম কোন প্রতিশ্রুতির দায়ভার নিতে চায় না। এখন প্রতিশ্রুতি দিয়ে পরে পালন না করলে তখন জনগণের গালি খাবার ঝুটঝামেলায় তারা যেতে চায় না। সেজন্য কেরালার ধাঁচে কোন সাম্রাজ্যবাদ বিরোধি হুঙ্কার বা ভাঙচুরের কর্মসূচী তারা এরাজ্যে নিচ্ছে না। তারা যে তাদের নীতির বা পলিসির কোন পরিবর্তন করেনি সেটা জনগণের কাছে পরিস্কার করে তুলে ধরার দায়িত্ব বিপ্লবীদের নিতে হবে নচেৎ সি পি এমের ফিরে আসার পথ পরিস্কার হবে।

সি পি এম জনগণের সমস্ত রকম আন্দোলন থেকে গা বাঁচিয়ে চলছে। কারণ তারা জানে যে এখনো জনগণের মধ্যে যথেষ্ট শক্তিশালী সি পি এম বিরোধি মনোভাব আছে। তাদের এই কৌশলের কারণ হলো সি পি এম জানে তারা সরাসরি গেলে আন্দোলনের স্বাভাবিক বিকাশ ক্ষতিগ্রস্থ হবে। জনগণও তাদের মেনে নেবেন না। যেমন, সাম্প্রতিক নোনাডাঙা বা লোবার সংগ্রাম। তাছাড়া সি পি এম থাকলে অন্য অনেক শক্তি আন্দোলন থেকে সরে যাবে। তৃণমূলও সি পি এমের চক্রান্ত বলে প্রচার করার সুযোগ পেয়ে যাবে। সেজন্য সি পি এম না এলেই বরং যেকোন আন্দোলন নিজের গতিতে বিকশিত হবে। তৃণমূল জনগণের আন্দোলনের উপর আক্রমণ নামিয়ে আনলে মানুষ তৃণমূলের উপর ক্ষেপে যাবেন। সি পি এমের ছক হলো তারা পরে এর ফসল ভোটের বাক্সে তুলবে। এতে সি পি এমের ঘাড়ে কোন প্রতিশ্রুতি পালনের বোঝাও চাপলো না, আবার ভোটও পাওয়া গেল। সি পি এমের এই ঘাপটি মেরে পড়ে থাকার কৌশলকে জনগণের সামনে তুলে ধরতে হবে নচেৎ তাঁরা তৃণমূলের উপর ক্ষেপে গিয়ে আবার সি পি এমের কাছেই ফিরে যাবেন।

কিন্তু, মমতার সমালোচনা করতে সি পি এম ছাড়ছে না। সেটাও তারা করছে অনেকটা ভদ্র ভঙ্গিতে (আনন্দবাজারের শিখিয়ে দেওয়া ব্রাহ্মণ্যবাদী ভদ্র ভাষা ও সৌজন্যের মুখোশে), আগের মতো দাঁত-নখ বার করছে না। তারা জনগণের কাছে নিজেদের একটা নতুন নরম, ভদ্র ভাবমূর্তি গড়ে তুলতে চাইছে। অর্থাৎ, ভিতরের মালটাকে একই রেখে শুধুমাত্র উপরের খোলসটাকে বদলাতে চাইছে। এর সবচেয়ে বড় উদাহরণ হলো তারা তাদের নীতির কোন পরিবর্তন করেনি। এছাড়া তারা তাদের পার্টি কাঠামোর মধ্যেও তেমন কোন পরিবর্তন করেনি। মুখে মাঝে মাঝে শুদ্ধিকরণের কথা বললেও পার্টির নেতৃত্বে তেমন কোন বদল ঘটায়নি। আপাতত লক্ষণ শেঠ, মজিদ মাষ্টার, সুশান্ত ঘোষের মত কুখ্যাত বদমায়েশদের পর্দার পিছনে পাঠিয়েছে। সি পি এমের এই ভুয়ো নরমভাবের মুখোশ আমাদের জনগণের কাছে খুলে ধরতে হবে।

সি পি এম তাদের এই নরম ভাবটা কেবলমাত্র জনগণকে দেখাতে চাইছে এমনটা নয়, তারা এটা শাসকশ্রেণিকেও দেখাতে চাইছে। তারা শাসকশ্রেণিকে দেখাতে চাইছে যে, তারা শান্তির পক্ষে, তারা সমস্ত রাজনৈতিক দল মিলে মিশে থাকার (খাবার) পক্ষে। বরং তৃণমূলীরাই যত অশান্তির নায়ক, উগ্র। কারণ সি পি এম এটা বুঝেছে যে, শাসকশ্রেণিও মমতার স্টাইল, গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব, খুনোখুনি, রাজনৈতিক অস্থিরতা তৈরির পদ্ধতির উপর বিরক্ত। এগুলো তাদের পুঁজি বিনিয়োগের পথে বাধা। সি পি এম এখন শাসকশ্রেণিকে বোঝাতে চাইছে যে, তারা আরও দক্ষভাবে শাসকশ্রেণির স্বার্থের দেখভাল করতে পারে। শাসকশ্রেণিও সি পি এমের কথা অনেকটা বুঝতে শুরু করেছে। সেজন্য আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, সর্বভারতীয় শাসকশ্রেণির পার্টি কংগ্রেস মমতাকে বিশেষ কোন আর্থিক প্যাকেজ দেয় নি, অধীর-দীপার মত কট্টর মমতা বিরোধি রাজ্য নেতাদের মমতার বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিচ্ছে।

সাধারণভাবে বলা চলে যে, মমতার সরকারের জনবিরোধি কার্যকলাপের ফলে শ্রেণিসংগ্রাম গড়ে তোলার সুযোগ বাড়ছে। প্রায় প্রতিদিন মমতা এমন সব কাজ করছে যাতে জনগণের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি হচ্ছে। এগুলো আমাদের সামনে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের বড় সুযোগ তৈরি করছে। কিন্তু, বিপ্লবীদের সামনে একটা

বড় সমস্যা হল মাওবাদীদের নেতৃত্বে জঙ্গলমহলে চলমান সশস্ত্র সংগ্রামের ধাক্কা। ফলে এই পরিস্থিতি বিপ্লবীদের সামনে বেশকিছু বিপদকে তুলে ধরে। বিপদ হলো বিপ্লবীদের দূর্বলতার সুযোগে অন্যান্য ভোটবাজ পার্টিগুলি বিশেষ করে সি পি এম মমতা বিরোধি ক্ষোভকে ব্যবহার করতে পারে ও এই সুযোগে আবার ক্ষমতায় ফেরত আসতে পারে। এছাড়াও আগামী দিনে বিপ্লবীদের নেতৃত্বে গড়ে ওঠা কোন লড়াইকে তারা নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করতে পারে। আমাদের পরিস্কার করে বুঝে নিতে হবে যে, এই বিপদগুলো সত্যিকারের বিপদ। এবং এটাও বুঝে নিতে হবে যে, বিপ্লবীদের দূর্বলতার কারণে এই বিপদকে মোকাবিলা করার ক্ষেত্রে একটা সীমা আছে। কিন্তু, তাসত্ত্বেও সঠিক দিশা নিয়ে এগোতে পারলে বিপ্লবী শিবির এই সীমাবদ্ধতার মধ্যেও পরিস্থিতির সম্ভাবনার দিকটার সুযোগ নিয়ে বড় আকারে বিকশিত হতে পারে। সেজন্য বিপ্লবী শিবিরের ধাক্কার কারণটাকে নিয়ে বিশ্লেষণের কাজটা হাতে নেওয়া একটা গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য হিসাবে উঠে এসেছে।

বিপ্লবী সংগ্রামে ধাক্কা

জঙ্গলমহলের সংগ্রামের ধাক্কা গোটা পরিস্থিতি ও জনগণের মানসিকতার উপর গভীর প্রভাব ফেলে গেছে। এই ঘটনাটা গভীর বিশ্লেষণের দাবি রাখে। এই ধাক্কার বিশ্লেষণ সবচেয়ে ভালোভাবে তাঁরাই করতে পারেন যাঁরা এই বীরত্বপূর্ণ আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। কিন্তু, বিপ্লবী সংগ্রামে এরকম ধাক্কা আসতেই পারে বা এগোনো পিছানো হতেই পারে এই অজুহাতে এই বিশ্লেষণের কাজটাকে বাদ দেওয়া বা পিছিয়ে দেওয়া বা এড়িয়ে যাওয়া যেতে পারে না। কারণ আজ আমাদের রাজ্য একটা সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আছে। শাসকশ্রেণির পার্টিগুলির আসল চরিত্র বেরিয়ে পড়েছে, জনগণ আবার নতুন করে পথ খুঁজছেন। এই পরিস্থিতি বিপ্লবীদের হস্তক্ষেপ দাবি করে। বিপ্লবীরা তখনই পরিস্থিতির উপর সঠিকভাবে হস্তক্ষেপ করতে পারেন যখন তাঁরা অতীতের ভুল বা সীমাবদ্ধতাগুলিকে গভীরভাবে বিশ্লেষণ করবেন ও সঠিক শিক্ষাগুলি গ্রহণ করবেন। তাছাড়া জনগণও এতবড় একটা সশস্ত্র সংগ্রাম কেন ধাক্কা খেল সেটাকে বুঝতে চাইছেন বা বিপ্লবীদের কাছে জানতে চাইছেন। সেজন্য আমরা এখানে এই ধাক্কার বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছি। আমরা জানি এই বিশ্লেষণ অসম্পূর্ণ ও প্রাথমিক স্তরের। তাসত্ত্বেও পরিস্থিতি আমাদের কাছে এরকম বিশ্লেষণের দাবি রাখে। আমাদের আশা মাওবাদীরা নিজেরাই আরও গভীর বিশ্লেষণ আগামী দিনে হাজির করবেন। যার মধ্যে দিয়ে আমরা আরও গভীরতর ধারণায় পৌঁছব। লালগড় আন্দোলন ধাক্কা খাবার পরও মাওবাদীরা সশস্ত্র সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছিলেন। কিন্তু, মাওবাদীদের তরফ থেকে একতরফাভাবে ঘোষিত শান্তিচুক্তির পর্যায় শেষ হবার পর আবার যখন তাঁরা অ্যাকশন শুরু করেন তারপর খুব দ্রুত গতিতে একের পর এক নেতা – কর্মী শহীদ হয়ে যাওয়া, ধরা পড়ে যাওয়া এবং অবশেষে কমরেড কিষাণজির শহিদ হবার মত ঘটনাগুলি ঘটতে থাকে। খুব ছোট সময়ের মধ্যে আন্দোলন একটা বড় ধাক্কা খায়।

মাওবাদীদের পরিচালিত সশস্ত্র সংগ্রাম আমাদের সামনে অনেক মূল্যবান শিক্ষা রেখে গেছে। এই সঠিক শিক্ষাগুলিকে গ্রহণ না করে আগামী দিনে কোন সশস্ত্র সংগ্রাম এগোতে পারে না। প্রথমত, নন্দীগ্রাম ও লালগড়ের আন্দোলনের মেরুদন্ড হিসাবে কাজ করেছেন মাওবাদীরা। তাঁদের সশস্ত্র শক্তি ছাড়া ঐ আন্দোলনগুলিকে টিঁকিয়ে রাখা যেত না এবং সি পি এমকে আটকে দেওয়া যেত না। ফলে বাকি বাংলার মানুষও মাওবাদীদের দৃঢ় প্রতিরোধ দেখে উৎসাহিত হন এবং বিভিন্ন এলাকায় সি পি এমের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ শুরু হয়। দ্বিতীয়ত, মাওবাদীরা তাঁদের সংগ্রামের মাধ্যমে এই রাজ্যে রাজনৈতিক মেরুকরণকে গভীরতর করেন। ব্যাপক অংশের মানুষ সি পি এমের বিরুদ্ধে সমাবেশিত হন। তৃতীয়ত, মাওবাদীরা তাঁদের সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে বাংলার বুকে সশস্ত্র সংগ্রামের রাজনীতিকে আবার জনগণের চেতনায় প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন। জনগণকে এই ভোটবাজীর ব্যবস্থা থেকে বেরোবার নতুন পথের সন্ধান দিয়েছিলেন মাওবাদীরা। চতুর্থত, ব্রাহ্মণ্যবাদ হাজার হাজার বছর ধরে যাঁদের পায়ের তলায় ফেলে রেখেছিল সেই আদিবাসী জনগণকে সি পি আই (মাওবাদী) পার্টি সমাজের একেবারে সামনের সারিতে তুলে এনেছে। বহু দক্ষ ও লড়াকু আদিবাসী নেতা উঠে এসেছেন এবং এটা প্রমাণিত হয়েছে ভারতের বিপ্লবী সংগ্রামের একটা প্রধান শক্তি হলেন আদিবাসী জনগণ।

প্রাথমিকভাবে আমাদের মনে হয় : (১) জঙ্গলমহলের সশস্ত্র সংগ্রামের গোটা পর্যায়ে কখনোই ক্ষমতা দখলের প্রশ্নটাকে প্রধান করে তোলা হয় নি। বিভিন্ন সময় আন্দোলনের লক্ষ্য হিসাবে প্রধানত সি পি এমের সন্ত্রাস, উন্নয়ন, শান্তি প্রভৃতি প্রশ্নকে সামনে আনা হয়েছে। মাওবাদীরা তাঁদের সংগ্রামকে সশস্ত্র প্রতিরোধ সংগ্রাম হিসাবে তুলে ধরেছিলেন। সশস্ত্র প্রতিরোধের অর্থ হলো আক্রান্ত হলে সশস্ত্র প্রতিরক্ষা গড়ে তোলা। রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের জন্য পরিকল্পনামাফিক আমাদের সমস্ত শক্তিকে নিয়োজিত করে যুদ্ধকে ঠেলে এগিয়ে নিয়ে গিয়ে, একটা সর্বাত্মক প্রচেষ্টার মাধ্যমেই কেবলমাত্র জনগণের সমগ্র বিপ্লবী কর্মক্ষমতা পুরোমাত্রায় উন্মুক্ত করা যায়। প্রতিশোধ নেবার জন্য অথবা শত্রুর দমনকে প্রতিরোধ করার জন্য যুদ্ধের দ্বারা নয়, বরং একমাত্র সর্বাত্মক যুদ্ধের মাধ্যমেই আমরা শত্রুর সাথে বিভাজন রেখা টানতে পারি এবং বিভিন্ন শ্রেণিগুলির মধ্যে মেরুকরণ গভীরতর করতে পারি। শত্রু সবসময় আমাদের শক্তির তুলনায় অনেক বেশি শক্তিকে নিয়োগ করে এবং সামরিকভাবে, রাজনৈতিকভাবে, মতাদর্শগতভাবে, অর্থনৈতিকভাবে, মানসিকভাবে, সাংস্কৃতিকভাবে ও কুৎসা প্রচার অভিযানের মাধ্যমে সর্বাত্মক যুদ্ধ চালায়। সুতরাং আমরা যদি যুদ্ধকে সীমাবদ্ধ করি প্রতিরোধ যুদ্ধ, শত্রুর বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়ায় তবে তা জনগণকে বিভ্রান্ত করবে। এর ফলে জনগণের যে কর্তব্য ও ভূমিকা নেওয়া উচিত তা স্পষ্টভাবে তাঁদের সামনে আসবে না এবং এই কারণে তাঁদের শক্তিকে পুরোপুরি কাজে লাগানো যাবে না। নকশালবাড়ির সংগ্রামের অভিজ্ঞতা এর সবচেয়ে বড় উদাহরণ। নকশালবাড়ির সংগ্রামে ক্ষমতা দখলের জন্য সর্বাত্মকভাবে এগিয়ে যাওয়ার রাজনৈতিক অন্তর্বস্তুটি ছিল স্পষ্ট ও জোরালো। এই কারণেই নকশালবাড়ির বিপ্লবী সংগ্রাম সারা দেশে একটা ঝড় তুলতে পেরেছিল।

(২) রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের প্রশ্নটাকে সমস্ত কাজের ভরকেন্দ্রে না রাখার ফলে জনগণের চেতনায় ক্ষমতা দখলের চিন্তাটা অনেকটাই ঝাপসা হয়ে গিয়েছিল। রাজ্যের বাকি এলাকার জনগণের মধ্যেও এই আন্দোলনকে প্রধানত উন্নয়ন, সি পি এমের সন্ত্রাস বিরোধী আন্দোলন হিসাবে দেখার একটা শক্তিশালী প্রবণতা তৈরি হয়েছিল। ক্ষমতা দখলের চেতনায় শিক্ষিত না করার ফলে একটা সময় জনগণের একটা বড় অংশের মধ্যে আরও বড় আত্মত্যাগের জন্য এগিয়ে যাবার বদলে শান্তি ও কিছু সুযোগসুবিধা পাওয়ার মোহ তৈরি হয়। এতে আরও ইন্ধন যোগায় মাওবাদী নেতৃত্বের তরফ থেকে "মমতাকে মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে দেখতে চাই", "ছত্রধরকে বাদ দিয়ে জঙ্গলমহলের লড়াই ভাবাই যায় না" এই ধরনের বিবৃতি। এগুলি জনগণকে আরও বিভ্রান্ত করে। সেজন্য আমরা দেখলাম যে, যেখানে

তৃণমূলের প্রায় কোন সংগঠনই ছিল না সেখানে তারা ছত্রধরকে পরাজিত করে। কারণ অনেকেই মনে করেছিলেন যে, তৃণমূল জিতলে তবেই শান্তি বা উন্নয়ন আসতে পারে বা সি পি এমের সন্ত্রাসের হাত থেকে বাঁচা যেতে পারে। ভুল রাজনৈতিক শিক্ষা জনগণকে রাজনৈতিকভাবে ও মতাদর্শগতভাবে অপ্রস্তুত করে দেয় যার ফলে শাসকশ্রেণির পক্ষে সুবিধা হয় জনগণের থেকে বিপ্লবীদের বিচ্ছিন্ন করে দিতে। যে কোন বিপ্লবেই সমাজের অর্থনৈতিক পরিবর্তন, উন্নয়ন প্রভৃতির প্রশ্ন থাকে। কিন্তু ক্ষমতা দখলের প্রশ্নের বদলে যদি আমরা এগুলিকে প্রধান করে তুলি তবে শাসকশ্রেণি এগুলিকে ব্যবহার করে আমাদের বিচ্ছিন্ন করে ফেলতে পারে। মমতা ঠিক এই খেলাটাই খেলেছে। উল্টোদিকে, আমরা দেখি যে সত্তরের দশকে জোতদারদের থেকে দখল করা জমির উপর কৃষকদের আইনি অধিকার দেবার হরেকৃষ্ণ কোঙারের প্রস্তাবের মুখে লাথি মেরে জনগণ ক্ষমতা দখলের লক্ষ্যে সশস্ত্র সংগ্রামে সমস্ত শক্তি দিয়ে চরম আত্মত্যাগের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। কারণ সেই সময় চারু মজুমদারের নেতৃত্বে সি পি আই (এম–এল) পার্টি জনগণকে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের শিক্ষা দিয়েছিল বা বলা চলে সেই সময় পার্টি ক্ষমতার প্রশ্নটাতে সমস্ত দৃষ্টিকে কেন্দ্রীভূত করেছিল। কিন্তু, আমরা দেখলাম এবারে পশ্চিমবাংলার অধিকাংশ মানুষের চেতনায় এটা প্রায় অনুপস্থিত যে, জঙ্গলমহলে যেটা চলছে সেটা একটা বিপ্লব, যার মধ্যে দিয়ে নতুন সমাজ জন্ম নিচ্ছে।

(৩) ক্ষমতা দখলের চেতনায় উদ্বুদ্ধ সচেতন জনগণের বিপ্লবী গণভিত্তি গড়ে তোলার কাজটাতে ভালোরকম খামতি ছিল। ফলে তৃণমূল (এবং শাসকশ্রেণির প্রচারমাধ্যম) যখন প্রতিশ্রুতি দিয়েছে শান্তি ও উন্নয়ন তারাই সবচেয়ে ভালোভাবে দিতে পারে তখন একটা বড় অংশের মানুষের মধ্যে শান্তি ও উন্নয়নের মোহ তৈরি হয়েছিল। এটা দেখিয়ে দেয় যে, একটা বিপ্লবী পার্টি কেবলমাত্র নিজস্ব সচেতন বিপ্লবী জনভিত্তির উপর দাঁড়িয়েই টিকতে পারে ও বিকশিত হতে পারে। অন্য কোন আংশিক দাবির উপর গড়ে ওঠা জনভিত্তিকে সাময়িকভাবে ব্যবহার করতে পারলেও দীর্ঘস্থায়ী ভিত্তিতে তা করা সম্ভব নয়। শাসকশ্রেণি এই ধরনের জনভিত্তিকে পাইয়ে দেবার রাজনীতি দিয়ে তাদের দিকে টেনে নিতে পারে, তখন বিপ্লবীদের দাঁড়ানোর জায়গা থাকবে না। জঙ্গলমহলে ঠিক এটাই ঘটেছে।

(৪) যুদ্ধকে জনপ্রিয় করে তোলার প্রশ্নে জঙ্গলমহলের সংগ্রামের দুর্বলতা ছিল। শ্রেণিশত্রু খতমের এমন সব পদ্ধতিকে ব্যবহার করা হয়েছে (যেমন, ছোট ছোট ছাত্রদের সামনে মাস্টারকে খতম করা প্রভৃতি) যা গোটা রাজ্যের জনগণের মধ্যে খুব খারাপ প্রভাব ফেলেছে। এই সুযোগে প্রচার মাধ্যম ব্যাপকভাবে মাওবাদীদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালাতে শুরু করে। এটা যুদ্ধের বিস্তার ও জনপ্রিয় করার কাজের ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি করেছে। শ্রেণিশত্রু খতমের অ্যাকশন যে কোন বিপ্লবী যুদ্ধেই হয়ে থাকে। এর মধ্যে দোষের কিছু নেই। কিন্তু যুদ্ধের পরিচালকদের হিসাব করতে হবে যে, এরকম খতম আঞ্চলিকভাবে প্রয়োজনীয় হলেও যুদ্ধকে জনপ্রিয় করা ও ছড়িয়ে দেবার কাজকে ক্ষতিগ্রস্থ করবে কিনা ? এরকম পদ্ধতিতে অ্যাকশন করলে তার রাজনৈতিক প্রভাব কি পড়ছে ?

(৫) শাসকশ্রেণি জনগণের একটা ভালো অংশের মধ্যে শান্তির আকাঙ্ক্ষা তৈরি করতে সফল হয়েছিল। এছাড়া ছত্রধরের পরাজয়ের আর কোন ব্যাখ্যা হয় না। মাওবাদীদের পক্ষ থেকে শান্তিচুক্তির উপর অধিক গুরুত্ব দেওয়াটা জনগণের এই ভুল চিন্তাকে ইন্ধন দিয়েছে। যে সুযোগটাকে শাসকশ্রেণি পুরোমাত্রায় ব্যবহার করেছে। মমতা মাওবাদীদের জন্য একদিকে শান্তিচুক্তির ফাঁদ পাতে, অন্যদিকে কেন্দ্রের কাছ থেকে আরও বাহিনী এনে মাওবাদীদের উপর প্রচন্ড আক্রমণ শুরু করে। মমতার উদ্দেশ্য ছিল মুখে শান্তির কথা বলে সময় কেনা। শান্তিচুক্তির টোপ ঝুলিয়ে মমতা জঙ্গলমহলে তৃণমূলের সামাজিক ভিত্তিকে সংহত করা শুরু করে (এর পাশাপাশি মমতা পাইয়ে দেবার রাজনীতিও শুরু করে। যেমন, আদিবাসী যুবকদের পুলিশে চাকরি দেওয়া, দুটাকা কেজি দরে চাল দেওয়া প্রভৃতি)। একের পর এক এলাকায় নয়া জোতদার, সি পি এমের গুন্ডা বাহিনীর প্রাক্তন সদস্য, তৃণমূলের গুন্ডা, পুলিশের দালাল, আত্মসমর্পণ করা নকশালদের নিয়ে তৃণমূলের নেতৃত্বে আঞ্চলিক সশস্ত্র বাহিনী গড়ে তোলে। সেজন্য মাওবাদীরা একতরফাভাবে অ্যকশন বন্ধ করার কথা ঘোষণা করলেও মমতা এটা ওটা অজুহাত দেখিয়ে সরকারি বাহিনীর অপারেশন বন্ধ করতে অস্বীকার করে। এরপর মমতা দুদিক থেকে সর্বাত্মক আক্রমণ শুরু করে। একদিকে তৃণমূলের বাহিনী অন্যদিকে সরকারি যৌথ বাহিনী। একের পর এক মাওবাদী নেতা–কর্মীকে খুন করতে শুরু করে। কিন্তু, দুঃখের বিষয় যখন শাসকশ্রেণি প্রচন্ড সর্বাত্মক আক্রমণ শুরু করেছে তখন সি পি আই (মাওবাদী) একতরফা শান্তি ঘোষণা করে। শাসকশ্রেণি যখন জনগণের মধ্যে শান্তির মোহ তৈরি করে সর্বাত্মক আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে তখন তার বিরুদ্ধে লড়াই করে শান্তির আসল চরিত্রকে জনগণের সামনে খুলে ধরার বদলে মাওবাদীরা নিজেরাই একতরফা শান্তি ঘোষণা করলেন। এছাড়াও, পশ্চিমবাংলার বাকি অঞ্চলের মানুষের মধ্যে শান্তির যে ভুল আশা তৈরি হয়েছিল তার বিরুদ্ধে মতাদর্শগত ও রাজনৈতিক সংগ্রাম চালানোর ক্ষেত্রে মাওবাদীদের তরফে খামতি ছিল। এটা লক্ষ্য করার মত বিষয় যে, সি পি আই (মাওবাদী) মুখে শান্তিচুক্তির বিরোধিতা করলেও বাস্তবে তাঁরা নিজেরাই একতরফা শান্তি ঘোষণা করলেন। এর কারণ কি ? অন্যান্য কারণের মধ্যে একটা কারণ হতে পারে তাঁদের উপর এলাকার জনগণের চাপ ছিল, জনগণের একটা বড় অংশই শান্তি চাইছিলেন। কিন্তু, কেন জনগণের মধ্যে এরকম শান্তিকামী মনোভাব এল ? এর কারণ জঙ্গলমহলের সংগ্রামে এলাকাভিত্তিক ক্ষমতা দখলের প্রশ্নটাকে সমস্ত কাজের ভরকেন্দ্রে রাখা হয়নি। সুতরাং এটা লাইনের প্রশ্ন। লাইনের স্তরে এই ভুলকে সংশোধন করে জনগণের চেতনাকে নতুন উচ্চতায় তোলার কাজ হাতে নিয়েই এই সমস্যার সমাধান সম্ভব ছিল। শান্তিচুক্তি করে কখনোই জনগণের চেতনায় এই উল্লম্ফন ঘটানো সম্ভব নয়।

(৬) জঙ্গলমহলের সংগ্রামে তৃণমূলের ভূমিকা ও তাদের সাথে সম্পর্কের প্রশ্নটাকেও ভেবে দেখার দরকার আছে। কোন কোন পরিস্থিতিতে আমরা শাসকশ্রেণির এক অংশের বিরুদ্ধে আরেক অংশের সাথে কৌশলগত জোট করতে পারি। যেমন, মাও একটা সময় জাপানী সাম্রাজ্যবাদ ও তার দালালদের বিরুদ্ধে চিয়াং কাই শেকের সাথে কৌশলগত জোট করেছিলেন। কিন্তু, সেটা করতে গিয়ে আমরা আমাদের সাথে শত্রুর বিরোধকে কমিয়ে বা হালকা করে দেখাব না। সেটা করলে জনগণ মতাদর্শগতভাবে পঙ্গু হয়ে পড়বেন, তাঁদের মধ্যে শত্রুর প্রতি শ্রেণিঘৃণা জাগিয়ে তোলার কাজটা ক্ষতিগ্রস্থ হবে। এরফলে চরম আত্মত্যাগের জন্য জনগণকে জাগিয়ে তোলার কাজটা ক্ষতিগ্রস্থ হবে। শাসকশ্রেণির মধ্যেকার দ্বন্দ্বের সুযোগ নেবার এরকম ভুল পদ্ধতি আমরা দেখতে পাই মাওবাদীদের এই সমস্ত ভুল বিবৃতির মধ্যে যে, তাঁরা মমতাকে মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে দেখতে চান। এটা আরও দেখা যায় যখন ভোট বয়কটের কাজে ঢিলা দেওয়া হয় এবং যখন মমতার জনসভায় মাওবাদীদের গণ সংগঠন লোকজন নিয়ে যোগ দেয়। গত পঞ্চায়েত নির্বাচনের সময় থেকেই প্রায় সমস্ত নকশালপন্থী গোষ্ঠীই যেকোন মূল্যে সি পি এমকে হারানোর লাইন হাজির করেছিল। প্রায় প্রতিটি নির্বাচনে নকশালদের একটা বড় অংশ তৃণমূলের সাথে মিলে সি পি এমকে হারানোর কাজে নেমেছিল। সি পি আই (মাওবাদী)ও এই প্রশ্নে জোরদার লড়াই দেয় নি। গত বিধানসভা নির্বাচনে সি পি আই (এম – এল) [নকশালবাড়ি] বাদে আর কোন নকশালপন্থীরা তেমনভাবে ভোট বয়কট কর্মসূচী নেয় নি। এই সব ঘটনার মধ্যে দিয়ে জনগণের চেতনায় শাসকদের সাথে বিপ্লবীদের বিরোধটা ঝাপসা হয়ে যায়। এর ফল হলো সি পি এমের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে তৃণমূল মাওবাদীদের নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করে নিতে সফল হয়।

আমাদের এই মতামতগুলি প্রাথমিক স্তরের। যদিও আমরা মনে করি এগুলো নিয়ে বিপ্লবীদের শিবিরে জোরদার মতাদর্শগত সংগ্রামের প্রয়োজন আছে। কারণ সত্তরের দশকের পর এত বড় ধাক্কা আমাদের সামনে অনেক মূল্যবান শিক্ষা রেখে গেছে। সেজন্য জঙ্গলমহলের সশস্ত্র সংগ্রামের ভুল ও ঠিক থেকে শিক্ষা না নিয়ে আগামী দিনে পশ্চিমবাংলার বুকে বিপ্লবী সংগ্রাম এগোতে পারে না।

আমাদের কর্তব্য

পরিস্থিতির ভালোদিক ও খারাপদিক দুটোই আমরা আলোচনা করেছি। খারাপ দিক হলো বিপ্লবী সংগ্রামের ধাক্কা। ভালো দিক হলো পরিস্থিতি শ্রেণি সংগ্রাম গড়ে তোলার পক্ষে আরও পেকে উঠছে। জনগণের কাছে মমতার আসল চরিত্র পরিস্কার হয়ে গেছে। কিন্তু তাঁরা আবার এখুনি সি পি এমের কাছে ফিরে যেতেও তৈরি নন। আবার শাসকশ্রেণির প্রধান দুটি দল সি পি এম ও তৃণমূলের চরিত্র মানুষের কাছে খুলে গেলেও শাসকশ্রেণি তৃতীয় কোন শক্তিকে গড়ে তুলতে এখনও পারে নি যাকে কেন্দ্র করে জনগণের একটা ভালো অংশকে জড়ো করা যায়। তারা এখনও ঠিক করে উঠতে পারছে না যে তারা সি পি এমকে ধুয়ে মুছে পরিস্কার করে সামনে আনবে নাকি মমতাকে বাদ দিয়ে তৃণমূলের একটা বড়ো অংশকে কংগ্রেসের সাথে জুড়ে কংগ্রেসকে সামনে আনবে নাকি হিন্দুত্ববাদে সুড়সুড়ি দিয়ে বি জে পি কে খাড়া করবে। এছাড়া অন্য কোন বিকল্প এখনই চোখে পড়ছে না। তৃণমূলের বিরুদ্ধে কোন শক্তিশালী নেতাকে কেন্দ্র করে নতুন করে কোন পার্টি বা জোট গড়ে ওঠার কোন সম্ভাবনা এই মুহূর্তে দেখা যাচ্ছে না। তবে ভবিষ্যতে এরকম কোন নেতা বা নেত্রীকে সামনে এনে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে দাঁড় করানোর চেষ্টা হলেও হতে পারে। ফলে শাসকশ্রেণির দিক থেকে পরিস্থিতি অনেকটা অনিশ্চিত। এরকম অবস্থাটা বিপ্লবীদের পক্ষে সুবিধাজনক। সেজন্য পরিস্থিতির ভালো দিকটাই প্রধান যা আমাদের আরও এগিয়ে যাবার শক্তি যোগাচ্ছে। ভালো দিকটাকে কাজে লাগাতে হলে আমাদের সামনের কর্তব্য হলো : প্রথমত, আজকের পরিস্থিতি আমাদের সামনে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের নতুন নতুন সুযোগকে তুলে ধরছে। এই সুযোগকে ব্যবহার করার জন্য আমাদের নতুন নতুন পদ্ধতিকে বিকশিত করতে হবে। দ্বিতীয়ত, শ্রেণিসংগ্রাম গড়ে তুলতে হবে। বিশেষ করে রাষ্ট্র ক্ষমতা দখলের সংগ্রামের প্রস্তুতিকে আরও জোরদার করতে হবে।

রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের বিষয়টাকে আরও গভীরভাবে আমাদের বিবেচনা করতে হবে। কারণ আজকের দিনে শাসকশ্রেণির সমস্ত পার্টিগুলির একেবারে পিছিয়ে পড়া এলাকা অব্দি বিস্তৃত বিরাট মাকড়সার জালের মত সংগঠনকে ব্যবহার করে তারা জনগণকে রাজনৈতিকভাবে অনেক বেশি প্রভাবিত করতে পারে। এর সাথে যুক্ত হয়েছে শাসকশ্রেণির সংবাদ মাধ্যমের প্রভাব। এই পরিস্থিতিতে শাসকশ্রেণির সাথে রাজনৈতিক লড়াইয়ের প্রশ্নটা বিপ্লবীদের কাছ থেকে বাড়তি গুরুত্ব দাবি করে। আজ প্রতিটি ইস্যুতে শাসকশ্রেণির সাথে আমাদের কঠোর লড়াই করেই জনগণকে রাজনৈতিকভাবে আমাদের দিকে জিতে নিতে হবে। রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের নতুন নতুন রুপকে আমাদের খুঁজে বার করতে হবে। আমরা আগেই আলোচনা করেছি যে, কিভাবে মমতা তার নতুন স্টাইলে সাম্রাজ্যবাদের দালালি করতে শুরু করেছে। বিশেষ করে সাম্রাজ্যবাদের নির্দেশে মমতা যেভাবে দ্বিতীয় সবুজ বিপ্লবের নামে পশ্চিমবাংলার গ্রামের জাতিবাদী–সামন্তবাদকে রূপান্তরিত করতে চাইছে তার চরিত্রকে জনগণের সামনে খুলে দিতে হবে। পাশাপাশি আমরা এটাও দেখিয়েছি যে, সি পি এমও তার সাম্রাজ্যবাদের দালালির নীতিতে কোন পরিবর্তন আনে নি। তারা এখনও বলে চলেছে যে, তারা ভূমি সংস্কার করে ফেলেছিল, এখন দরকার শিল্পায়ন। সি পি এম নেতারা বুক বাজিয়ে বলে চলেছে সিংগুর, নন্দীগ্রামে তাদের শিল্প করার চেষ্টায় কোন ভুল ছিল না। শাসকশ্রেণি ও তার প্রচার মাধ্যম এমন একটা পরিবেশ তৈরি করেছে যেখানে সাম্রাজ্যবাদ ও আমলাতান্ত্রিক পুঁজির অনুপ্রবেশের বিরোধিতা করলেই তাকে উন্নয়ন বিরোধি বলে ছাপ মেরে দেওয়া হবে। পঞ্চায়েত ব্যবস্থার বিরোধিতা করলেই তাকে জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকারের বিরোধি বলে দেগে দেওয়া হবে। এরকম পরিস্থিতিতে বিপ্লবীদের যেমন তাদের উন্নয়ন যে আসলে সাম্রাজ্যবাদের সেবা করে সেটাকে জনগণের কাছে ব্যাখা করে দেখিয়ে দিতে হবে তেমনি এর পাল্টা হিসাবে জনগণের সত্যিকারের উন্নয়নের একটা মডেলকেও জনগণের সামনে পরিস্কারভাবে আমাদের হাজির করতে হবে। যার মূল কথা হবে জোতদার–নয়া জোতদারদের জমি দখল করে যারা নিজেরা গতর খাটিয়ে জমিতে চাষ করে তাদের মধ্যে জমি বিলিয়ে দেওয়া। দরিদ্র ভুমিহীন কৃষক - ভাগচাষী - দলিত - আদিবাসী - গরিব মুসলিমদের জমির উপর অধিকারের প্রশ্নটাকে আমাদের তুলতে হবে। এদেশে সাম্রাজ্যবাদ ও তার দালাল বড় বুর্জোয়াদের সমস্ত পুঁজি দখল করে শ্রমিক শ্রেণির মালিকানায় নিয়ে আসার প্রশ্নটাকে জোরেসোরে সামনে আনতে হবে। শিল্প ও কৃষি উৎপাদনের লক্ষ্য কখনোই পুঁজিপতিদের মোটা পেট আরও মোটা করা হতে পারে না, উৎপাদন চলবে জনগণের কল্যাণের লক্ষ্যে। সাম্রাজ্যবাদী উন্নয়ন কিভাবে পরিবেশ–প্রকৃতিকে ধ্বংস করছে সেটা জনগণের সামনে তুলে ধরতে হবে এবং এর বদলে পরিবেশকে রক্ষা করে কিভাবে উন্নয়ন করা যায় সে সম্পর্কে আমাদের বক্তব্যকে সামনে আনতে হবে। আমাদের উন্নয়ন মডেলে শুধু মাত্র অর্থনৈতিক উন্নয়নের কথা বললেই হবে না। পাশাপাশি কি ধরনের রাষ্ট্র কাঠামো আমরা গড়ে তুলতে চাই সেটাও পরিস্কারভাবে তুলে ধরতে হবে। জনগণের প্রকৃত গণতন্ত্রের প্রশ্নটাকেও সামনে আনতে হবে। এবিষয়ে আমাদের আদর্শ হলো চিনের মহান সর্বহারা সাংস্কৃতিক বিপ্লব। সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সময় অর্থনীতি ও রাজনীতির ক্ষেত্রে যে সমস্ত নতুন বিকাশগুলি হয়েছিল সেগুলি সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করে তুলতে হবে। এছাড়াও মমতা যে নতুন সাংস্কৃতিক আন্দোলন শুরু করে বাংলার অতীত দিনের সাম্রাজ্যবাদের দালাল ও জাতিবাদী–সামন্তবাদের সাথে আষ্টেপিষ্টে জড়িত তথাকথিত মনীষিদের ঝেড়ে পুঁছে নতুন করে পেশ করে বাঙালী উগ্রজাতীয়তাবাদকে জাগিয়ে তুলতে চাইছে তার বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদ–সামন্তবাদ বিরোধি নয়া গণতান্ত্রিক সংস্কৃতিকে তুলে ধরাটা বিপ্লবীদের কর্তব্য। কিন্তু, এখানে একটা বিষয় খুব স্পষ্ট করে জনগণের কাছে বলতে হবে যে, এসবের কোনটাই বিপ্লব ছাড়া হতে পারে না। সেজন্য আমাদের পাল্টা উন্নয়ন মডেলে বা আমাদের সমস্ত রাজনৈতিক প্রচারের কেন্দ্রবিন্দুতে থাকবে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের প্রশ্নটা। ভোটবাজীর এই ব্যবস্থার মুখোশ খুলে দিয়ে জনগণের সামনে এটা পরিস্কার করে বলতে হবে যে শ্রমিক–কৃষকদের হাতে রাজনৈতিক ক্ষমতা ছাড়া সমাজের কোন মৌলিক পরিবর্তন করা যাবে না। এটা বাদ দেওয়ার অর্থ শোধনবাদ। আমাদের চেষ্টা করতে হবে সমস্ত গণ আন্দোলন ও রাজনৈতিক প্রচারের (হস্তক্ষেপ) সাথে আমাদের পাল্টা উন্নয়ন মডেলের প্রশ্নটাকে যুক্ত করার এবং আন্দোলনগুলিকে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের নতুন দিশায় চালিত করার। এটাই আমাদের বিপ্লবী দায়িত্ব এবং আজকের পরিস্থিতি দাবি করে যে, বিপ্লবী দায়িত্ব পালনে আমাদের আরও অধিকতর সৃজনশীল হতে হবে।

সবশেষে এটা বলা যায় যে, বিপ্লবীদের নিজেদের শক্তির উপর দাঁড়িয়ে স্বাধীনভাবে জনগণের সংগ্রাম গড়ে তুলতে হবে এবং এমনভাবে আমাদের অবস্থানকে তুলে ধরতে হবে ও শ্লোগানগুলিকে হাজির করতে হবে যাতে শাসকশ্রেণি ও তার দালাল পার্টিগুলো আমাদের সংগ্রামকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করতে না পারে। আমাদের লক্ষ্য থাকবে আমাদের অবস্থান, শ্লোগান ও সংগ্রামের মাধ্যমে আমরা সমাজের মধ্যে জনগণের পক্ষের শক্তি ও জনবিরোধি শক্তির মধ্যে মেরুকরণকে গভীরতর করতে পারি ও সংহত করতে পারি।

আঞ্চলিক ক্ষমতা প্রয়োগের নতুন ধরন : কেরালার পরিস্থিতি

"আঞ্চলিক ক্ষমতা প্রয়োগের নতুন ধরনটাকে" নিয়ে আলোচনা করা ও জানাবোঝার জন্য আমরা এখানে একত্রিত হয়েছি। আলোচনার বিষয়টার বিশেষ ধরনের সূত্রায়ন, বিশেষ করে "আঞ্চলিক ক্ষমতা" কথাটাই আধুনিক ভারতের সমাজ সম্পর্কে এমন একটা ধারণাকে তুলে ধরছে যেটা সরকারি দাবির থেকে অনেকটাই আলাদা। সুতরাং, সরকারি মতের বিরুদ্ধে আমাদের এই উল্টো মতটাকে তুলে ধরে আলোচনা শুরু করাটাই সঠিক হবে। আমরা মনে করি ভারত এখনও সাম্রাজ্যবাদী শোষণ ও আধিপত্যের অধীনে রয়েছে। এটাই হলো আমাদের দেশকে আধা-সামন্তবাদী এবং আধা-উপনিবেশিক বলে চিহ্নিত করার অন্তর্বস্তু। এটা একটা চলমান এবং অসম্পূর্ণ রূপান্তরের ধারণাকে তুলে ধরে। এই গতিশীলতাকে (dynamics) কেরালার ক্ষেত্রে যেভাবে দেখা যাচ্ছে তার একটা সংক্ষিপ্ত রূপরেখা দিয়ে আমরা আলোচনা শুরু করব।

জাতিবাদী-সামন্তবাদ এবং উপনিবেশবাদ[1]

আজকে যেটা কেরালা রাজ্য সেখানে মধ্যযুগে জাতিবাদী-সামন্তবাদের একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল জমির মালিকানা প্রায় একচেটিয়াভাবে নাম্বুদিরি (বর্ণ কাঠামো অনুযায়ী এরা ব্রাহ্মণ) এবং তাদের নিয়ন্ত্রণে থাকা মন্দিরগুলির হাতে ছিল। বর্মা রাজাদের (বর্ণ কাঠামো অনুযায়ী এরা ক্ষত্রিয়) ভাগ ছিল খুবই কম। আরেকটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল কৃষি উদ্বৃত্ত নিংড়ে নেবার প্রধান রূপ হিসাবে প্রজাস্বত্ব এবং আদিয়ালাথম্ ব্যবস্থার মিলিত ভূমিকা। আদিয়ালাথম্ ছিল একটা শোষণমূলক ব্যবস্থা যাতে ভূমিহীন দলিত ও কিছু আদিবাসী গোষ্ঠীর মালিক ছিল জমিদাররা যারা ঐ সমস্ত দলিত ও আদিবাসী মানুষদের ভাড়া দিতে বা বিক্রি করতে পারত। ঐ সমস্ত দলিত ও আদিবাসীদের জমির অধিকার থেকে বঞ্চিত করে রাখা হয়েছিল, এমনকি তাঁদের প্রজাস্বত্ব বা ভাগচাষের অধিকারও ছিল না। তাঁদের প্রভুরা তাঁদের আধপেটে খাবার দিয়ে কাজ করাত, সেজন্য তাঁদের আশেপাশের জমি, জঙ্গল বা নদীতে শিকার বা ফলমূল সংগ্রহ করে কোনমতে বেঁচে থাকতে হত। জমির প্রজাস্বত্ব ব্যবস্থাও ছিল ধাপে ধাপে বিন্যস্ত। প্রজাস্বত্ব ব্যবস্থার সবচেয়ে উপরে ছিল মধ্যস্বত্বভোগীরা। এরা ছিল মূলত নায়ারদের (বর্ণ কাঠামো অনুযায়ী এরা শুদ্র) মত সবর্ণ (বর্ণ কাঠামো অনুযায়ী ব্রাহ্মণ থেকে শুদ্র অব্দি চারটি বর্ণকে সবর্ণ বলে চিহ্নিত করা হয়েছে – অনুবাদক) হিন্দু জাতের লোকেরা, যারা নাম্বুদিরি ও তাদের মন্দিরগুলির প্রত্যক্ষ প্রজা ছিল। তারা হয় সরাসরি আদিয়ালারদের দিয়ে চাষ করাত অথবা নিচের স্তরের প্রজাদের কাছে জমি ভাগে দিত। নিচের স্তরের প্রজাদের মধ্যে সবর্ণ ও অবর্ণ দুইই ছিল (অবর্ণ বলতে মূলত অন্যান্য পিছিয়ে পড়া জাতি (ও বি সি) এবং দলিতদের (এস সি) বোঝান হয়েছে। এই দলিলে যে সবর্ণ ও অবর্ণ বিভাজন করা হয়েছে সেটা কেরালার পরিপ্রেক্ষিতে। ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে এই বিভাজন প্রযোজ্য কিনা সেটা ভেবে দেখার বিষয় -- অনুবাদক)। দলিত ও আদিবাসী আদিয়ালাররাই ছিল প্রধানত প্রত্যক্ষ উৎপাদক। এইভাবে দুটো প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে এবং দুটো স্তরে উদ্বৃত্ত উৎপাদন করা হত ও নিংড়ে নেওয়া হত। উদ্বৃত্ত উৎপাদন ও নিংড়ে নেবার একটা জায়গা ছিল যেখানে আদিয়ালাররা উদ্বৃত্ত সৃষ্টি করতেন। যখন জমিদাররা তাঁদের সরাসরি নিয়োগ করত তখন গোটা উদ্বৃত্তটাই মোটের উপর জমিদারের সম্পত্তি হয়ে যেত। যখন আদিয়ালাররা প্রজা কৃষকের অধীনে কাজ করতেন তখন গোটা উদ্বৃত্তটা নিচের স্তরের প্রজা থেকে শুরু করে উপরের স্তরের প্রজা হয়ে একেবারে জমিদার অব্দি ভাগ হতে হতে যেত। উদ্বৃত্ত উৎপাদন ও নিংড়ে নেবার আর একটা জায়গা হলো যখন গরিব থেকে শুরু করে ধনী চাষী শ্রেণির প্রজা কৃষকরা নিজেরা সরাসরি গতর খাটিয়ে উদ্বৃত্ত সৃষ্টি করতেন। এই উদ্বৃত্তও উপরের স্তরের প্রজা থেকে শুরু করে জমিদাররা শুষে নিত এবং নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নিত।

এই শোষণমূলক ব্যবস্থার শ্রেণি ও জাতপাতের কাঠামো পুনরুৎপাদিত হত ক্ষমতার কাঠামো এবং উপরিকাঠামোর অন্যান্য ক্ষেত্রে। উপরিকাঠামোর এই সম্পর্কগুলি আবার শ্রেণি ও জাতপাতের সম্পর্কের ভিত্তিকে টিঁকিয়ে রাখত। বর্মা রাজাদের শাসিত রাজ্যের মধ্যে নাম্বুদিরি যোগম্ (কাউন্সিল) পরিচালিত সংকেতমগুলি (মন্দির ও তার জমি) নিজেদের এলাকায় প্রায় স্বাধীনভাবে শাসন করত। যদিও শেষ বিচারে তাদের কোন না কোন রাজার আনুগত্য স্বীকার করতে হত, কিন্তু সেই রাজাকে সংকেতম যে এলাকায় অবস্থিত সেখানকার রাজাই হতে হবে এমন কোন কথা ছিল না। সংকেতমগুলি নিজেরাই ঠিক করতে পারত যে তারা কোন্ রাজার আনুগত্য মেনে নেবে। সংকেতমগুলির সীমার মধ্যে ক্ষমতা ছিল যোগমের (মন্দির পরিচালক কমিটি বা কাউন্সিল) হাতে, যোগমের অনুমতি ছাড়া কোন রাজা সংকেতমের সীমার মধ্যে ঢুকতে পারত না। রাজার নিচে বড় বড় সবর্ণ মধ্যস্বত্বভোগীরা ক্ষমতা ভোগ করত। এদের হাতে শাস্তি দেবার বা মৃত্যুদন্ড দেবার অধিকার ছিল। এই জন্য বা রাজার হয়ে যুদ্ধ করার জন্য এরা নায়ার সৈন্যদের নিযুক্ত করত। এলাকায় শাসন চালানোর কাজে তাদের সাহায্য করত নাট্টুকূটম্ বা থারাকূটম্। এই নাট্টুকূটম্ বা থারাকূটম্ ছিল একটা আঞ্চলিক কমিটি বা কাউন্সিল যাতে প্রধান সবর্ণ পরিবারগুলির, বিশেষত নায়ারদের প্রতিনিধিরা থাকত। ব্যবসার নিয়ন্ত্রণ ছিল বড় বড় মাপ্পিলা (মালয়ালি মুসলিম) এবং নাসারানি (মালয়ালি খ্রীষ্টান) ব্যবসাদারদের হাতে। তারা সবর্ণ মর্যাদা ভোগ করত এবং ক্ষমতাশালী জোটের শরিক ছিল।

ক্ষমতাশালী এই শাসক জোটের কেন্দ্রে ছিল নাম্বুদিরি – বর্মা – নায়ার চক্র। এই চক্রের ক্ষমতাকে সংহত করা হয়েছিল বিশেষ ধরনের এক বিবাহ সম্পর্কের দ্বারা। নাম্বুদিরি পরিবারের বড়ছেলেই কেবলমাত্র নিজের জাতের মধ্যে বিয়ে করত। অন্য ছেলেরা বর্মা ও নায়ার মহিলাদের সাথে সম্বনধম্ (এক ধরনের ঢিলেঢালা জোড়বাঁধা বিবাহ সম্পর্ক) নামক এক ধরনের সম্পর্ক তৈরি করত। ব্রাহ্মণদের আধিপত্যকে এইভাবে 'রক্তের সম্পর্কের' মাধ্যমে নিরাপদ করা হত। বর্মা পুরুষরাও নায়ার মহিলাদের সাথে সম্বনধম্ সম্পর্ক তৈরি করত। নায়ারদের কাছে সম্বনধম্ ছিল রীতি। জাতপাতের ব্যবস্থাকে প্রতক্ষ্যভাবে ব্যবহার করা হত রাজনৈতিক ক্ষমতাকে গড়ে তোলা, পুনরুৎপাদন করা এবং রক্ষা করার জন্য। মুসলিম ও খ্রীষ্টানদেরও জাতপাত ব্যবস্থার আওতার মধ্যে ঢুকিয়ে নেওয়া হয়েছিল। একটা উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে, কোঝিকোড়ের সাম্মুথিরি রাজাদের আমলে প্রত্যেক আরিয়া (এই জাতের লোকেরা সমুদ্রে মাছ ধরতে যেত) পরিবারের বড় ছেলেকে মুসলিম ধর্ম নিতে হত। এটার কারণ ছিল সামুদ্রিক বাণিজ্যকে রক্ষা করার জন্য নৌ বাহিনীতে যাতে যোদ্ধার ঘাটতি না পড়ে। নৌ বাহিনীতে সৈনিক হিসাবে কাজ করা এবং একে পরিচালনা করার কাজটা করত মুসলিম মাপ্পিলা সম্প্রদায়ের লোকেরা।

উপনিবেশিক পর্যায়ে এসে ঢিলেঢালা কিন্তু কঠোরভাবে মেনে চলা ব্রাহ্মণ্যবাদী এই ক্ষমতা কাঠামোয় লক্ষণীয় পরিবর্তন ঘটে। পনেরো শতকের শেষ থেকে উপনিবেশিক শক্তিগুলি অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ শুরু করে। মশলার নতুন নতুন উৎসের খোঁজে উপনিবেশবাদীরা এক রাজার বিরুদ্ধে অপর রাজাকে মদত দিতে শুরু করে। এর ফলে কোন কোন রাজা দুর্বল হয়ে পড়ে ও ধ্বংস হয়ে যায়, আবার কোন কোন রাজা আরো শক্তিশালী হয়। উপনিবেশবাদীদের মধ্যে প্রতিযোগিতার ফলে মশলার চাহিদা বেড়ে যায় এবং টাকাপয়সার সম্পর্কের বিকাশ ঘটে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এর ফলে বড় বড় রাজত্বের

[1] পরবর্তী ব্যাখা এবং বিশ্লেষণের বেশিরভাগটাই মূলত কেরালার কৃষি সম্পর্কের উপর লেখা অজিতের " ভূমি, জাতি, বন্ধনম্ " (কানাল প্রকাশনা, কোচি, ২০০২) বইয়ের ভিত্তিতে করা হয়েছে।

উদ্ভব ঘটে, অনেকটা ইউরোপে সামন্তবাদের শেষ পর্যায়ের নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্রের মত। বিশেষ করে দক্ষিণ কেরালায় এটা দেখা যায়। মারথান্ডা বর্মা যুদ্ধ চালিয়ে আজকের কেরালার প্রায় অর্ধেক এলাকাকে ভেনাড় রাজত্বের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে। অধিকাংশ জমিকে রাষ্ট্রীয় সম্পত্তিতে পরিণত করা হয়। নাম্বুদিরিদের মালিকানার জমির পরিমাণ অনেকটাই কমে যায়। প্রজাসত্ত্বের সম্পর্ককে উচ্ছেদ না করা হলেও পরিবর্তন করা হয়। জমির খাজনার পরিমাণ হিসাব করা এবং আদায় করার ব্যবস্থাকে আরও সংগঠিত করা হয়। মশলা এবং নুনের ব্যবসাকে কেন্দ্রীভূত করা হয়। এটা পরিস্কার যে, এগুলো করার জন্য আগেকার ঢিলেঢালা ব্যবস্থাকে পরিত্যাগ করতেই হতো। মাইনে করা যোদ্ধা এবং নিয়মিত আমলাতন্ত্র বিশিষ্ট কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটে। কিন্তু, এর অর্থ এই নয় যে, পুরানো ক্ষমতার তলার দিকের গোটা কাঠামোটাকেই উচ্ছেদ করা হয়েছিল। আগেকার মধ্যসত্ত্বভোগীদের এখন নতুন কেন্দ্রীয় ক্ষমতার আওতার মধ্যে বেঁধে ফেলা হলেও, তাদের হাতেই আঞ্চলিক স্তরের রাজনৈতিক ক্ষমতা থেকে যায়। ভেনাড় (থিরুভিঠামকুর) রাজত্বের স্বাধীনতাও ছিল স্বল্পস্থায়ী। অল্পদিনের মধ্যেই এই রাজত্ব ব্রিটিশ উপনিবেশবাদীদের নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। যদিও ভেনাড় রাজাদের শাসন চালিয়ে যেতে দেওয়া হয়, তবুও তারা পুরোপুরি ব্রিটিশদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতো। ভারথাপুঝার উত্তরের গোটা মালাবার এলাকাটাকে মাদ্রাস রাজ্যের সাথে যুক্ত করা হয়। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের আনুগত্য স্বীকার করে কোচি এবং থিরুভিঠামকুর আঞ্চলিক রাজতন্ত্র হিসাবে টিঁকে থাকে।

উপনিবেশবাদীরা পুরানো দিন থেকে চলে আসা জাতিবাদী-সামন্তবাদী উৎপাদন সম্পর্কগুলিকে রূপান্তর ঘটানোর কাজে মদত দেয়। এর মধ্যে ছিল - বাগান চাষ (যেমন, চা, কফি বা রবার বাগান) গড়ে তোলা, প্রাথমিক প্রক্রিয়াকরণ শিল্প গড়ে তোলা, আদিয়ালারদের মুক্ত করা, দুই রাজতন্ত্রের এলাকার উপরের স্তরের প্রজাদের প্রজাস্বত্বের মেয়াদ নির্দিষ্ট করা, বাণিজ্যিক ফসলের চাষের বিকাশ এবং অর্থনীতিতে বেশি বেশি করে টাকাকড়ির প্রচলন। কিন্তু, এটা জাতিবাদী-সামন্তবাদকে একেবারে খতম করে দেওয়া নয়। যদিও সবর্ণ খ্রীষ্টান এবং অবর্ণদের উপরের অংশের মধ্যে কিছুটা উপরের দিকে ওঠা লক্ষ্য করা যায়, কিন্তু তবুও জমির মালিকানা প্রায় পুরোপুরি সবর্ণদের হাতেই ছিল। আদিয়ালারদের মুক্ত করা হলেও ব্রাহ্মণ্যবাদী কাঠামো তাদের জমির অধিকার থেকে বঞ্চিত করে রেখেছিল। এজন্য তাঁরা বাধ্য হতেন জমিদারদের জমিতে বাস করতে, তাদের বেগার খাটতে। তাঁরা নতুন রূপের কুডিকিডাপ্পু দাসত্বের (জমিদারের জমিতে বসবাসকারী দাস) সম্পর্কে বাঁধা পড়েন। কেরালার তিনটি অঞ্চলের নিচ তলার প্রজারা যারা সামন্তবাদী জমি খাজনার চাপে হাঁসফাঁস করছিলেন তাঁদের ঘাড়ে এবার উপনিবেশবাদীদের দাবিদাওয়ার বোঝা চাপে। এছাড়াও, তাঁরা নির্দয় জমিদার, যারা সবসময় প্রজা বদলাতে চাইত যাতে আরও বেশি খাজনা চাপানো যায়, তাদের দ্বারা জমি থেকে উচ্ছেদ হবার বিপদের মধ্যে ছিলেন। এর সাথে কোন না কোন ভাবে সামঞ্জস্য রেখে চলত অর্থনীতির আধুনিক ক্ষেত্র। এই আধুনিক ক্ষেত্রেও জাতিবাদী-সামন্তবাদী সম্পর্কগুলিকে ব্যবহার করা হত। বাগানগুলিও গড়ে তোলা হয়েছিল পুরানো দিন থেকে চলে আসা অথবা নতুন করে তৈরি করা সামন্তবাদী একচেটিয়া জমি মালিকানার ভিত্তিতে। বাগানগুলিতে শ্রমশক্তিকে নিয়োগ করা, নিয়ন্ত্রণ করা এবং কাজে লাগানো হত লোভ দেখানো ও শাস্তি দেবার বিভিন্ন ধরনের জাতিবাদী-সামন্তবাদী পদ্ধতিকে ব্যবহার করে। নতুন প্রক্রিয়াকরণ শিল্পগুলিতেও একই রকম ব্যাপার ঘটত। ইংরেজ শাসনের সংহতকরণের সাথে সাথে কেন্দ্রীভূত শাসনকাঠামোও শক্তিশালী হয়। ইংরেজদের প্রত্যক্ষ শাসনে থাকা মালাবার এলাকায় এটা সবচেয়ে পরিস্কারভাবে দেখা যায়। কিন্তু তা সত্ত্বেও কোচি ও থিরুভিঠামকুরের রাজাদের এলাকা এবং মালাবারকে ধরে গোটা কেরালাতে আঞ্চলিক ক্ষমতা সামন্ত প্রভুদের হাতেই থেকে গেছিল। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উপনিবেশিক শাসক বা রাজারা সরকারের আঞ্চলিক প্রতিনিধি হিসাবে এই সমস্ত সামন্ত প্রভুদের নিয়োগ করত। পুরানো এবং নতুনকে এমনভাবে মেলানো হয়েছিল যাতে আমলাতন্ত্র ও আদালতের মত আধুনিক প্রতিষ্ঠানগুলি জমিদারদের থাবাকে শক্তিশালী করে, এমনকি যখন এই সমস্ত জমিদারদের এক নতুন ধরনের কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণের নজরদারীর আওতার মধ্যে আনা হয়েছিল।

এই ঘটনাগুলি আমাদের সামনে যে প্রশ্নটাকে তুলে ধরে তা হল এই রূপান্তরের চরিত্রটাকে বিচার করা। এই জন্য আমাদের এবার কিছুটা শুকনো তত্ত্বগত আলোচনায় ঢুকতে হবে।

আমলাতান্ত্রিক পুঁজিবাদ

উপনিবেশিক আধুনিকীকরণের বিষয়টাকে বেশি বেশি করে সমালোচনামূলক বিশ্লেষণের আওতায় নিয়ে আসা হচ্ছে। কম বেশি মাত্রায় হলেও এটা এখন স্বীকার করা হচ্ছে যে, উপনিবেশিক আধুনিকীকরণের ভূমিকা সন্দেহজনক। ইংরেজ উপনিবেশবাদের 'আধুনিকীকরণ করার ভূমিকাকে' একপেশেভাবে মাথায় তুলে নাচানাচি করার অবস্থানকে ত্যাগ করার জন্য সমালোচনামূলক বিশ্লেষণের দৃষ্টিকোণকে স্বাগত জানাতেই হয়। কিন্তু, হয় পুঁজিবাদ না হয় সামন্তবাদ - এরকম সরলীকরণ করার দৃষ্টিভঙ্গীর প্রভাব এখনো রয়ে গেছে। আসল ব্যাপারটা হলো উপনিবেশিক আধুনিকীকরণের চরিত্র হয় সামন্তবাদী অথবা পুঁজিবাদী এরকম নয়, বরং এর চরিত্রে পুঁজিবাদ এবং সামন্তবাদ দুটোই ছিল এবং আজও তাই আছে। উপনিবেশবাদ যে রূপান্তর ঘটায় তার সাথে সাথে সবসময়ই পুরানো পচাগলা উপাদানকে কোন না কোনভাবে রক্ষাও করা হয়।

সি পি আই(এম-এল)-এর ১৯৬৯ সালের রাজনৈতিক প্রস্তাবে চিহ্নিত করা হয়েছিল যে, সামন্তবাদের সাথে সাথে মুৎসুদ্দি আমলাতান্ত্রিক পুঁজিবাদও সাম্রাজ্যবাদের "দুটো প্রধান স্তম্ভের একটা"। শাসকশ্রেণি হিসাবে "মুৎসুদ্দি আমলাতান্ত্রিক বড় বুর্জোয়া এবং বড় জমিদারদের" চিহ্নিত করা হয়েছিল। রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রকে "রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া পুঁজিবাদ অর্থাৎ আমলাতান্ত্রিক পুঁজিবাদ" হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছিল। বড় পুঁজিপতি এবং তাদের পুঁজিবাদ যে সাম্রাজ্যবাদের মদতে গড়ে ওঠে ও সাম্রাজ্যবাদের সেবা করে - সি পি আই(এম-এল)-এর এই সুস্পষ্ট বিশ্লেষণ ছিল সি পি আই, সি পি এম ও অন্যান্য যে সব কেন্দ্র স্থিতাবস্থা বজায় রাখার পক্ষে ওকালতি করত তাদের দ্বারা তৈরি করা বিভ্রান্তি থেকে একটা নির্ধারক বিচ্ছেদ। সি পি আই(এম-এল)-এর এই মূল্যায়ন পরিচালিত হয়েছিল মাও সে তুঙ চিনের শ্রেণি বিশ্লেষণ করার মাধ্যমে নিপীড়িত দেশগুলির বুর্জোয়াদের চরিত্র সম্পর্কে ধ্যানধারণার ক্ষেত্রে যে গুণগত বিকাশ ঘটিয়েছিলেন তার দ্বারা। মাও সে তুঙের এই অবস্থানগুলিকে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী আন্দোলন সাধারণভাবে গ্রহণ করেছে। যদিও এই বিষয়ে সবার উপলব্ধি এক রকম নয়। যেমন, কেউ কেউ মনে করেন মুৎসুদ্দি বুর্জোয়া এবং আমলাতান্ত্রিক বুর্জোয়ারা হল একই শ্রেণির আলাদা আলাদা অংশ। কেউ কেউ তাদের আলাদা শ্রেণি হিসাবে দেখে থাকেন। এমনকি এই যুক্তিও দেওয়া হয় যে, আমলাতান্ত্রিক পুঁজিবাদের রূপটা কেবলমাত্র রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের জন্যই প্রযোজ্য। এছাড়াও উপনিবেশিক আধুনিকীকরণ এবং ভারতের গ্রামাঞ্চলে চলমান রূপান্তরের প্রক্রিয়ার চরিত্রকে বিশ্লেষণ করা ও বোঝার ক্ষেত্রে আমলাতান্ত্রিক পুঁজিবাদের ধারণাকে প্রয়োগ করার প্রশ্নটাও আমাদের সামনে রয়েছে।

আলোচনার আরও গভীরে ঢোকার আগে "বিকৃত পুঁজিবাদের" ধারণাটার সাথে আমাদের মোকাবিলা করতে হবে। বিকৃত পুঁজিবাদ কথাটাকে প্রায়ই ভুলভাবে আমলাতান্ত্রিক পুঁজিবাদের বদলে ব্যবহার করা হয়। অনেকে মনে করেন যে, পুঁজিবাদের আগে বিকৃত শব্দটাকে ব্যবহার করলে এটা যথেষ্ট পরিস্কার হয় যে, এই পুঁজিবাদ এক বিশেষ ধরনের পুঁজিবাদ যা স্বাধীন নয়। কিন্তু, আমাদের দেশে যে পুঁজিবাদকে বিকশিত করা হয়েছে তা বিকৃত এবং এই সম্পর্ক পুঁজিবাদী (সাম্রাজ্যবাদী) দেশের পুঁজিবাদের থেকে গুণগতভাবে আলাদা – শুধু এটুকু বলার তেমন কোন মূল্য নেই। যে বিষয়টাকে ব্যাখা করতে হবে তা হলো এই বিকৃতির চরিত্র। অর্থাৎ এই সম্পর্কগুলি সাম্রাজ্যবাদের সেবা করে – এটা বিষয়টার একটা দিক, বিকৃতির কেবলমাত্র একটা প্রকাশ। যেভাবে মাও চিহ্নিত করেছিলেন, এই পুঁজিবাদ "দেশীয় জমিদার শ্রেণি এবং পুরানো ধরনের ধনী কৃষকদের" সাথে জড়িয়ে পেঁচিয়ে থাকে। মাওয়ের সূত্রায়ন অনুযায়ী আমলাতান্ত্রিক পুঁজিবাদ হল "মুৎসদ্দি, সামন্ততান্ত্রিক, রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া পুঁজিবাদ"। সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ এবং রাষ্ট্র – এই তিনটির সাথে এই পুঁজিবাদের সংযোগটাকে অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে। আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে 'বিকৃত পুঁজিবাদের' সূত্রটা বিষয়বস্তুর অন্তর্বস্তুকে চাপা দেয়। একইভাবে, "রাজনৈতিক মদতপুষ্ট পুঁজিবাদ" শব্দটাও যথেষ্ট নয়। কারণ, এটা কেবলমাত্র এই পুঁজির সাথে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল বা গোষ্ঠীর গভীর সম্পর্কের দিকটাকে তুলে ধরে। রাজনৈতিক দল বা গোষ্ঠীগুলির সাথে সরাসরি মাখামাখির সম্পর্কের ভিত্তিতে বিভিন্ন মুৎসুদ্দি গোষ্ঠীগুলির ভাগ্যের ওঠা বা পড়ার বিষয়টা নিঃসন্দেহে আমাদের এখানকার পুঁজিবাদের একটা গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। কিন্তু, একই সাথে এটা বিষয়টার কেবলমাত্র একটা দিক। সেজন্য, বিকৃত বা রাজনৈতিক মদতপুষ্ট পুঁজিবাদ – এই দুটি সূত্রায়নের কোনটাই মাওয়ের "আমলাতান্ত্রিক পুঁজিবাদের" ধারণা ও সূত্রায়ণের গভীর বৈজ্ঞানিক অন্তর্দৃষ্টির বদলি হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে না। এটাকে জোরেসোরে উর্দ্ধে তুলে ধরতে হবে।

এখানে এই বিষয়ে পেরুর কমিউনিষ্ট পার্টির সভাপতি কমরেড গঞ্জালোর অবদানের দিকেও আমাদের অবশ্যই নজর দিতে হবে। তিনি নিপীড়িত দেশগুলিকে বিশ্লেষণ করার ক্ষেত্রে মাওয়ের আমলাতান্ত্রিক পুঁজিবাদের ধারণার কেন্দ্রীয় গুরুত্বকে বারে বারে উর্দ্ধে তুলে ধরেছেন। তিনি মাওয়ের এই ধারণাকে প্রয়োগ করেছেন ও বিকশিত করেছেন। তিনি আমলাতান্ত্রিক পুঁজিবাদকে আরও নির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করেছেন, " ... আমলাতান্ত্রিক পুঁজিবাদ হল সেই পুঁজিবাদ যা সাম্রাজ্যবাদ পিছিয়ে পড়া দেশগুলিতে সৃষ্টি করে। যে পুঁজিবাদ পচাগলা সামন্তবাদের সাথে সংযুক্ত এবং সাম্রাজ্যবাদের (যেটা হলো পুঁজিবাদের শেষ পর্যায়) অধীনস্থ। এই ব্যবস্থা সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের সেবা করে না, বরং সাম্রাজ্যবাদ, বড় বুর্জোয়া এবং জমিদারদের সেবা করে"। এছাড়াও " ... একটি আধা-সামন্ততান্ত্রিক ও আধা-উপনিবেশিক দেশে সাম্রাজ্যবাদের গতিপথ ছাড়া আমলাতান্ত্রিক পুঁজিবাদ আর কিছুই নয়। এবং আধা-সামন্ততান্ত্রিক ও আধা-উপনিবেশিক ব্যবস্থা ছাড়া আমলাতান্ত্রিক পুঁজিবাদ থাকতে পারে না।" এর থেকে এটা স্পষ্ট যে, গ্রামাঞ্চলে সাম্রাজ্যবাদের অনুপ্রবেশ গভীরতর হওয়ার অর্থ আমলাতান্ত্রিক পুঁজিবাদের বিকাশ এবং এটা কখনই সামন্তবাদকে উচ্ছেদের দিকে নিয়ে যাবে না। সামন্তবাদকে কোন না কোন রূপে টিকিয়ে রাখা হবে। আমলাতান্ত্রিক পুঁজিবাদ কেবলমাত্র সাম্রোজ্যবাদ ও বড় বুর্জোয়ার ব্যাপার নয়, এই পুঁজিবাদ জমিদারদেরও সেবা করে।

একটি আলোচনায় গঞ্জালো চিহ্নিত করেছিলেন যে, "আমলাতান্ত্রিক পুঁজিবাদের বিকাশের তিনটি লাইন আছে। একটা লাইন হলো গ্রামাঞ্চলে জমিদার লাইন। একটা শিল্পক্ষেত্রের আমলাতান্ত্রিক লাইন। আর তিন নম্বরটা হলো মতাদর্শগত ক্ষেত্রের আমলাতান্ত্রিক লাইন"। তিনি আরও বলেছেন, " এগুলিই হল আমলাতান্ত্রিক পুঁজিবাদের বিকাশের একমাত্র রাস্তা " (জাতীয় প্রশ্ন, ১৯৭৪)। সামন্তবাদকে রূপান্তরিত করার মধ্যে দিয়েই সাম্রাজ্যবাদ আমলাতান্ত্রিক পুঁজিবাদের বিকাশকে এগিয়ে নিয়ে যায়। আমাদের দেশে '৪৭ সালের পরবর্তীকালে নয়া উপনিবেশবাদের অধীনে মুৎসুদ্দি আমলাতান্ত্রিক পুঁজিপতিদের মাধ্যমেই মূলত এই কাজটা করা হয়। এই রূপান্তরের মানে পুঁজিবাদের দ্বারা সামন্তবাদকে অবদমিত করা নয়। বরং এটা হলো সামন্তবাদ ও পুঁজিবাদের জড়িয়ে পেঁচিয়ে থাকার অবস্থা। এটাই হলো এই রূপের পুঁজিবাদের বিশেষত্ব। সেজন্য, ঠিক যেমনভাবে আধা-সামন্তবাদী সম্পর্কগুলির মধ্যে আমলাতান্ত্রিক পুঁজিবাদী সম্পর্কগুলিকে দেখা যায় তেমনি আমলাতান্ত্রিক পুঁজিবাদের মধ্যে সামন্তবাদী (আমাদের দেশের ক্ষেত্রে জাতিবাদী-সামন্তবাদী) সম্পর্কগুলিকে দেখা যায়। এটা শিল্পক্ষেত্র এবং মতাদর্শগত ক্ষেত্র উভয়ের ক্ষেত্রেই সত্য। এছাড়াও, এটাকে মাথায় রাখা গুরুত্বপূর্ণ যখন আমরা রাজনৈতিক ক্ষমতা সহ উপরিকাঠামোর প্রশ্নটাকে বিবেচনা করব।

কেরালার উপর উপনিবেশবাদের প্রভাব নিয়ে আমাদের আলোচনায় আমরা দেখেছি যে, উপনিবেশবাদের সাথে সাথেই আমলাতান্ত্রিক পুঁজিবাদের বিকাশের প্রক্রিয়া শুরু হয়। উপনিবেশবাদী আধিপত্যের সংহতকরণের সাথে সাথেই পুরানো জাতিবাদী-সামন্তবাদ আর আগের মত রইল না। এটা দুনিয়াজোড়া সাম্রাজ্যবাদী জালের অধীনস্থ হল এবং জড়িয়ে গেল। রাজা বা জমিদাররা শোষণের পুরানো জাতিবাদী-সামন্তবাদী পদ্ধতিকে ব্যবহার করে যে উদ্বৃত্ত নিংড়ে নিচ্ছিল তার একটা অংশ এখন আমলাতান্ত্রিক পুঁজি গড়ে তোলার খাতে প্রবাহিত করা হল। অনেক সময় এমনকি সামন্তবাদীরা নিজেরাই কল-কারখানা, রেলপথ নির্মাণ এবং বাগান শিল্প (যেমন, চা বা কফি বাগান বা রাবার বাগান – অনুবাদক) গড়ে তোলার কাজে সরাসরি যুক্ত হল। ১৯৪০-এর দশকের শেষদিকে কেরালাতে যখন আধুনিক শিল্প গড়ে ওঠে তখন থিরুভিঠামকুরের রাজারা মার্কিন, কানাডা, জার্মানি, বেলজিয়াম ও সুইজারল্যান্ডের সাম্রাজ্যবাদীদের সাথে মিলে ১৬টা বড় শিল্পে ১১ কোটি ৪৪ লক্ষ টাকা পুঁজি বিনিয়োগ করেছিল এবং ধার হিসাবে দিয়েছিল। সামন্তবাদীদের এই ধরনের রূপান্তর এবং জমির উপর তাদের একচেটিয়া মালিকানাকে ব্যবহার করে জাতিবাদী-সামন্তবাদকে সাম্রাজ্যবাদের সামাজিক ভিত্তিতে পরিণত করা হয়। সামন্তবাদের রূপান্তরের এই প্রক্রিয়া আবার একই সাথে আমলাতান্ত্রিক পুঁজিবাদ বিকাশের প্রক্রিয়াও বটে।

১৯৪৭ সালে ইংরেজরা শাসকশ্রেণির যে জোটের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করেছিল তার নেতৃত্বে ছিল এই মুৎসুদ্দি, আমলাতান্ত্রিক বুর্জোয়ারাই। ১৯৬০-৭০ এর দশকে আমলাতান্ত্রিক পুঁজিবাদ যখন ব্যাপকভাবে ফুলেফেঁপে উঠেছিল তখন শাসকশ্রেণির জোটে তাদের নেতৃত্বকারী ভূমিকা আরো সংহত হয়। সাম্রাজ্যবাদের নিয়ন্ত্রণের অধীনে এবং সাম্রাজ্যবাদের দ্বারা সামন্তবাদের রূপান্তরের মধ্যে দিয়ে আমলাতান্ত্রিক পুঁজিবাদের উৎপত্তি ও বিকাশ – আমলাতান্ত্রিক পুঁজিবাদের জন্মের এই বিশেষত্বের মধ্যেই এদেশের শাসকজোটে তাদের নেতৃত্বস্থানীয় ভূমিকার কারণ লুকিয়ে আছে। জাতিবাদী-সামন্তবাদের তুলনায় তাদের নিজেদের শক্তির জোরে তারা এই নেতৃত্ব অর্জন করে নি। উপনিবেশবাদের সংহতকরণের মধ্যে দিয়ে জাতিবাদী-সামন্তবাদ তার নেতৃত্বের ভূমিকা হারায়। সামন্তবাদকে অধীনস্থ করেছিল সাম্রাজ্যবাদ, আমলাতান্ত্রিক পুঁজিবাদ নয়। একটা আলাদা শ্রেণি হবার জন্য আমলাতান্ত্রিক পুঁজিবাদীদের নিজেদের শ্রেণি স্বার্থ আছে। এর ফলে কখনো কখনো কোন একটা সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সাথে তাদের দ্বন্দ্ব তৈরি হলেও, সামগ্রিকভাবে সাম্রাজ্যবাদকে বাদ দিয়ে স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতা এদের নেই। শাসকজোটে আমলাতান্ত্রিক বুর্জোয়ার নেতৃত্ব থাকার মানে এই নয় যে, শাসক জোটের মধ্যে যা খুশি করার স্বাধীনতা বা অধিকার তাদের আছে বা তারা নিজেদের খুশিমতো নীতি নির্ধারণ করতে পারে। শেষ সিদ্ধান্ত নেবার অধিকার সাম্রাজ্যবাদের। এবং সামন্তবাদ ও আমলাতান্ত্রিক পুঁজিবাদ – এই দুটো খুঁটিকেই সাম্রাজ্যবাদের প্রয়োজন আছে। সেজন্য আমলাতান্ত্রিক পুঁজিবাদকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য রাষ্ট্র যখনই কোন পদক্ষেপ নেয় তার সাথে সাথেই সাম্রাজ্যবাদের প্রয়োজন অনুসারে কিছু কিছু জাতিবাদী-সামন্তবাদী উপাদান ও সম্পর্ককে নতুন করে টিকিয়ে রাখার জন্য জায়গা তৈরি করা হয় এবং একই সাথে অন্য কিছু উপাদান ও সম্পর্ককে উচ্ছেদ করা হয় ও শেষ করে দেওয়া হয়।

আঞ্চলিক ক্ষমতার বিষয়টাকে এই তাত্ত্বিক কাঠামোর মধ্যে বুঝতে হবে। পুঁজিবাদী সমাজে একটাই শাসক শ্রেণি থাকে। সারা দেশজুড়েই এই শ্রেণিটার রাজনৈতিক শাসন প্রযুক্ত হয়। যদিও জাতিবাদী–সামন্তবাদের যুগে বড় বড় রাজাদের বড় এলাকা জুড়ে ক্ষমতার অস্তিত্ব ছিল, কিন্তু সেই সময় সামন্তশ্রেণির ক্ষমতা প্রয়োগ করার কাঠামো এমনভাবে গড়ে তোলা হতো যাতে আঞ্চলিকভাবে ক্ষমতাকে প্রয়োগ করা হতো। আমাদের দেশের পরিস্থিতিতে দুটো শাসকশ্রেণি আছে, দুটোই সাম্রাজ্যবাদের সেবা করে। ক্ষমতার শ্রেণি অন্তর্বস্তু এবং কাঠামোর মধ্যেও পরিবর্তন ঘটেছে। গোটা দেশজুড়ে যে রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রযুক্ত হয় তা এই তিন শ্রেণির (সামন্তবাদ, আমলাতান্ত্রিক পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ) যৌথ স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করে। কিন্তু, এই তিন শ্রেণির মধ্যে নেতৃত্বকারী হল সাম্রাজ্যবাদ ও আমলাতান্ত্রিক বুর্জোয়া। তাদের নেতৃত্বকারী ভূমিকা বাস্তবায়িত হয় মূলত আমলাতন্ত্র, আইন প্রভৃতির একটা সাধারণ কাঠামোর মাধ্যমে। কিন্তু, সাম্রাজ্যবাদ সামন্তবাদকে শেষ করে দেয় না। একইরকমভাবে, আধুনিক–সারা ভারতজোড়া ক্ষমতার কাঠামোটাও আঞ্চলিক ক্ষমতাকে উচ্ছেদ করে না। যদিও, আঞ্চলিক সামন্ত ক্ষমতার পরিধিকে সারা ভারতজোড়া সামগ্রিক ক্ষমতার কাঠামোর ছাতার তলায় বেঁধে ফেলা হয়। এই তাত্ত্বিক কাঠামোর মধ্যেই আমরা আঞ্চলিক ক্ষমতা প্রয়োগ করার ধরনটাকে বোঝার চেষ্টা করব। কিন্তু, তার আগে কেরালাতে সামন্তবাদকে রূপান্তরিত করার পরবর্তী বিকাশটাকে আমাদের বুঝতে হবে।

কৃষি সংস্কার ও তার পরবর্তীকাল

আধুনিক কেরালাতে কৃষি সংস্কারের প্রথম চেষ্টা ছিল ই এম এস মন্ত্রীসভার ১৯৫৯ সালের আইন। সেই সময়কার পরিস্থিতি ঠিক কিরকম ছিল ? উপনিবেশবাদের প্রভাবে, বিশেষত বাগান অর্থনীতিকে বিকশিত করার জন্য তাদের মদতের ফলে ১৯৫৯ সালের আগেই কেরালায় জমি সম্পর্কের ক্ষেত্রে ভালোরকম পরিবর্তন এসে গেছিল। ১৯৫৯ সালে যখন আইন তৈরি করা হচ্ছে তখন ইতিমধ্যেই থিরুভিঠামকুরের চার ভাগের তিন ভাগ এবং কোচির অর্ধেক বাগান চাষের জমি প্রজা কৃষক মুক্ত হয়ে গেছিল। যদিও মালাবার অঞ্চলে তখনো বেশির ভাগ বাগান চাষের জমিতে প্রজা কৃষক ছিল। এই তিনটি এলাকার ধান চাষের জমিতে তখনো প্রজা কৃষক (ভাগচাষ) ব্যবস্থা চলছিল। যে সমস্ত এলাকায় পুরানো ধরনের ভাগচাষ প্রথা উঠে গেছিল সেই সব জায়গায় নতুন রূপের ভাগচাষ ব্যবস্থার উদ্ভব ঘটেছিল। সমস্ত জমিদার পরিবারগুলি যারা আগে খাজনা আদায় করত তারা এখন আয়ের নতুন নতুন রাস্তায় ঢুকেছিল। সামগ্রিকভাবে, এমন একটা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল যেখানে বেঁচে থাকার জন্য পরিবারগুলির আয়ের মধ্যে কৃষি ও অকৃষিক্ষেত্র থেকে আসা আয় মিলেমিশে গেছিল। জমির উপর যাদের কোন না কোন রূপে নিয়ন্ত্রণ ছিল তাদের পাঁচ ভাগের এক ভাগ লোক আর কৃষির উপর নির্ভরশীল ছিল না।

এমনকি তখনো জাতপাতের কাঠামোর উপরের দিকে থাকার মর্যাদা ও জমির উপর একচেটিয়া দখলদারীর মধ্যে সম্পর্ক এবং দলিতদের জমি না থাকার ব্যাপারটা একটা নির্ধারক উপাদান হিসাবে ছিল। জমির মালিকানায় নায়াররা ছিল সবচেয়ে উপরে। দ্বীতিয় স্থানে ছিল সবর্ণ খ্রীষ্টানরা। তিন নম্বরে ছিল এজাভাররা (একটা অবর্ণ জাত)। নাম্বুদিরিদের কাছে আগের চেয়ে ৬ গুণ বেশি জমি ছিল। অন্যান্য সবর্ণ জাতের লোকদের কাছে আগের চেয়ে ১৩ গুণ বেশি জমি ছিল। সমস্ত সবর্ণ জাতের লোকেরা মিলে মোট জমির অর্ধেক নিয়ন্ত্রণ করত। এদের সাথে যদি খ্রীষ্টানদের জমিকে যোগ করা হয় তাহলে জনসংখ্যার তিন ভাগের এক ভাগ লোক ৬৬ ভাগ জমিকে নিয়ন্ত্রণ করত। এই মালিকরা তাদের জমি মূলত ভাগচাষে দিত। ইতিমধ্যেই, ভূমিহীন কৃষকদের সংখ্যাও ফুলেফেঁপে উঠেছিল। দলিত নয় এমন জাতের লোকদের একটা বড় অংশও কৃষি শ্রমিকের স্তরে নেমে গেছিল। যদিও, তখনও ভূমিহীন কৃষকদের বড় অংশ ছিলেন দলিত জাতের মানুষরাই। এই সমস্ত বিষয়গুলি ভূমি সংস্কারের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ হওয়া উচিত।

১৯৫৯ সালে বিধানসভায় পাশ হবার পর ১৯৬১ সালে কৃষি সম্পর্ক আইন কার্যকরী হয়। কিন্তু, এর ঠিক পরে পরেই আদালত এই আইনকে বাতিল করে। ১৯৬৩ সালে একটা নতুন আইন তৈরি করা হয়, যদিও ৫৯ সালের আইনের কতগুলি মূল ধারা এতে কার্যকারী করা হয় নি। ১৯৬৭ সালে সি পি এম পরিচালিত সাত পার্টির সরকার কিছু সংশোধনী এনে ৬৩ সালের আইনের কিছুটা মাত্রায় পরিবর্তন করে এবং অবশেষে ১৯৭০ সালে সি পি আই ও কংগ্রেস জোট সরকার এই আইনকে লাগু করে। এই সময়কালে বিভিন্ন রাজনৈতিক রঙের সরকার বসেছিল। ১৯৬৩ সালের আইন তৈরি করেছিল পাট্টম থানু পিল্লাইয়ের পরিচালিত পি এস পি ও কংগ্রেস জোট সরকার। এই আইনটা জমিদারদের পক্ষে বেশি সুবিধাজনক ছিল। যদিও, ১৯৫৯ সালের আইন এবং ১৯৬৩ সালের আইন ও পরে যে সব সংশোধনী এসেছিল তার তুলনামূলক আলোচনা করলে পরিস্কার হবে যে, সিলিংয়ের থেকে বেশি জমির জন্য জমিদারদের কতটা ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে এবং সিলিংয়ের আওতায় আনার আইনকে শিথিল করে কোথায় ছাড় দেওয়া হবে তাই নিয়ে কিছু পার্থক্য থাকলেও, ৫৯ সালের 'কমিউনিষ্ট' আইন ও ৬৩ সালের 'অকমিউনিষ্ট' আইনের মিলের দিকটাই অনেক অনেক বেশি।

বাগান চাষের জমিকে আগেই ৫৯ সালের আইনে সংস্কারের আওতার বাইরে রাখা হয়েছিল। বাস্তবত, ৫৯ সালের আইনেই প্রথম রাবার, কফি ও চা ছাড়াও অন্যান্য বাণিজ্যিক ফসলের চাষ বাড়ানোর সুবিধা দেবার বন্দোবস্ত করা হয়েছিল। ৫৯ ও ৬৩ সালের আইনের একটা গুরুত্বপূর্ণ মিলের জায়গা ছিল বাঁধা ভূমিহীন কৃষকদের অধিকারকে অস্বীকার করা হয়েছিল। সমস্ত ভূমি সংস্কার আইনগুলি একটা বিষয়ে এককাট্টা ছিল – কেবলমাত্র জমিদার ও প্রজার সম্পর্ককেই কৃষি সম্পর্কের মর্যাদা দেওয়া হয়েছিল। কৃষি উৎপাদনের ক্ষেত্রে কুডিকিডাপ্পু প্রথার (উপনিবেশবাদীরা আদিয়ালাথম ব্যবস্থার সংস্কার করার পর এই ব্যবস্থার উদ্ভব হয়েছিল) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাকে অস্বীকার করা হয়েছিল। এটাকে কেবলমাত্র বাসস্থানের সমস্যা হিসাবে তুলে ধরা হয়েছিল। অথচ পতিত জমিকে চাষযোগ্য করে তোলা, ধান চাষ, নারকেল বাগান এবং কৃষি উৎপাদনের যন্ত্রপাতি তৈরি করার জন্য কুডিকিডাপ্পুতে বসবাসকারী জনগণ যে শ্রম দিত তার চরিত্র অবশ্যই কৃষি শ্রম। কিন্তু, তাঁদের এই শ্রমকে অস্থায়ী শ্রম হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছিল। যে জমিকে তাঁরা বংশপরম্পরায় উর্বর করে তুলেছিলেন তার উপর তাঁদের অধিকার দেবার বদলে শুধুমাত্র কিছু উদ্বৃত্ত জমি তাঁদেরকে ভিক্ষা হিসাবে ছুঁড়ে দেওয়া হল। সেজন্য এই সমস্ত ভূমি সংস্কার আইনগুলি কুডিকিডাপ্পু কৃষকদের স্থায়ীভাবে বসবাসের অধিকারের কিছুটা উন্নতি ঘটানোর বাইরে কিছুই করে নি (এই অধিকার তাঁরা আগের সংস্কারগুলিতে ইতিমধ্যেই পেয়ে গেছিলেন)। সমস্ত কৃষি সংস্কার আইনগুলি কুডিকিডাপ্পু ব্যবস্থার কাঠামোগত গুরুত্বকে বাতিল করেছিল এবং "কৃষক মানেই প্রজা" এই সরল সমীকরণের ভিত্তিতে তৈরি হয়েছিল। এটাই হল ঐ সমস্ত আইনগুলির জাতিবাদী–সামন্তবাদী অন্তর্বস্তু।

আদিয়ালা মজুর থেকে 'প্রভু'র জমিতে বসবাসকারী কুডিকিডাপ্পু সম্পর্কে আবদ্ধ মজুর এবং সেখান থেকে আজকের দিনের নির্ভরশীল মজুর যারা জীবনধারনের সুযোগ পাবার জন্য জমির মালিকদের কাছে দাসত্বের বাঁধনে বাঁধা থাকতে বাধ্য হয় – ভূমিহীন কৃষকদের এই দীর্ঘ যাত্রাপথে যে বিষয়টার কোন পরিবর্তন হয়নি তা হলো ভূমিহীন দলিত ও আদিবাসীদের উপর জাতিবাদী–সামন্তবাদ যে অকৃষক তকমা সেঁটে দিয়েছে এবং এইভাবে তাঁদের কৃষিজমির অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে। যাঁরা এটাকে পুঁজিবাদী সংস্কারের অবশ্যম্ভাবী ফল হিসাবে দেখতে চান, অর্থাৎ মজুরদের প্রাচীন বন্ধন থেকে মুক্ত করে নতুন সম্পর্কের মধ্যে

এনে ফেলা হিসাবে দেখতে চান তাঁদের এটাও ব্যাখা করে বলতে হবে যে, কেন দরিদ্র কৃষকরা এই একই পরিণতির হাত থেকে বেঁচে গেল। কৃষি সংস্কারের এই গোটা প্রক্রিয়াটা চলাকালীন এবং তারও আগে একটা বড় সংখ্যায় প্রভুর মর্জির উপর নির্ভরশীল প্রজা (জমিদার চাইলে যখন তখন এদের উচ্ছেদ করতে পারে), ভাগচাষী ও মৌখিক চুক্তির ভাগচাষীরা যে জমি চাষ করত সেই জমি থেকে তাদের উচ্ছেদ করা হয়েছিল। কিন্তু, এই ঘটনাটা সংস্কার আইনগুলির অবশ্যম্ভাবী ফল ছিল না, বরং এগুলি ছিল ব্যতিক্রম। এগুলি ছিল জমিদারদের আইনকে ফাঁকি দেবার বা এড়িয়ে চলার ফল। ভাগচাষীর মর্যাদা বরং গরিব চাষীদের উচ্ছেদ হবার হাত থেকে একটা মাত্রা অব্দি রক্ষা করেছিল। পরবর্তীকালে তারা যে জমি হারিয়েছিল তার কারণ ছিল আর্থিক সংকট। কিন্তু, কুডিকিডাপ্পুকারদের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা এরকম ছিল না। কুডিকিডাপ্পুকারদের জমি দেবার ব্যাপারটা কৃষি সংস্কারকদের মাথাতেই ছিল না। এখানে পরিস্কারভাবে সস্তা শ্রমিকদের একটা বাহিনী গড়ে তোলার অর্থনৈতিক স্বার্থ কাজ করেছে। কিন্তু, জাতপাতের ছাপটা এখানে পরিস্কার এবং সেটা কেবলমাত্র এই কারণেই নয় যে, কুডিকিডাপ্পুকারদের বেশিরভাগই ছিলেন দলিত ও আদিবাসী। তাঁদের জমির অধিকার থেকে বঞ্চিত করার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট তৈরি করার পেছনে সবচেয়ে বড় অপরাধী হিসাবে ছিল জাতিবাদী–সামন্তবাদ।

কুডিকিডাপ্পু প্রশ্নে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের দৃষ্টিভঙ্গি খুবই প্রত্যাশিত ছিল। কারণ পুরানো ঐতিহ্যশালী ও নতুন জমিদাররা সব সময়েই কংগ্রেসের মধ্যে কর্তৃত্বকারী অবস্থানে ছিল এবং কংগ্রেস কখনো জাতপাতের প্রশ্নে গান্ধীবাদী সবর্ণ আধিপত্যবাদের বাইরে যায় নি। কিন্তু, ১৯৫৯ সালের আইন ও ১৯৭০ সালের সংশোধনীর ক্ষেত্রে বিষয়টা এরকম ছিল না। এই আইন ও সংশোধনীগুলি তৈরি করেছিল ই এম এস নাম্বুদিরিপাদের মত লোকেরা যারা "জাতপাত–জমিদার–সামন্তবাদ" সম্পর্কে তাত্ত্বিক লেখাপত্র লিখত এবং ভূমিহীন কুডিকিডাপ্পুকাররা কৃষি কাঠামোয় কি ভূমিকা পালন করতেন এবং তার ফলে তাঁরা কি ধরনের জাতিগত নিপীড়নের শিকার হতেন সেটা প্রতক্ষ্যভাবে দেখার যথেষ্ট সুযোগ যাদের রাজনৈতিক প্রয়োগের মধ্যে ছিল। কোন্ শ্রেণি ও জাতের স্বার্থে তারা পরিচালিত হয়েছিল?

"কুডিকিডাপ্পুকার ও উলকুদিকারদের কোন কারণেই উচ্ছেদ করা উচিত নয়"– এই একটা লাইন বাদে ১৯৫৬ সালে ঐক্যবদ্ধ সি পি আইয়ের কেরালা রাজ্য সম্মেলনে গৃহীত ২৯ পাতার ইস্তাহারের মত বিরাট প্রস্তাবে কুডিকিডাপ্পু ইস্যুতে আর একটা কথাও নেই। এই প্রস্তাবের তিন পাতা খরচ করা হয়েছে কেবলমাত্র কৃষি সংস্কারের আলোচনাতে, অথচ সেখানে কুডিকিডাপ্পু ব্যবস্থার বিশ্লেষণের কাজটা হাতে নেওয়া হয় নি। এই বিষয়টাকে কেবলমাত্র একটা লাইনের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে ঐ প্রস্তাবে "কৃষি শ্রমিকদের" বিভিন্ন দাবি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। যেন কৃষি শ্রমিকদের দাবির সাথে কুডিকিডাপ্পু প্রশ্নটার কোন সম্পর্ক নেই। এবং কৃষি শ্রমিকদের যে সমস্ত দাবিগুলি তুলে ধরা হয়েছে সেগুলি হল উদ্বৃত্ত জমি, ন্যায্য মজুরি এবং কাজের সময়, কুটির শিল্প, বাসস্থান এবং ঋণের সুবিধা (সি পি আই ও সি পি এম সঠিকভাবেই দাবি করতে পারে যে তাদের ১৯৫৬ সালের সম্মেলনে তারা আগে থাকতেই ইন্দিরা গান্ধীর ২০ পয়েন্ট ও আই আর ডি পি কর্মসূচীর মূল বিষয়গুলিকে তুলে ধরেছিল)। এই সমস্ত দাবি ছাড়া ঐ প্রস্তাবে কৃষি ব্যবস্থার কাঠামোর পরিপ্রেক্ষিতে কৃষি শ্রমিকরা যে সমস্ত সমস্যার মোকাবিলা করেন সে সম্পর্কে একটা দাবি তোলা হয়েছিল : "জমিদার ও নাটুপ্রামানিমারদের দ্বারা কৃষি শ্রমিকদের, বিশেষত হরিজনদের দাস হিসাবে রাখা ও তাঁদের ভাড়া দেবার প্রথার সমস্ত রূপগুলিকে আইন করে উচ্ছেদ করতে হবে"। এই দাবিটা অবশ্যই প্রশংসনীয়। কিন্তু, আমাদের ভুলে গেলে চলবে না এটা প্রস্তাব করা হচ্ছে ১৯৫৬ সালে। কাগজে কলমে আদিয়ালাথম্ প্রথার উচ্ছেদের এমনকি একশ বছর পরেও জমিদাররা কৃষি শ্রমিকদের দাস হিসাবে রাখত ও তাঁদের ভাড়া দিত – এই পরস্পরবিরোধী ঘটনাটা অবশ্যই যেকোন মার্কসবাদীর কাছ থেকে বিশ্লেষণমূলক পর্যালোচনার দাবি রাখে। খুব প্রত্যাশিতভাবেই ঐ প্রস্তাবের মধ্যে এধরনের কোন বিশ্লেষণ নেই। এছাড়াও, যদিও এই সময় আদিয়ালা শ্রমিকদের অস্তিত্ব ছিল, কিন্তু তাসত্ত্বেও এটা কোনমতেই ভূমিহীন কৃষকরা যে সমস্ত সামন্তবাদী বাঁধনে বাঁধা ছিলেন তার সাধারণ রূপ ছিল না। কৃষি অর্থনীতিতে দাসত্বের পুরানো রূপের অবশেষগুলিকেই কেবলমাত্র উল্লেখ করা অথচ কুডিকিডাপ্পু প্রথার রূপে ব্যাপকভাবে প্রচলিত দাসত্বের নতুন রূপটার বিশেষত্বকে অস্বীকার করার মধ্যে দিয়ে ১৯৫৬ সালের প্রস্তাব আসলে পরিবর্তিত জাতিবাদী–সামন্তবাদের কিছু দিকের সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। কৃষি সংস্কারকে কিছুটা এগিয়ে নিয়ে যাওয়া ছাড়া জাতিবাদী–সামন্তবাদকে পুরোপুরি ধ্বংস করে দেবার কর্তব্য হাতে তুলে নেবার কোন লক্ষ্য ঐ প্রস্তাবে ছিল না। এবং পার্টির একটা প্রস্তাবের অন্তর্বস্তু যদি এই হয়, ভারতের সংবিধানের মধ্যে কাজ করা সি পি আই সরকার কি ফল পয়দা করতে পারে তা নিয়ে অবাক হবার কিছু নেই।

অবশেষে ১৯৭০ সালে কৃষি সংস্কার আইন লাগু হয়। কিন্তু, ততদিনে পরিস্থিতির অনেক পরিবর্তন ঘটে গেছে। সবর্ণদের জমি মালিকানার পরিমাণ আরো কমে গেছে এবং অবর্ণ জাতের লোকদের জমির পরিমাণ বেড়ে গেছে। যদিও তখনো সবর্ণরা জনসংখ্যায় তাদের অনুপাতের তুলনায় অনেক বেশি পরিমাণ জমির মালিক ছিল এবং এভাবে তারা জমির মালিকদের সামনের সারিতে দাঁড়িয়ে ছিল। যদিও অবর্ণদের জমির পরিমাণ বেড়েছিল, কিন্তু কেবলমাত্র একটা ছোট অংশই সত্যিকারের লাভবান হয়েছিল। অবর্ণদের একটা ছোট অংশ জমিদারের স্তরে উঠে যায়, কিন্তু বেশিরভাগটাই ছিল গরিব ও ভূমিহীন কৃষক। অন্যদিকে, সবর্ণ জাতের লোকেরা জমির উপর তাদের একাধিপত্য হারালেও, সবর্ণ জমিদাররা তখনো ভাল পরিমাণ জমির মালিক ছিল। এমনকি আজও যাদের বেশি পরিমাণ জমি আছে তারা সবর্ণ। কিন্তু, সবর্ণদের একটা বড় অংশই জমি হারিয়েছিল অথবা পরিমাণে কমে গিয়েছিল। তারা হয় শিল্প শ্রমিকের সারিতে যোগ দিয়েছিল অথবা কৃষি শ্রমিকে পরিণত হয়েছিল। এটা ঘটেছিল মূলত উপকূলবর্তী এলাকায় অথবা পাহাড় ও সমুদ্রের মধ্যবর্তী সমতল এলাকায় যেখানে অকৃষি ক্ষেত্রের বিকাশ তুলনামূলকভাবে বেশি ঘটেছিল। এসবের মধ্যে যেটা চোখে পড়ার মত তা হলো এত সব পরিবর্তনের পরও জমির মালিকদের মধ্যে সংখ্যায় সবর্ণরা এখনো সবচেয়ে বেশি। যুগ যুগ ধরে যাঁরা ভূমিহীন, সেই দলিতরা একই দূর্দশার মধ্যেই পড়ে রইলেন। সারসংক্ষেপে বলা যায় যে, জাতিবাদী–সামন্তবাদী জমি মালিকানার কাঠামো এখনও আগের মতোই আছে, বিশেষ করে নিচের দিকে।

জাতি–বর্ণগত অবস্থান ও জমির মালিকানার মধ্যে সম্পর্কের ক্ষেত্রে যে সব পরিবর্তন ঘটেছে এবং সবর্ণ জাতের কিছু অংশ ক্ষেতমজুরের স্তরে নেমে গেছে –এই ঘটনাগুলিকে দেখিয়ে এই যুক্তি দেওয়া অর্থহীন যে, জাতিবাদী–সামন্তবাদ বা জাতি–বর্ণগত কাঠামোটাই উচ্ছেদ হয়ে গেছে। অবর্ণ জাতিগুলি, বিশেষত ইজাভাররা জমি পেয়েছে বা তাদের একটা ছোট অংশ জমিদারে পরিণত হয়েছে – এটা দিয়ে কিছুই প্রমাণ হয় না। জাতি–বর্ণ কাঠামোর নিচের অংশগুলির উপরের স্তরটা তাদের সম্পত্তি ও মর্যাদা বাড়িয়ে নিয়েছে এবং কেউ কেউ এমনকি জমিদারে পরিণত হয়েছে – এগুলি যে প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে ঘটেছে তা সবসময়ই জাতি–বর্ণ কাঠামোর গতিশীলতার অংশ ছিল। একটা প্রাসঙ্গিক উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। ঐতিহাসিক গবেষণায় এটা সুপ্রতিষ্ঠিত যে, শুদ্র জাতের নায়াররা জমিদারের মর্যাদা পেয়েছে খুব বেশি হলে মাত্র ছয় শতাব্দি আগে। সাধারণভাবে বলা যায় যে, বিভিন্ন জাতি–বর্ণগুলি যেসব রূপান্তরের মধ্যে দিয়ে গেছে সেগুলিকে দেখে এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া খুবই কঠিন যে, আমরা যেটা দেখছি সেটা জাতিবাদী–সামন্তবাদের ধারাবাহিকতা (অর্থাৎ জাতিবাদী–সামন্তবাদের নিজস্ব গতিশীলতা থেকেই এই রূপান্তরের জন্ম – অনুবাদক) নাকি এগুলি পুঁজিবাদী বিকাশ। বরং আমাদের কাছে মাপকাঠি হল, পরম্পরাগত আদিয়ালার জাত ও আদিবাসী দরিদ্র ও ভূমিহীন কৃষকদের উপর আধিপত্যের কোন্ সম্পর্কগুলি কাজ করে চলেছে।

বিভিন্ন দলিত জাতি ও আদিবাসী উপজাতি, যাঁরা আগে আদিয়ালার ছিলেন, তাঁদের মধ্যে থেকে আসা ভূমিহীন, দরিদ্র কৃষক ও অস্থায়ী মজুররা কি 'মুক্ত' কৃষি বা অকৃষি শ্রমিকে পরিণত হয়েছেন ? তাঁরা কি সামন্তবাদের একটা লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য 'অর্থনীতি বহির্ভূত শোষণ' থেকে মুক্ত হয়ে গেছেন ? যে জমির উপর তাঁরা কুঁড়েঘর বানিয়ে বসবাস করেন সেই জমির (কুডিকিডাপ্পু জমির) উপর তাঁদের অধিকার প্রতিষ্ঠা কি জাতিবাদী–সামন্তবাদ থেকে তাঁদের মুক্তির বস্তুগত ভিত্তি তৈরি করে দিয়েছে? জাতপাতের স্তরে, জাতিবাদী–সামন্তবাদের যে মৌলিক নীতিটাকে ব্যবহার করে আদিয়ালার ও আদিবাসীদের এক ইঞ্চি জমির মালিকানা থেকেও বঞ্চিত করে রাখা হয়েছিল সেটাকে আনুষ্ঠানিকভাবে বাতিল করা হয়। এটাই হল দান হিসাবে নয় বরং আইনী অধিকার হিসাবে আদিয়ালারদের জমির মালিকানা পাওয়ার জাতিবাদী তাৎপর্য। এছাড়াও, জমির মালিকদের কাছে কুডিকিডাপ্পুদের দাসত্বের আনুষ্ঠানিক অবসান ঘটানো হয়। এই ঘটনাগুলিকে কেউ অস্বীকার করতে পারে না। কিন্তু, সামাজিক অস্তিত্বের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সামাজিক সচেতনতা খুব বেশি দূর ও খুব বেশি সময় ধরে এগোতে পারে না – এই সত্যটা ঠিক সময়ে সামনে আসে। তাই পুরানো ও নতুন রূপের অর্থনীতি বহির্ভূত শোষণ ও বাধ্যবাধকতা এখনও দরিদ্র ও ভূমিহীন কৃষকদের (বিশেষ করে দলিত ও তাঁদের সমতুল্য আদিবাসী উপজাতিগুলির) অস্তিত্বের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে রয়ে গেছে।

১৯৭০ সাল নাগাদ অধিকাংশ ভাগচাষের জমিই ছিল ধান চাষের জমি। বাগানের জমিতে মালিকরা মূলত মজুর লাগিয়ে চাষ করাতো। ইতিমধ্যেই ঘোষিত উদ্বৃত্ত জমির থেকে অনেক বেশি পরিমাণ জমিকে ভূমি সংস্কারের আওতার বাইরে এনে ফেলা হয়েছিল – ধান চাষের জমিকে বাগান চাষের জমিতে পরিবর্তিত করে (কারণ বাগান চাষের জমিকে ভূমি সংস্কার আইনের থেকে ছাড় দেওয়া হয়েছিল) এবং বেনামি করে দিয়ে। ১৯৭০–এর পর যে সমস্ত ভাগচাষিরা জমির মালিক হলেন তাঁদের বেশিরভাগই আগেই অন্য পেশার সাথে যুক্ত হয়ে পড়েছেন। সুতরাং, ভূমিসংস্কার আইন আনুষ্ঠানিকভাবে তাদেরকেই জমির মালিকানা দিল যাদের কাছে অর্থনৈতিক কার্যকলাপ হিসাবে কৃষি আর তত জরুরি ছিল না। একে আমরা 'অনিযুক্ত জমির মালিকানা' বলে চিহ্নিত করতে পারি। যদিও এটাই প্রাধান্যকারী প্রবণতা ছিল, তবুও বড় জমির মালিকদের একটা বড় অংশ তখনও কৃষির উপর নির্ভরশীল ছিল। তাদের প্রচেষ্টার ফলেই ৭০ সালে ভূমি সংস্কার আইন লাগু হবার পরের কয়েক বছরে ধান উৎপাদন ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়। কিন্তু, ভারতে সবুজ বিপ্লবের মূল এলাকাগুলি (যেমন, অন্ধ্রপ্রদেশ) থেকে সস্তার চাল আসায় কেরালাতে ধান চাষে লাভ কমে যায়। তখন থেকেই এই লাভ ক্রমাগত কমেছে। অনিযুক্ত জমির মালিকদের সংখ্যা বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ইট ভাঁটা তৈরির জন্য বিশাল পরিমাণ জমিকে খুঁড়ে ফেলা হয়েছে। জমি ভরাট করে ঘর বাড়ি বানানোর জন্য পুনরায় বিক্রি করা হচ্ছে। আর তার চেয়েও বেশি জমি পতিত হয়ে গেছে। কেরালাতে ভূমি সংস্কারের স্ববিরোধীতাকে প্রায়ই এভাবে ব্যাখা করা হয় যে, কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির বদলে ভূমি সংস্কার উৎপাদনকে ব্যাপকভাবে কমিয়ে দিয়েছে। ঘটনা হলো উৎপাদন কমে যাবার ব্যাপারটা কেবলমাত্র খাদ্যশস্য উৎপাদনের ক্ষেত্রেই দেখা গেছে। ১৯৭০ সালের ভূমি সংস্কার রাবার, কফির মত বাগান শস্যের একর পিছু উৎপাদনকে ব্যাপকভাবে বাড়িয়ে দিয়েছে। বিভিন্নভাবে এটা করা হয়েছে। যে সমস্ত জমিদাররা খাদ্যশস্যের বদলে বাগান চাষ শুরু করে তাদের সিলিংয়ের চেয়ে বেশি জমি খাস করে দেবার হাত থেকে ছাড় দেওয়া হয়। অনিযুক্ত জমির মালিকানা বাগান চাষের পক্ষে অনুকূল ভিত্তি তৈরি করে কারণ বাগান চাষে খুব কম প্রত্যক্ষ নজরদারীর দরকার পড়ে। এছাড়াও, যেমন রাবারের ক্ষেত্রে বিপুল পরিমাণ ভর্তুকি দেওয়া হয়। অন্যদিকে, প্রজাস্বত্বের সমস্ত রূপগুলি – ভাগচাষ, টাকায় খাজনা ও শ্রমে খাজনা দেবার প্রথা ক্রমাগত ছড়িয়ে পড়ে। মূলত দরিদ্র ও ভূমিহীন চাষিরা অন্যান্য কাজের পাশাপাশি জীবনধারণের জন্য এই ধরনের ভাগচাষ করত। খাজনা খুবই বেশি, একর প্রতি এমনকি পনেরো থেকে বিশ হাজার টাকা খাজনা দিতে হতো। গত কয়েক বছর ধরে এল ডি এফ বা ইউ ডি এফ সরকার পারস্পরিক সহায়তা গ্রুপগুলিকে ব্যাপকভাবে উৎসাহিত করছে যাতে তারা ব্যাংক থেকে ধার নিয়ে ভাগচাষ করে। সারসংকলন করে বলা যায় যে, উপনিবেশবাদ বিকাশের যে গতিপথকে নির্ধারণ করে দিয়েছিল তাকে ভেঙে বেরিয়ে আসার কোন চেষ্টাই এই সমস্ত কৃষি সংস্কারগুলি করে নি। এই সমস্ত কৃষি সংস্কারগুলির সারকথাটা হল – আরও বেশি বাগান অর্থনীতি, আরও বেশি নির্ভরতা, জাতিবাদী–সামন্তবাদকে রূপান্তরিত করা ও একই সাথে টিঁকিয়ে রাখা, সমাজের সবচেয়ে নিচের অংশটার ভূমিহীনতা।

আমরা এবার আঞ্চলিক ক্ষমতার প্রশ্নটাতে ফেরত আসব। উপরে বর্ণিত কৃষি সংস্কারগুলি আঞ্চলিক ক্ষমতার কাঠামোর উপর কি ধরনের প্রভাব ফেলেছিল ?

আঞ্চলিক ক্ষমতার নতুন ধরন

কেরালার জমিদার শ্রেণি সম্পর্কে কিছু পর্যবেক্ষণ দিয়ে আমরা আলোচনা শুরু করব। পিরামিডের একেবারে চূড়ায় বসে আছে বিরাট বড় বড় জমিদার যাদের জমির পরিমাণ কয়েক হাজার একর থেকে এমনকি লাখ একরেরও বেশি। এদের সংখ্যা খুবই অল্প। চূড়া থেকে পিরামিডের যত নিচে যাওয়া হয় তত জমিদারের সংখ্যা বাড়তে থাকে, কিন্তু এদের জমির পরিমাণ কমতে থাকে। জমির উপর একচেটিয়া দখলদারীর পার্থক্যের ভিত্তিতে এদের বড়, মাঝারি ও ছোট জমিদার হিসাবে ভাগ করা যায়। একেবারে নিচের স্তরের জমিদারদের মোট আয়ের অন্তত অর্ধেক আসে জমি থেকে। কিন্তু, তারা চাষের কাজে গতর খাটায় না। একেবারে উপরের স্তরের বিরাট বিরাট জমিদারদের মধ্যে পড়ে বেসরকারি বা সরকারি (রাষ্ট্রীয়) আমলাতান্ত্রিক পুঁজিবাদী বাগান মালিকরা। এরা সাধারণত আশেপাশের গ্রামের সমাজের সাথে সরাসরি সম্পর্ক রাখে না। এরা আঞ্চলিক নিয়ন্ত্রণ চালায় রাষ্ট্রীয় স্তরের মধ্যস্থতাকারীদের মাধ্যমে। কিন্তু, মাঝারি বা ছোট জমিদারদের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা অন্যরকম। এরা গ্রামের সমাজের প্রতিটি স্তরে সক্রিয়ভাবে উপস্থিত থাকে। তাদের আয়ের একমাত্র উৎস জমি নয়। ব্যবসা, মহাজনি, শিল্প ও অন্যান্য উৎস থেকেও তারা আয় করে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাদের 'পুঁজিবাদী' জমিদার হিসাবে চিহ্নিত করা যায় না। সাম্রাজ্যবাদ ও আমলাতান্ত্রিক পুঁজিবাদের সাথে জড়িয়ে পেঁচিয়ে থাকার জন্য তাদের মধ্যে কিছু পুঁজিবাদী বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। কিন্তু, তাদের চরিত্রের মধ্যে বিভিন্ন মাত্রায় সামন্তবাদী উপাদান অবশ্যই রয়েছে। এটা ছাড়া জমিদারী প্রথা হতেই পারে না। তারাই হল আধা সামন্তবাদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক প্রতিনিধি। এরা মূলত পুরানো হিন্দু সবর্ণ জমিদার জাতগুলি থেকে এসেছে, এদের সাথে যুক্ত হয়েছে সবর্ণ খ্রীষ্টান, মুসলিম এবং ইজাভাররা।

আদর্শ জাতিবাদী সামন্তবাদী সমাজে অথবা যে কোন ধরনের সামন্তবাদী সমাজে রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক আধিপত্যের বিষয়টা জন্মগত অধিকারের সাথে যুক্ত। কিন্তু, আধুনিক কেরালাতে রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে জন্মগত অধিকারের ভূমিকা অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় অনেকটাই কমে গেছে। কোন সন্দেহ নেই যে, মূলত অবর্ণ জাতি–বর্ণ ভিত্তিক নবজাগরণ গণতন্ত্রীকরণের যে প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নিয়ে গেছিল এবং কমিউনিষ্ট আন্দোলনের ফলেই এটা ঘটেছে – এই দুটো আন্দোলনের একটা সাধারণ সুবিধা ছিল যে, দুটো আন্দোলনই 'তলা থেকে গড়ে উঠেছিল'। পুরানোকে বিপ্লবী গণতান্ত্রিক উপায়ে উচ্ছেদের অনুপস্থিতিতে ঐ সমস্ত আন্দোলনগুলি থেকে গড়ে ওঠা নতুন মূল্যবোধগুলি সময়ের সাথে সাথে ক্ষয় পেতে থাকে। যদিও, উপরে উপরে অর্থনৈতিক ক্ষেত্র এবং রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রের বিচ্ছেদটা থেকেই গেল। প্রায় সমস্ত জায়গায় মূলধারার রাজনৈতিক সংগঠনগুলি এবং বিভিন্ন ধরনের সামাজিক সংগঠনের বিস্তারের মাধ্যমে এই

বিচ্ছেদকে টিঁকিয়ে রাখা হয়েছে। সেজন্য, আঞ্চলিক জমিদার বা শোষকদের জোট কমবেশি সরাসরি তাদের ক্ষমতা প্রয়োগ করছে এরকম ঘটনা আজকের কেরালাতে খুবই কম। এর বদলে তারা আঞ্চলিক নিয়ন্ত্রণ চালায় তাদের 'নাটুপ্রামানিথম', পুলিশ ও রাষ্ট্রে কাঠামোর অন্যান্য হাতিয়ার এবং রাজনৈতিক দলগুলির মাধ্যমে। 'নাটুপ্রামানিথম'-এর মানে আঞ্চলিক আধিপত্যবাদ। মালয়ালম শব্দ 'প্রামাণি' থেকে এর উৎপত্তি। যার অন্তর্নিহিত অর্থ হল সবর্ণ সামন্ত প্রাধান্য ও ঔদ্ধত্য।

আধুনিক কেরালাতে মূলধারার রাজনৈতিক পার্টিগুলি ও তাদের গণ সংগঠনগুলি জনগণ এবং রাষ্ট্রের মধ্যে "মধ্যস্থতাকারীর" ভূমিকা পালন করে। রাষ্ট্রযন্ত্র, বিশেষ করে রাষ্ট্রের দমনমূলক যন্ত্র যেমন পুলিশের কাছ থেকে কোন কাজ পেতে হলে অথবা সরকারি সংস্থা বা সমবায় থেকে ঋণ পেতে হলে পার্টির মধ্যস্থতা অবশ্যই প্রয়োজন। উপর উপর দেখলে এটাকে রাষ্ট্রক্ষমতা ও জনগণের মধ্যে রাজনৈতিক পার্টিগুলির মধ্যস্থতা হিসাবে মনে হলেও আসলে এটাই হলো আঞ্চলিক ক্ষমতার প্রয়োগ। শাসকশ্রেণির বিভিন্ন অংশের (এবং সেজন্য বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদী শক্তির) এই সমস্ত প্রতিনিধি এবং দালালরা দমনমূলক রাষ্ট্রযন্ত্রের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। সেজন্য গোটা কেরালা জুড়েই যেটা সাধারণভাবে দেখা যায় – আঞ্চলিক স্তরে মূলত সি পি এম, এছাড়াও আর এস এস, কংগ্রেস ও অন্যান্যদের "পার্টি একচেটিয়াকে" যদি কেবলমাত্র সাংগঠনিক আধিপত্যবাদী সংকীর্ণতাবাদ অথবা সামাজিক ফ্যাসীবাদী প্রবণতা হিসাবে দেখা হয় তবে এর শ্রেণি অন্তর্বস্তুটা আড়ালেই থেকে যাবে। "পার্টি একচেটিয়া" আসলে আঞ্চলিক জমিদার ও অন্যান্য শোষকদের শ্রেণি স্বার্থকে রক্ষা করে ও এগিয়ে নিয়ে যায়। এটা তাদের আঞ্চলিক ক্ষমতা প্রয়োগের একটা হাতিয়ার, একটা রূপ।

কেরালার পরিস্থিতিতে যেখানে জাতপাতের কাঠামো আজও প্রাধান্যকারী অবস্থানে রয়েছে সেখানে পার্টি একচেটিয়ার মাধ্যমে ও তার ভিতর পুরানো জাতিবাদী আধিপত্যকে এখনও বজায় রাখা হয়েছে অথবা পুরানো আধিপত্যকারী জাতের জায়গায় নতুন কোন জাত উঠে এসে জাতিবাদী আধিপত্য বিস্তার করেছে। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় যে, যেখানে সবর্ণ হিন্দু জমিদারদের আধিপত্য ক্ষয় পেয়েছে সেখানে সবর্ণ খ্রিষ্টান, মুসলিম বা ইজাভাররা আলাদাভাবে বা একসাথে সেই জায়গায় আধিপত্য বিস্তার করেছে এবং সেই মতো 'আঞ্চলিক একচেটিয়া ক্ষমতা' এক পার্টির হাত থেকে আর এক পার্টির হাতে চলে গেছে। পার্টিগুলির ভেতরে জাতিবাদী আধিপত্যের সম্পর্কগুলিও সেই মতো নতুন করে গড়ে নেওয়া হয়েছে। এর ফলে নতুন পার্টি গড়ে ওঠার জায়গাও তৈরি হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই যতক্ষণ পর্যন্ত না 'আঞ্চলিক একচেটিয়া ক্ষমতার' দখলদারীর ব্যাপারটা ফয়সালা না হচ্ছে ততক্ষণ অব্দি পার্টিগুলির মধ্যে একের পর এক সংঘর্ষ চলতে থাকে (জাতের মধ্যেকার এলাকাগত বা শ্রেণিগত বিভেদের কারণেও এই ধরনের সংঘর্ষ তৈরি হতে পারে)। যেখানে রাজনৈতিক দলগুলির নেতৃত্ব একই শ্রেণি বা জাত থেকে এসেছে সেখানে এই ধরনের সংঘর্ষ মূল জনগণকে বিভক্ত করে রাখার জন্য ঘটানো হয়। কখনো কখনো উল্টোটাও ঘটে। পার্টি নেতৃত্বের একই জাতিগত স্বার্থের জন্য তারা এই ধরনের সংঘর্ষ বন্ধ করে, বিশেষ করে যখন নিজের জাতের কেউ আঘাত পায়।

কেরালাতে পার্টিগুলির যে শক্তিকে আমরা দেখতে পাই তার উৎস হলো তাদের নিয়ন্ত্রণে থাকা গণ সংগঠনগুলি। সি পি এম বা সি পি আইয়ের মত অতটা ধূর্ত না হলেও এব্যাপারে কংগ্রেস বা অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলি খুব একটা পিছিয়ে নেই। আর এস এস ক্যাডার ভিত্তিক পার্টি গড়ে তোলার পদ্ধতিকে মেনে চলে এবং গণ সংগঠন গড়ে তোলার উপর ভালোরকম নজর দেয়। এই সমস্ত গণ সংগঠনগুলির অধিকাংশ সদস্য গরিব ও মধ্যবিত্ত শ্রেণি থেকে এসেছে এবং এরাই হলো গণ সংগঠনগুলির সক্রিয় শক্তি। কিন্তু, নিয়ন্ত্রণ থাকে আঞ্চলিক শোষকদের হাতেই। এমনকি ক্ষেতমজুর বা শ্রমিকদের সংগঠনের ক্ষেত্রেও এটা দেখা যায়। এছাড়াও প্রত্যেকটি এলাকাতে পার্টিগুলি তাদের গণ সংগঠনগুলিকে গুরুত্বের বিচারে উঁচু নিচু স্তরে বিন্যস্ত কাঠামোর মতো করে গড়ে তোলে। গ্রামাঞ্চলে এই কাঠামোর সবচেয়ে উপরে থাকে তথাকথিত কৃষক সংগঠনগুলি। পুরানো ও নতুন জমিদাররা কৃষক সংগঠনে সরাসরি ও সক্রিয়ভাবে অংশ নেয়। ভূমি সংস্কার পরবর্তী কেরালার শ্রেণি সম্পর্কের উপর একটি গবেষণার উল্লেখ আমরা এখানে করতে পারি। গবেষণাপত্রের লেখক খোলাখুলিভাবে পুঁজিবাদী বিকাশের তত্ত্বে বিশ্বাস করেন। সেজন্য তিনি সমস্ত জমিদারদের "পুঁজিবাদী জমিদার" বলে চিহ্নিত করেছেন। আমাদের কাছে যে ঘটনাটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তা হলো এই সব জমিদাররা সকলেই হয় কংগ্রেস পরিচালিত কৃষকদের গণ সংগঠন "কর্ষক সমাজম" অথবা সি পি এম পরিচালিত "কর্ষক সংঘম"-এর সদস্য। তাদের পার্টি সদস্যপদও আছে। এছাড়াও তারা জমিদারদের স্বার্থরক্ষাকারী আঞ্চলিক "জল ব্যবহারকারীদের সংগঠন"-এরও সদস্য ("কাষ্ট, ক্লাস এন্ড এগ্রেরিয়ান রিলেশনস ইন কেরালা" , আব্রাহাম বিজয়ন)। এই সমস্ত জমিদাররা সরকারি ঋণের অধিকাংশটা হজম করে এবং গ্রামের বিরাট সংখ্যায় গরিবরা এদের কাছে ঋণী।

যদিও ঐ গবেষণাপত্রটা ছাপা হয়েছিল ৯০ দশকের শেষ দিকে, কিন্তু তথ্য সংগ্রহের কাজটা করা হয়েছিল ৭০-এর দশকে। তার পর থেকে কি পরিস্থিতির কোন পরিবর্তন হয়েছে ? অবশ্যই। আঞ্চলিক শোষকদের উপর গ্রামের গরিবদের পুরোপুরি নির্ভরতার ব্যাপারটা লক্ষণীয় মাত্রায় কমে গেছে। কিন্তু, আঞ্চলিক মহাজনদের পুরোনো বন্ধনকে আলগা করে দেওয়া বা এমনকি শেষ করে দেবার পিছনে প্রাতিষ্ঠানিক (ব্যাংক প্রভৃতির) ঋণের চেয়েও বড় ভূমিকা পালন করেছে তামিল মহাজনদের দেওয়া অপ্রাতিষ্ঠানিক ঋণ। এই ধার সহজ শর্তে পাওয়া যায় এবং তামিল মহাজনরা গরিব বা বড়লোক যারই ধারের দরকার তার ঘরের দরজায় টাকা নিয়ে পৌঁছে যায়। আঞ্চলিক গালাগালির ভাষায় জনগণ এদের তামিল ব্লেড বলে। এই ঋণের চূড়ান্ত উৎস হলো তামিলনাড়ুর আধা সামন্তবাদী মহাজনি পুঁজি। বাৎসরিক সুদের বোঝা ১২০ শতাংশ বা তার চেয়েও বেশি হতে পারে। এটা দেখিয়ে দেয় যে একটা আধা-সামন্তবাদী বন্ধন থেকে মুক্ত হবার জন্য আর একটা আধা-সামন্তবাদী বন্ধনের উপর নির্ভর করার ফলে গ্রামের গরিবদের কি ধরনের ভারি বোঝা বইতে হয়। যদিও সুদের এই নিষ্ঠুর বোঝা তাঁরা খানিকটা হলেও বইতে পারেন কারণ সপ্তাহে সপ্তাহে শোধ দিতে হয়। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো যে, এই ঋণ নেবার জন্য কোনকিছু বন্ধক রাখতে হয় না এবং চাইলেই পাওয়া যায়।

কিন্তু, এছাড়াও বিভিন্ন এলাকায় সমবায় ব্যাংক গড়ে ওঠাটাও একটা ভূমিকা পালন করেছে। এল ডি এফ এটা শুরু করলেও পরবর্তীকালের ইউ ডি এফ সরকারগুলিও এটা চালিয়ে গেছে। চলতি ছক থেকে বেরিয়ে সি পি এম আইন তৈরি করে সমবায় ব্যাংকগুলিকে পঞ্চায়েত এলাকায় নতুন শাখা তৈরি করার অনুমতি দেয়। এতে প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ পাওয়ার সুযোগ ও যোগান অনেকটাই বেড়ে যায়। প্রত্যাশিতভাবেই এরকম 'প্রগতির' বিনিময়ে ভালোরকম মূল্য দিতে হবে – পুরানো বন্ধনের বদলে গ্রামাঞ্চলে যে সব পরিবর্তন ঘটেছিল তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ও চেহারার দিক থেকে অনেক বেশি পালিশ করা নতুন বন্ধনে জনগণ বাঁধা পড়লেন।

সমবায় ব্যাংকগুলি হল সেই গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র যেখানে আমলাতান্ত্রিক পুঁজি ও আধা-সামন্তবাদ মিলিত হয়। তাদের পুঁজির যোগান দেয় কেন্দ্রীয় সরকারের নাবার্ড। এই নাবার্ড আবার গড়ে উঠেছে বিশ্ব ব্যাংকের পরিকল্পনামাফিক। এছাড়াও আঞ্চলিক শোষক, বিশেষ করে জমিদারদের উদ্বৃত্তের একটা মোটা অংশ সমবায় ব্যাংকগুলিতে জমা পড়ে। সেজন্য সমবায়ের পুঁজি হলো সাম্রাজ্যবাদ, আমলাতান্ত্রিক পুঁজি ও আঞ্চলিক, আধা সামন্তবাদী শোষকদের উদ্বৃত্তের একটা মিশ্রণ। পার্টির প্যানেলের মাধ্যমে নির্বাচিত আঞ্চলিক শাসকদের বিভিন্ন গোষ্ঠীর জোটগুলি সমবায়কে নিয়ন্ত্রণ করে এবং এগুলি তাদের কাছে কেবলমাত্র সহজ শর্তে

ঋণ পাওয়ার উৎস নয়। আঞ্চলিক ক্ষমতা প্রয়োগের একটা শক্তিশালী হাতিয়ার হলো সমবায়গুলির উপর নিয়ন্ত্রণ। ঋণ দেবার বা ঋণ দেওয়া আটকে দেবার, বন্ধকী সম্পত্তি দখল করার বা না করে ফেলে রাখার অধিকার জমিদার ও অন্যান্য আঞ্চলিক শোষকদের হাতে থাকায় তারা গরিব ও মধ্য কৃষকদের উপর অধীনতার সম্পর্ককে চাপিয়ে দিতে পারে। এটা নাটুপ্রামানিথম-এর একটা অন্যতম প্রধান দিক। অন্যান্য ধরনের সমবায়, যেমন শিল্প সমবায় বা দুগ্ধ সমবায়ের মাধ্যমেও এধরনের অধীনতার সম্পর্ককে চাপিয়ে দেওয়া সম্ভব। এই সব সমবায়ে কাজ দিতে অস্বীকার করে বা কাজ পাইয়ে দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে দালাল তৈরি করা হয়। কেন্দ্র ও রাজ্যের পয়সায় পঞ্চায়েতগুলির বাজেট এখন কোটি টাকার উপর। এগুলিও দালাল তৈরি করার হাতিয়ার। এই প্রতিষ্ঠানগুলির মাধ্যমে জনগণের জীবনের উপর রাজনৈতিক পার্টিগুলির নিয়ন্ত্রণকে শক্তিশালী করা হয়।

সুতরাং পুরানো ধরনের আঞ্চলিক নিয়ন্ত্রণের জায়গায় এসেছে নতুন রূপের নিয়ন্ত্রণ। কিন্তু, এটা সামন্তবাদকে পুরোপুরি উচ্ছেদ করার প্রক্রিয়া নয়। পুঁজিবাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক হাতিয়ার আধুনিক প্রতিষ্ঠানগুলি, সমবায় ও তাদের ঋণ দেবার পুঁজি অথবা পঞ্চায়েত ও তার কার্যকলাপ – এই সমস্ত কিছুকে ব্যবহার করে পুরানোকে নতুন রূপে টিঁকিয়ে রাখা হয়েছে। সামন্ততান্ত্রিক সম্পর্ক এবং মূল্যবোধগুলি, যেমন নাটুপ্রামানিথম ও তার আনুগত্য তৈরির ব্যবস্থা – এখন আধুনিক উপায়কে ব্যবহার করে গ্রামের জীবনে গেঁড়ে বসেছে। অবশ্যই এই সমস্ত সম্পর্কগুলি কেবলমাত্র পুরানোর পুনরাবৃত্তি নয়। এখন এর মধ্যে পুঁজিবাদী উপাদানের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। সেজন্য যে মূল ভিত্তির উপর আঞ্চলিক ক্ষমতার এই কাঠামোটা দাঁড়িয়ে আছে সেটা লক্ষণীয়ভাবে আলাদা।

অন্যভাবে বললে, এমনকি যেখানে পুরানো জমিদার পরিবারের বংশধররা পার্টির নেতা, পঞ্চায়েতের প্রধান বা সমবায়ের মাথা হিসাবে আঞ্চলিক ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রণ করছে সেখানেও তাদের ক্ষমতার ভিত্তি হল 'রাজনৈতিক সমর্থন', জন্মগত অধিকার নয়। জমিদাররা তাদের আঞ্চলিক ক্ষমতাকে প্রয়োগ করার জন্য এই সব আধুনিক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে একটা বাহ্যিক আবরণ হিসাবে ব্যবহার করে, আবার একই সাথে আধুনিক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলির উপর নিয়ন্ত্রণটা আঞ্চলিক ক্ষমতার অন্তর্বস্তুও বটে। বাহ্যিক আবরণ বা ঘোমটা কারণ এই সমস্ত সামন্তবাদী উপাদানদের রাজনৈতিক কার্যকলাপ (এটা আধুনিকতার প্রতীক) হল তাদের পরিবারগুলি পুরানোদিনে যে জাতিবাদী–সামন্তবাদী কর্তৃত্ব ভোগ করত তাকে রক্ষা করা ও টিঁকিয়ে রাখার হাতিয়ার। এটা বাহ্যিক আবরণ বা ঘোমটা আরও এই কারণে যে, রাজনৈতিক দলগুলি প্রার্থী ও সামনের সারির প্রতিনিধি হিসাবে ঐসব সামন্তবাদী উপাদানদেরই নির্বাচিত করে, বিশেষ করে তাদের সামন্তবাদী পারিবারিক মর্যাদা বা 'নামডাকের' জন্য। (অর্থাৎ, আধুনিক প্রতিষ্ঠানগুলি জমিদারদের ক্ষমতা প্রয়োগ করার একটা আবরণ বা ঘোমটা বা হাতিয়ার হিসাবে কাজ করে –অনুবাদক) কিন্তু, আধুনিক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলির উপর নিয়ন্ত্রণ ছাড়া আঞ্চলিক ক্ষমতা প্রয়োগ করা যায় না–আঞ্চলিক ক্ষমতার এই অন্তর্বস্তুকেও অস্বীকার করা যায় না। (আগে জন্মগত অধিকারের জোরে জমিদাররা এলাকায় আধিপত্য চালাত, কিন্তু এখন আধুনিক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলির উপর নিয়ন্ত্রণ ছাড়া এরকম আধিপত্য চালানো খুবই কঠিন। তাই এটা আঞ্চলিক ক্ষমতার নতুন অন্তর্বস্তু –অনুবাদক)। কারণ জনগণের কাছে স্বীকৃত রাজনৈতিক দলের উপর নিয়ন্ত্রণ ছাড়া সামন্তবাদীদের পক্ষে নিজেদের জোরে আঞ্চলিক ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রণ করার সম্ভবনা খুবই কম। এটা অবশ্যই রূপান্তরের একটা সূচক। পার্টিগুলির সাথে সম্পর্কের ব্যাপারে জমিদাররা খুবই নমনীয় কৌশল নিয়ে চলে কারণ তারা তাদের জাতিবাদী–সামন্তবাদী সামাজিক ও অর্থনৈতিক মর্যাদা ও শক্তিকে ব্যবহার করে এক পার্টির বদলে অন্য পার্টির সাথে দরাদরি করতে পারে। কিন্তু, যাই হোক না কেন তাদের আঞ্চলিক ক্ষমতার প্রয়োগ অবশ্যই এই সমস্ত আধুনিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমেই হতে হবে। এই অন্তর্বস্তু সবচেয়ে ভালোভাবে সামনে আসে সেই সমস্ত ঘটনায় যেখানে 'কম সামন্তবাদী মর্যাদার' লোকেরা ক্ষমতার চূড়ায় বসে আছে স্রেফ তাদের রাজনৈতিক সমর্থনের জোরে। তাদের রাজনৈতিক রঙ যাই হোক না কেন, তারা যে শ্রেণি বা জাত থেকেই আসুক না কেন জাতিবাদী–সামন্তবাদী নাটুপ্রামানিথমদের ধরন ও আনুগত্য তৈরির কায়দাকানুনকে তারা অনায়াসে ও দ্রুততার সাথে শিখে নিয়েছে। কিন্তু, যে মুহূর্তে তাদের মাথার উপর থেকে রাজনৈতিক বস্‌দের হাত সরে যায় সাথে সাথে তারা সমস্ত ক্ষমতাশালী পদ ও সুবিধাভোগী অবস্থা হারিয়ে ফালতু লোকে পরিণত হয়। যে সমস্ত রাজনৈতিক বস্‌রা দালাল হিসাবে ব্যবহার করার জন্য এদের হাওয়া দিয়েছিল তারাই এখন এদের ছুঁড়ে ফেলে দেয়। ব্যতিক্রম হল তারাই যারা তাদের পদকে ব্যবহার করে নিজেদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি ঘটিয়ে নিতে পেরেছে। এই ঘটনাটা আমাদের আলোচ্য বিষয়ের আরেকটা দিককে সামনে নিয়ে আসে। আঞ্চলিক ক্ষমতা প্রয়োগের নতুন ধরন নিয়ে আলোচনায় আমরা এখনও অব্দি মূলত পুরানো জমিদারদের ক্ষমতার ব্যাপারটা নিয়েই আলোচনা করেছি। এবারে আমরা নয়া শাসকদের বিষয়ে আলোচনা করব।

১৯৭০ সালের ভূমি সংস্কারের পর কুট্টানাড় এলাকার (চিথিরা, মারথানডাম ও রানি) একজন জমিদারের সিলিং উর্ধ্ব উদ্বৃত্ত তিনটি বড় বড় ধান চাষের জমি (মোট ১৭৫৬ একর) দখল করা হয়। এই জমি ১৬০০ গরিব ও ভূমিহীন কৃষক পরিবারের মধ্যে বিলি করা হয়। শর্ত ছিল যে তারা সবাই একটা সমবায়ের সদস্য হবে এবং মিলিতভাবে ঐ জমি চাষ করবে। বাস্তবত জমির উপর তাদের মালিকানা শুধুমাত্র কাগজে কলমে। তারা হয়ে দাঁড়ায় সমবায়ের অংশীদার। কিন্তু, এটার কোন বাস্তব মূল্য ছিল না। সমবায়ের পরিচালন সমিতি তৈরি হয়েছিল ট্রেড ইউনিয়ন কর্মীদের নিয়ে। তারা সবাই গরিব ও ভূমিহীন কৃষক, অবর্ণ বা দলিত জাত থেকে এসেছে। আইন অনুযায়ী পরিচালন সমিতি কেবলমাত্র দৈনন্দিন কাজকর্ম পরিচালনার কমিটি। মালিকানা ছিল ঐ ১৬০০ পরিবারের হাতে। কিন্তু, সমবায়ের কাঠামোটাই এমন ছিল যে ঐ পরিবারগুলি এর সাথে চিরকালের জন্য বাঁধা পড়ে। নিজেদের জমি ইচ্ছামতো ব্যবহার করার বা বিক্রি করার অধিকার তাদের ছিল না। তারা এমনকি নিজের 'মালিকানার' জমির টুকরোটাকেও চিহ্নিত করতে পারত না কারণ সমবায় গড়ে ওঠার সাথে সাথে এরকম চিহ্নিত করাটা 'অপ্রয়োজনীয়' হয়ে পড়ে। তাদের নামে মালিকানার রেকর্ড করা একখানি কাগজ ছাড়া তারা নতুন কিছুই পেল না। সমস্ত দিক থেকেই তারা পরিচালন সমিতির উপর নির্ভর হয়ে পড়ে। পরিচালন সমিতি কেবলমাত্র নিয়ন্ত্রণই করত না, কার্যত তারা মালিকে পরিণত হয়। ঐ পরিবারগুলির যৌথ জমি মালিকানার সমবায় হিসাবে যার শুরু হয়েছিল তা পরিণত হয় আসলে পরিচালন সমিতির সদস্যদের যৌথ/কর্পোরেট মালিকানায়। সরকারের মদতে ও পুঁজি বিনিয়োগের কারণেই তারা পরিচালন সমিতির পদগুলি দখল করতে পেরেছিল। অন্য কথায়, এটা আরেক ধরনের আমলাতান্ত্রিক পুঁজিবাদী মালিকানা – আমলাতান্ত্রিক পুঁজিবাদী জমিদারতন্ত্রের কর্পোরেট/যৌথ ধরন। এই নতুন ধরনের মালিকানার ভেতরে যে উৎপাদন সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল তাকে ব্যবহার করে পরিচালন সমিতির সদস্যরা বাস্তবে সবর্ণ জমিদারতন্ত্র চালু করেছিল, দালাল তৈরির হাতিয়ারকে ব্যবহার করে এরা জমিতে যারা শ্রম দিত তাদের উপর প্রভুত্ব করত। কৃষকরা এই নির্ভরতার বাঁধনে বাঁধা থাকত। কাগজে কলমে মালিক হওয়া ছাড়া তাদের এই বন্ধনের সাথে পুরানো জমিদারদের অধীনে তাদের অবস্থার কোন ফারাক নেই।

বছরের পর বছর ধরে ঐ সমবায় লোকসান করতে থাকে। পরিচালন সমিতি ঋণ করলেও ঋণের বোঝাটা তারা সমবায়ের সাধারণ সদস্যদের ঘাড়েই চাপায়। জমির উপর তাদের মালিকানাটা শুধুমাত্র খাতায়কলমে হলেও ঋণের এই ভারি বোঝাটা একটা সত্যিকারের বোঝা হিসাবে তাদের ঘাড়ে চাপে। মোট ঋণটাকে ভাগ ভাগ করে এক একজনের ঘাড়ে চাপানো হয় এবং তারা প্রত্যেকে ঐ ঋণ শোধ করতে বাধ্য থাকে। অবশেষে ঐ জমি অন্যদের কাছে ভাড়ায় দেওয়া হয়। ইতিমধ্যেই পরিচালন সমিতির একজন সদস্য ৫০ একর, আর একজন ২৬ একর জমি এদিক ওদিক করে নিজেদের ব্যক্তিগত নামে করে নেয়! কর্পোরেট/যৌথ

ধরনের আমলাতান্ত্রিক পুঁজিবাদ এভাবে ব্যক্তিগত রূপের জমিদারতন্ত্রের জন্ম দেয়। ঘটনাচক্রে, কেরালার বিশেষ ধরনের জাতিবাদী-সামন্তবাদী ব্যবস্থায় কর্পোরেট/যৌথ মালিকানা কোন নতুন ঘটনা নয়। এর একটা উদাহরণ হলো মধ্যযুগের 'নাম্বুদিরি যোগম'-যারা যৌথভাবে মন্দির ও তার সম্পত্তির দেখভাল ও নিয়ন্ত্রণ করত। ঐতিহাসিক ও আজকের দিনের তথ্য এটা দেখিয়ে দেয় যে, যৌথ নিয়ন্ত্রণ ও পরিচলনা নিজে থেকেই কোন নির্দিষ্ট উৎপাদন সম্পর্কের প্রতিনিধিত্ব করে না। আমাদের বিষয়টার আরও গভীরে ঢুকতে হবে অন্তর্বস্তুকে খুঁজে বের করার জন্য। এটা ঘটনা যে, সি.অচ্চুথ মেননের নেতৃত্বাধীন সি পি আই-কংগ্রেস জোটের মন্ত্রীসভা 'যৌথ' খামারের এই রূপকে ব্যপকভাবে ছড়িয়ে দিয়েছিল। ভূমিহীন আদিবাসীদেরও এই ধরনের কর্পোরেট জমিদারতান্ত্রিক আমলাতান্ত্রিক পুঁজিবাদের ফাঁদে ফেলা হয়েছে।

উপরের উদাহরণে, যেভাবে সমবায়ের পরিচালন সমিতির কয়েকজন সদস্য সমবায়ের জমি নিজেদের নামে করে নিয়েছে তা পরিস্কারভাবে ক্ষমতার অপব্যবহার। সরকার বা কোন যৌথ প্রতিষ্ঠানের পদ ও সম্পত্তিকে বেআইনিভাবে ব্যবহার করা হয়েছে নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থপূরণ করার জন্য। আমরা এরকম আর একটি উদাহরণ নিয়ে আলোচনা করব।

ত্রিসুর জেলার পারাপ্পুর সমবায় ব্যাংক কৃষকদের থেকে ধান কেনার ব্যবসা করে। ধান কেনার পর তা পাশের এর্ণাকুলাম জেলার কালাডির একটি বেসরকারি চালকলে সরবরাহ করা হয়। ২০০৮ সালে মিলের কাছে ব্যাংকের পাওনা ছিল প্রায় ৪ কোটি টাকা। ২০০৭-০৮ সালে ৩৩৬২ টন ধান বেশি সরবরাহ করা হয়েছিল, যখন আগের ২ কোটি টাকা পাওনা তখনও বাকি ছিল। ইতিমধ্যে ব্যাংক কৃষকদের তিন মাসের পাওনা আটকে রেখেছিল এই অজুহাতে যে সমবায় ব্যাংকের কাছে যথেষ্ট টাকা নেই !

ফসল কাটার সময় যে সমস্ত ফড়েরা কৃষকদের চাপ দিয়ে অভাবী বিক্রি করতে বাধ্য করত তাদের হাত থেকে বাঁচাতে সমবায় কৃষকদের থেকে ফসল কিনতে শুরু করে। কোন সন্দেহ নেই যে, এর ফলে অবস্থার কিছুটা উন্নতি ঘটে। বেশি দাম দেবার প্রতিশ্রুতি দিলেও পুরো টাকা পেতে কৃষকদের মাসের পর মাস অপেক্ষা করতে হত। কিন্তু, কৃষকদের প্রতি এই ভালোবাসার ঘোমটার পিছনে আসলে কি ঘটছিল ? কৃষকদের থেকে ধান কেনার পর সমবায় ব্যাংকের পুঁজি ধানে রূপান্তরিত হত অর্থাৎ টাকা পরিবর্তিত হত ধানে। এই ধান চালকলকে সরবরাহ করা হত, কিন্তু চালকল সাথে সাথে টাকা মিটিয়ে দিত না। সুতরাং ঐ চালকল তার কাঁচামাল (ধান) পেত ধারে। এই ধান ভাঙিয়ে ও বাজারে বিক্রি করে চালকল খুবই সামান্য বিনিয়োগ করে বিপুল মুনাফা কামিয়ে নিত। এর মানে ঐ চালকলটি সমবায় ব্যাংকের কাছ থেকে সুদ ছাড়া ও ধার শোধ দেবার কোন নির্দিষ্ট সময়সীমা ছাড়া ঋণ নিয়ে (এখানে চালকলের ঋণ নেওয়া পুঁজি ধানের রূপ নিয়েছে) সেই ঋণকে পুঁজি হিসাবে খাটিয়ে ব্যবসা করে যাচ্ছে। এবং এটা করা হচ্ছে যখন ব্যাংক কৃষকদের টাকা ধার দিয়ে মোটা সুদ নিচ্ছে এবং সময়মতো শোধ দিতে না পারলে কৃষকদের উপর জঘন্যভাবে চাপ দেওয়া হচ্ছে।

নিশ্চিতভাবে, চালকলের এই ব্যবসার লাভের একটা অংশ যারা সমবায় ব্যাংককে নিয়ন্ত্রণ করে তাদের পকেটে যাচ্ছে। এটা কি কেবলমাত্র ঘুষ বা চুরির ভাগ দেওয়া ? এখানে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি তা হলো যৌথ/কর্পোরেট পুঁজি (সমবায়ের আর্থিক পুঁজির রূপে) সাথে ব্যক্তি পুঁজির আঁতাত এবং মুনাফার ভাগাভাগি। সমবায়ের এই পুঁজি আবার আঞ্চলিক জমিদারদের উদ্বৃত্তের সাথে আমলাতান্ত্রিক পুঁজির মিশ্রণ। যারা সমবায়ের মাথায় বসে তাদের পদের ক্ষমতাকে ব্যবহার করে সমবায়কে নিয়ন্ত্রণ করছে তারা এই পুঁজিকে নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থ পূরণ করার জন্য কাজে লাগাচ্ছে। পাশাপাশি, তারা নিজেদের ক্ষমতাকে ব্যবহার করে সুযোগসুবিধা পাইয়ে দেয় অথবা সুযোগসুবিধা দিতে অস্বীকার করে এবং এভাবে নিজেদের সামাজিক প্রতিপত্তিকে গড়ে তোলে ও শক্তিশালী করে। যখন তাদের এই অবৈধ কাজকে "পোরাট্টাম" রাজনৈতিকভাবে সামনে নিয়ে আসে তখন সমবায়ের পরিচালন সমিতির মাথারা ক্ষমতায় টিঁকে থাকার জন্য কি ধরনের হাতিয়ার ব্যবহার করেছিল সেটা যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য। একদিকে, সি পি এম তার গোটা পার্টিকে ময়দানে নামিয়ে দেয় জনগণের মধ্যে প্রচার করার জন্য। কংগ্রেস পরিচালিত সমিতির আমলের চেয়ে অনেক বেশি লোককে ঋণ দেওয়া শুরু হয়। অন্যদিকে, অর্থের লোভ দেখানো হয়। সমবায়ের ইতিহাসে প্রথমবার সমবায় সদস্যদের মোটা টাকা বোনাস দেওয়া হয়। এভাবে ঐ পরিচালন সমিতি আবার বিপুল ভোটে নির্বাচিত হয়। কিন্তু, এই গোটা প্রক্রিয়ায় কর্পোরেট/যৌথ ধরনের পুঁজিবাদের নতুন কাঠামোটার ফাটলগুলিও সামনে আসে।

জনগণের সম্পদ/অর্থ এবং পার্টি-পঞ্চায়েত, বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানের পদগুলির উপর নিয়ন্ত্রণের ভিত্তিতেই আঞ্চলিক আধিপত্য ও শোষণের নতুন ধরনটা দাঁড়িয়ে আছে। আগের অবস্থার থেকে এটাকে অনেক সময়ই একটা প্রগতিশীল পদক্ষেপ বলে মনে হয়। যেমন, উপরে আমরা সমবায় ব্যাংকের যে ঘটনাটাকে বিশ্লেষণ করেছি সেই ব্যাংকে অতীতে কংগ্রেস পরিচালিত সমিতি মূলত এলাকার জমিদার ও বড়লোকদের প্রয়োজন মেটানোর হাতিয়ার হিসাবে কাজ করত। সি পি এমের অধীনে যদিও আগের মতোই সমবায়ের সদস্যপদ খুব কড়াকড়ি বাছাই করে দেওয়া হতো, কিন্তু ব্যাংক থেকে ঋণ পাওয়াটা অনেক সহজ হয়ে যায়। যদিও, এই ঋণ কেবলমাত্র সি পি এমের আঞ্চলিক কমিটির সুপারিশেই পাওয়া যেত। কিন্তু তাসত্ত্বেও, জনগণের মধ্যে রাজনৈতিক সমর্থনের জোরে এবং আগের চেয়ে বেশি সংখ্যায় লোককে ঋণ দেবার (সমর্থন পাওয়ার এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার) মাধ্যমে এই নতুন ধরনের নিয়ন্ত্রণকে গ্রহণযোগ্য করে তোলা হয়। কিন্তু, শেষ বিচারে এই নতুন ধরনের আধিপত্য আসলে শোষণের কাজেই লাগত। কৃষকদের থেকে নিংড়ে নেওয়া উদ্বৃত্তকে (জমিদাররা কৃষকদের থেকে অর্থনীতি বহির্ভূত উপায়ে যে উদ্বৃত্ত নিংড়ে নিত তা ঐ সমবায় ব্যাংকেই জমা পড়ত-অনুবাদক) অবশ্যই আরও বেশি লাভের জন্য পুনরায় বিনিয়োগ করতে হবে। এই প্রয়োজন থেকেই শুরু হয় বিভিন্ন ধরনের অবৈধ ব্যবহার (উপরে দেখানো হয়েছে কিভাবে সমবায় ব্যাংকের পরিচালন সমিতির সদস্যরা চালকলের সাথে মিলে মুনাফা লুটেছে - অনুবাদক)। এইসব কাজকর্মই আবার এই নতুন ধরনের ক্ষমতার গ্রহণযোগ্যতাকে নষ্ট করার অন্যতম শক্তিশালী হাতিয়ার। উপরে সমবায় ব্যাংকের উদাহরণে ব্যক্তিগত স্বার্থপূরণের জন্য ব্যাংকের কর্মকর্তাদের বদমাইশী কার্যকলাপের ঘটনাটাকে কোনভাবেই অস্বীকার করা যায় না। একইভাবে এটাকেও অস্বীকার করা যায় না যে, বেসরকারি চালকলকে সহজ শর্তে ধার দেওয়া হয়েছে অথচ সেই তুলনায় কৃষকদের মাথায় কঠোর শর্ত চাপানো হয়েছে। এর বিরুদ্ধে জনগণের ক্ষোভকে অন্য দিকে ঘুরিয়ে দেবার জন্য অতীতের কংগ্রেস পরিচালিত সময়ের চেয়ে কতটা 'প্রগতি' হয়েছে সেই গল্পকে সামনে আনা হয়েছে। এভাবে সি পি এম কেবলমাত্র একটা কাজই করতে সফল হয়েছে -নিজেদের পচনটাকে আরও পরিস্কারভাবে খুলে ধরেছে। নিজেদের জনগণের সামনে নাঙ্গা করার বিনিময়ে তারা সমবায়ের উপর নিজেদের নিয়ন্ত্রণকে ধরে রাখতে পেরেছে। এমনটা নয় যে, সমবায়ের কৃষক সদস্যরা কোন মোহ বা ভালোবাসার জায়গা থেকে সি পি এমকে ক্ষমতায় ফিরিয়ে এনেছেন, বরং তাঁদের সামনে কোন ভালো বিকল্প ছিল না।

আগেকার দিনে জমিদারদের সরাসরি আঞ্চলিক ক্ষমতা প্রয়োগের তুলনায় আজকের 'পার্টি–সমবায়–পঞ্চায়েত–পুলিস' চক্রের ক্ষমতা প্রয়োগের উপর একটা গণ, যৌথ মুখোশ চড়ান হয়েছে। এর ফলে এই নতুন ক্ষমতার চরিত্রকে খুলে ধরা ও আক্রমণ করার কাজটা অনেক জটিল হয়ে গেছে। কাজটা আরও শক্ত হয়ে যায় যখন যে পার্টি ক্ষমতায় আছে তার যদি একটা 'বাম' মুখোশ থাকে। কিন্তু, তার মানে এই নয় যে তারা জনগণের ক্ষোভের আগুন থেকে চিরকালের জন্য পার পেয়ে যাবে। পার্টি নেতা, পঞ্চায়েতের কর্মকর্তা, সমবায় সমিতির পরিচালক ও এলাকার পুলিসের মাথারা – এদের খোলাখুলি বা গোপন আঁতাতটাই হলো নতুন ধরনের আঞ্চলিক ক্ষমতার নির্দিষ্ট বহিঃপ্রকাশ। কিন্তু যেহেতু এটাও জনবিরোধী রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রয়োগের কেবলমাত্র আরেকটা ধরন তাই এই চক্রটা তাদের সামন্তবাদী পদ্ধতি, যেমন তাদের দালালদের 'নাটুপ্রামানিথম' ধরনের কার্যকলাপ (পাইয়ে দেবার রাজনীতি) এবং জনগণের সম্পদ লুঠের মাধ্যমে নিজেদের আসল চরিত্রকে অবশ্যই খুলে ধরবে। এভাবে এরা যতই জনদরদী হবার ভান করুক না কেন, 'জনগণের মাথার উপর বসে থাকা' একটা ক্ষমতা হিসাবে নিজেদের চরিত্রকে খুলে দেয় এবং জনগণ থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। এদের বিরুদ্ধে জনগণকে সংগ্রামের ময়দানে টেনে আনার জন্য আমাদের পক্ষে উপযুক্ত শ্লোগান হল :

"নিজেদের উচ্চপদকে ব্যবহার করে জনগণের সম্পদ লুন্ঠনকারী নয়া প্রভুদের বিরুদ্ধে সমাবেশিত হোন ও সংগ্রাম গড়ে তুলুন"

স্থানীয় ক্ষমতা প্রয়োগের নতুন ধরন ঃ পরিপ্রেক্ষিত পশ্চিমবংগ

গণ মুক্তি সংগ্রাম (পশ্চিমবংগ)

স্থানীয় ক্ষমতা ঃ ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ না কি নতুন ক্ষমতার সংহতকরণ ?

ভারতীয় সংবিধানের ৪০ নং ধারায় বলছে ঃ "রাজ্য গ্রাম পঞ্চায়েত গঠনের পদক্ষেপ করবে এবং তাকে এমন ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব দেবে যাতে সেটি স্বায়ত্বশাসনের একক হিসাবে কাজ করতে পারে।" বুর্জোয়া কাঠামোয় স্বায়ত্বশাসন যদিও শেষ বিচারে শাসক-শোষকদের স্বার্থই রক্ষা করে, তবুও সংবিধানের সীমিত ঘোষণাটুকুও কার্যকর করার জন্য শাসকশ্রেণির উপর দীর্ঘকাল তলা থেকে তেমন কোন চাপ ছিল না। আমলাতান্ত্রিক বড় বুর্জোয়া ও সামন্তপ্রভুদের সবচেয়ে পুরানো সংগঠিত দল কংগ্রেসই ছিল জাতীয় ও স্থানীয় রাজনীতির কেন্দ্রে। গ্রামাঞ্চলে কংগ্রেসী শাসন শোষণ চলত বড় বড় জোতদারদের মাধ্যমে। এই সময়টা ছিল বড় জোতদারদের ব্যক্তিকর্তৃত্বের যুগ। পঞ্চায়েত বলে কোন কিছুই ছিল না। স্বাভাবিক কারণেই এই সময় সামন্তবাদ বিরোধী যে কোন লড়াই অতিদ্রুত কংগ্রেস বিরোধী লড়াইয়ে পরিণত হতো। এরাজ্যে তেভাগা আন্দোলনে লড়াকু কৃষকজনতার বিরুদ্ধে নিষ্ঠুরতায় পুলিশকেও ছাপিয়ে গেছিল গান্ধীটুপি পরা কংগ্রেসী সেবা দল (এরা আসলে ছিল জোতদারদের গুন্ডাবাহিনী)। ১৯৬৪ সালে চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনের সময় থেকে সারা দেশ জুড়ে কংগ্রেসের একদলীয় স্বৈরতান্ত্রিক আধিপত্যের বিরুদ্ধে মানুষ বড় আকারে ঘুরে দাঁড়াতে শুরু করেন। এরই সাথে জুড়ে যায় বিভিন্ন জাতিসত্তাগুলির আঞ্চলিক আমলাতান্ত্রিক বুর্জোয়ার উচ্চাকাঙ্ক্ষা। ষাটের দশকের মাঝামাঝি থেকে সত্তর দশকের শেষ - এই দেড় দশক ছিল সারা দুনিয়ার সাথে সাথে পশ্চিমবংগের রাজনীতিতেও এক ইতিবাচক টালমাটাল সময়। একদিকে শাসকশ্রেণির তৈরি করা দেশজোড়া নকল খাদ্যসংকট ও দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতির মোকাবিলায় জনগণ দমদম দাওয়াইয়ের পথে নেমে পড়েন, অন্যদিকে বিপ্লবী নকশালপন্থীদের রাজক্ষমতা দখলের লড়াই সারা ভারতে দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়তে থাকে। নকশালপন্থীদের দেখানো জঙ্গী বিপ্লবী সামন্তবাদ বিরোধী লড়াই কলেজ পড়ুয়ার পাঠ্যবইতে উঠে আসে। সি পি আই (এম-এল)সামরিক লাইনের সমস্যাটার একটা সঠিক সমাধান করতে ব্যর্থ হওয়ার জন্য সঠিক বিপ্লবী দিশা সত্ত্বেও বিপ্লবে ধাক্কা আসে। প্রতিক্রিয়াশীল-শোধনবাদী সমান্তরাল অনুশীলনের পথ বেয়ে শূন্যস্থানে ঢুকে পড়ে তথাকথিত মূল ধারার রাজনৈতিক দল। পশ্চিমবংগে বামফ্রন্ট। গোটা টালমাটাল সময়ের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে শাসকশ্রেণি নতুন কৌশল নেয় ঃ জাতিসত্তাগুলির আঞ্চলিক আমলাতান্ত্রিক বুর্জোয়ার সাথে দর কষাকষি ও আঁতাত হল কৌশলের একটা দিক। তৃণমূলস্তরে স্বায়ত্বশাসনের সংস্থাগুলিকে ঢেলে সাজানো এবং আগের চেয়ে বেশি ক্ষমতা দেওয়া হল আর একটি দিক। প্রথম কৌশলের উদ্দেশ্য শাসকশ্রেণির নিজের সুখী সংসার অটুট রাখা। দ্বিতীয় কৌশলের উদ্দেশ্য জনগণকে বিপ্লবী রূপান্তরের স্বপ্ন থেকে দুরে রাখা এবং শ্রেণি শাসনের জোয়ালটাকে একেবারে তৃণমূলস্তরে সংহত করা। ১৯৭৭ সালে ক্ষমতায় এসেই বামফ্রন্ট পঞ্চায়েত ভোট, মিউনিসিপ্যালিটি-কর্পোরেশন ভোট নিয়মিতকরণের কর্মসূচী নেয়। ত্রিস্তর পঞ্চায়েত কাঠামোর পুনর্বিন্যাস ঘটায়। কংগ্রেসী জোতদারদের একটা বড় অংশই জামা বদলে রাতারাতি সি পি এম হয়ে যায়। হাড়ে মজ্জায় কংগ্রেসী জোতদারদের ক্ষমতাচ্যুত করে বামফ্রন্টের প্রধান শরিক সি পি এম সামাজিক ক্ষমতায় প্রতিপত্তিশালী পার্টি অনুগতদের হাতে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করতে থাকে। আগে বড় জোতদাররা সরাসরি রাজনৈতিক শাসন চালাতো। অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতার রাশটা কংগ্রেসী জোতদারদের হাতেই কেন্দ্রীভূত ছিল। সি পি এমের আমলে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্র উপর উপর আলাদা হয়ে যায়। এখন রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যম হয়ে ওঠে পার্টি ও পঞ্চায়েত। কিন্তু, বাস্তবত নয়া জোতদার শ্রেণি পার্টি ও পঞ্চায়েতের ক্ষমতা নিজেদের হাতেই কেন্দ্রীভূত করে। আবার উল্টোদিকে পার্টির বসরাই হয়ে ওঠে এলাকার নয়া জোতদার। গ্রাম জীবনের প্রতিটি স্তরে ছড়িয়ে পড়ে পার্টিশাসনের বকলমে এক নতুন ধারার শ্রেণি শাসনের জাল। তৈরি হয় এক নতুন শাসকশ্রেণি ঃ নয়া জোতদারশ্রেণি। রাষ্ট্রের মদতে এরা অতিদ্রুত হয়ে ওঠে ফ্যাসিবাদী গেস্টাপো বাহিনীর মতো। গ্রামেগঞ্জে চালু হয় অলিখিত ফরমান ঃ গ্রামে থেকে সি পি এমের বিরোধীতা, আর জলে থেকে কুমীরের সাথে শত্রুতা একই ব্যাপার। ১৯৭৭ থেকে ২০০৬ - এই ২৯ বছর এভাবেই চলছিল। শ্মশানের শান্তি আর স্থিতাবস্থা। সি পি এমের হোমিওপ্যাথিক রিলিফের রাজনীতি আর একেবারে তলার স্তর অব্দি শাসক শ্রেণির রাজনৈতিক শাসন ও শোষণের জালটাকে সংহত করার লক্ষ্য মিলে মিশে একাকার হয়ে গেছিল এই তিন দশকে। সব হিসাব একেবারে উল্টেদিল সিংগুর-নন্দীগ্রাম-লালগড়। আন্দোলনগুলিকে বিপ্লবী দিশায় চালিত করতে বিপ্লবীদের ব্যর্থতার কারণে জনগণের চাপা ক্ষোভ ফেটে পড়ে পরপর তিনটে নির্বাচনে। পঞ্চায়েত- লোকসভা - বিধানসভা নির্বাচন জমি অধিগ্রহণের প্রশ্নে গণভোটে বদলে যায়। পরাস্ত হয় বামফ্রন্ট। আর বামফ্রন্ট বিরোধী গণরোষের ঢেউয়ের চূড়োয় চেপে ক্ষমতায় এল তৃণমূল -কংগ্রেস জোট সরকার। ইতিমধ্যেই নতুন সরকার ক্ষমতায় পাঁচ মাস কাটিয়ে দিয়েছে। কিছুই বদলায় নি - শ্লোগানগুলি ছাড়া। এরাও চলছে সি পি এমেরই দেখানো রাস্তায়। অর্থাৎ পার্টি অফিস থেকে গ্রাম শাসনের রাস্তায়। খুনখারাপি-খেয়োখেয়ি-বিরোধী মতামত দমন করা-একদলীয় স্বৈরাচারের রাস্তায়। নয়া জোতদারদের পুরোনো সংগঠন সি পি এম ভেঙেচুরে তছনছ করে দিয়ে গ্রামে গ্রামে অতিদ্রুত গড়ে উঠছে তৃণমূলের নয়া সংগঠন। নয়া জোতদারদের বড় অংশটা জামা বদলে রাতারাতি টি এম সি হয়ে যাচ্ছে। ঠিক যেমনভাবে ৩৫ বছর আগে কংগ্রেসী পুরোনো জোতদাররা রঙ পাল্টে রাতারাতি সি পি এমে ভিড়ে গিয়েছিল। একেই কি বলে ইতিহাসের পরিহাসমূলক পুনরাবৃত্তি ?

নয়া জোতদার শ্রেণির উত্থানের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক তাৎপর্য ঃ

নয়া জোতদার শ্রেণি আকাশ থেকে পড়েনি। তাদের সৃষ্টি করা হয়েছে সত্তরের দশকের পরবর্তী পর্বে ভারতের মতো আধা সামন্ততান্ত্রিক-আধা উপনিবেশিক দেশের গ্রামাঞ্চলে সাম্রাজ্যবাদের আরও গভীরতর অনুপ্রবেশের স্বার্থসিদ্ধির জন্য। কৃষিক্ষেত্রে আমলাতান্ত্রিক পুঁজির ঢোকার পথ প্রশস্ত করার জন্য। কিভাবে নয়া জোতদার শ্রেণি কৃষিতে সাম্রাজ্যবাদ ও আমলাতান্ত্রিক পুঁজির অনুপ্রবেশের হাতিয়ার হিসাবে কাজ করছে বিপ্লবীদের সে সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা থাকা অত্যন্ত জরুরি। অত্যন্ড় জরুরি গ্রামাঞ্চলে রাজনৈতিক ক্ষমতার কাঠামোর পরিবর্তনের অভিমুখটিকে ধরা।

ভারতের মত আধা সামন্ততান্ত্রিক ও আধা উপনিবেশিক দেশের পুঁজিবাদের চরিত্র হলো দালাল ও আমলাতান্ত্রিক। দালাল কারণ এই পুঁজিবাদ সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থে ও নিয়ন্ত্রণে বিকশিত হয়েছে। আমলাতান্ত্রিক কারণ এই পুঁজিবাদ আধা উপনিবেশিক রাষ্ট্রের মদতে টিঁকে থাকে ও বিকশিত হয়। এই পুঁজিবাদ কেবলমাত্র শিল্প ও সেবা ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ নেই। অথবা এটাও বলা চলে না যে, টাটা, বিড়লা বা আম্বানিদের মত মত বড় বড় পুঁজিপতিরাই কেবলমাত্র দালাল, আমলাতান্ত্রিক পুঁজিবাদী। কৃষি ক্ষেত্রেও সাম্রাজ্যবাদের মদতে এই পুঁজিবাদের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। কৃষি ক্ষেত্রে যে আমলাতান্ত্রিক পুঁজিবাদের বিকাশ ঘটছে তার চরিত্র হলো (১) সাম্রাজ্যবাদ তার নিজের প্রয়োজনে এই পুঁজিবাদের সৃষ্টি করেছে (২) সামন্তবাদের ভিত্তির উপর এই পুঁজিবাদ বিকশিত হয়েছে (৩) রাষ্ট্রের প্রতক্ষ্য মদতে এর বিকাশ ঘটেছে। আমলাতান্ত্রিক পুঁজিবাদ আমাদের রাজ্যের গ্রামাঞ্চলে মূলত আশির দশকের শুরু থেকে বিকশিত হতে শুরু করে। এর ফলে জাতিবাদী-

সামন্তবাদী শোষণের পুরোনো রূপগুলি পরিবর্তিত হয় এবং শোষণের নতুন নতুন রূপের বিকাশ ঘটে। এর সাথে সাথে গ্রামাঞ্চলে রাজনৈতিক ক্ষমতার কাঠামোর মধ্যেও নতুন নতুন বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। আমাদের আলোচনার প্রথম ভাগে আমরা চিহ্নিত করার চেষ্টা করেছি কিভাবে আধা সামন্তবাদকে সাম্রাজ্যবাদের প্রয়োজনের সাথে খাপ খাইয়ে একদিকে ভেঙে ফেলা হয়েছে এবং অন্যদিকে নতুন রূপে টিকিয়ে রাখা হয়েছে। আধা সামন্ততন্ত্রের রূপান্তর প্রক্রিয়ার এই ভেঙে ফেলা এবং টিকিয়ে রাখার দ্বন্দ্বটাকে আমরা উপলব্ধি করার চেষ্টা করেছি। এছাড়াও আমরা দেখাবার চেষ্টা করেছি কিভাবে আমলাতান্ত্রিক পুঁজিবাদের সাথে সামন্তবাদী উৎপাদন সম্পর্কগুলি জড়িয়ে পেঁচিয়ে রয়েছে। দ্বিতীয় ভাগে আমরা গ্রামাঞ্চলে রাজনৈতিক ক্ষমতার কাঠামোর পরিবর্তনটাকে ধরার চেষ্টা করেছি। বিশেষ করে ভোটবাজ পার্টিগুলির ভূমিকাকে বোঝার চেষ্টা করা হয়েছে। তৃতীয় ভাগে আমরা কতগুলি বিতর্কিত বিষয় সম্পর্কে আমাদের মতামত দিয়েছি।

১. নয়া জোতদারী শোষণের রকমসকম ঃ

নকশালপন্থীদের নেতৃত্বে জনগণ পুরোনো ধরনের বড় বড় কংগ্রেসী জোতদারদের কর্তৃত্বকে ধ্বংস করে দিয়েছিল। ৭৭ সালে ক্ষমতায় আসার পর সি পি এম সরকারি ক্ষমতাকে ব্যবহার করে পুরোনো জোতদারদের (মূলত উচ্চবর্ণের) কর্তৃত্বকে আরও খর্ব করে দেয়। সাম্রাজ্যবাদ নির্দেশিত ও নিয়ন্ত্রিত সি পি এম মার্কা ভূমি সংস্কারের ফলে পুরোনো ধরনের জোতদারদের জমিজমাও অনেকটা হাতছাড়া হয়ে যায়। এছাড়াও জোতদার পরিবারের মধ্যে জমি ভাগাভাগির ফলেও বড় বড় জোতের সংখ্যাও অনেকটা কমে যায় (যদিও এখনও কোন কোন এলাকায় বড় জোতদার রয়ে গেছে)। কিন্তু, এর ফল কি হলো? সি পি এম ও অনেক বুদ্ধিজীবী প্রচার করে থাকে যে, বড় জোতদার না থাকার মানে এই রাজ্য থেকে জমিদারী ব্যবস্থা বা সামন্তবাদী ব্যবস্থা শেষ হয়ে গেছে। এই রাজ্যের কৃষিতে পুঁজিবাদ এসে গেছে। এটা ঠিক যে, এখন বহু এলাকাতে বর্গাদাররা মালিকের সাথে ফসল ভাগাভাগির বদলে টাকার চুক্তি করছেন, কৃষকরা চাষের জন্য প্রয়োজনীয় সার, বীজ, কীটনাশক বাজার থেকে কিনছেন এবং ফসল বাজারে বিক্রি করছেন, ট্রাকটার বা পাওয়ার টিলারের মত চাষের যন্ত্রপাতির ব্যবহার বেড়েছে, কংগ্রেস আমলের মত ক্ষেতমজুররা এখন জোতদারদের কাছে বাঁধা দাসের মত অবস্থায় নেই, তাঁরা টাকায় মজুরী পাচ্ছেন। অর্থাৎ, টাকাকড়ির প্রচলন বেড়েছে, পণ্য বিনিময় বা বাজারের বিকাশ ঘটেছে। কিন্তু এসবের মানে কি এরাজ্য থেকে জাতিবাদী-সামন্তবাদী ব্যবস্থার বিলোপ ঘটেছে? এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, এরাজ্যের গ্রামে পুঁজিবাদী সম্পর্কের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। এই পুঁজিবাদের চরিত্র কি? পশ্চিমবাংলার গ্রামাঞ্চলের এই পরিবর্তনগুলির চরিত্রকে গভীরভাবে বোঝা দরকার। তবেই আমরা গ্রামাঞ্চলের রাজনৈতিক ক্ষমতা কোন শ্রেণির হাতে আছে এবং এই শ্রেণিটার চরিত্রটাকে বুঝতে পারব। এছাড়াও আমাদের খুঁজে বার করতে হবে বাংলার গ্রামের আর্থিক অবস্থার এই পরিবর্তনগুলি শাসক শ্রেণির রাজনৈতিক ক্ষমতার কাঠামোতে কি ধরনের পরিবর্তন ঘটিয়েছে। তবেই আমরা এই শ্রেণিটার বিরুদ্ধে ব্যপক কৃষক জনগণকে জাগিয়ে তোলার জন্য সঠিক শ্লোগান হাজির করতে পারব এবং তাদের শাসন ও দমনের নির্দিষ্ট রূপটাকে ধরতে পারব এবং সেইমতো সংগ্রামের সঠিক কৌশল নিতে পারব।

টাকাকড়ির প্রচলন, পণ্য বিনিময় বা বাজারের বিকাশ থেকে আমরা সিদ্ধান্ত টানতে পারি না যে, সামন্তবাদ খতম হয়ে গেছে এবং পুঁজিবাদের অবাধ বিকাশ ঘটছে। আমাদের দেখতে হবে যে, যাঁরা সরাসরি উৎপাদন করছেন তাঁদের উৎপাদন করার খরচ খরচা এবং নিজেদের বেঁচে থাকার খরচ বাদ দেবার পর যে উদ্বৃত্ত থাকে সেটাকে শাসকশ্রেণি কিভাবে নিংড়ে নিচ্ছে। অর্থাৎ, উদ্বৃত্ত নিংড়ানো হচ্ছে কোন পদ্ধতিতে – ক্ষমতার জোরে নাকি অর্থনৈতিক উপায়ে। এই মাপকাঠিতেই আমাদের বিচার করতে হবে আমাদের রাজ্যের কৃষি অর্থনীতির চরিত্রটা কি। (অর্থনৈতিক শোষণ পুঁজিবাদের বৈশিষ্ট্য। পুঁজিপতি স্বাধীন শ্রমিকদের সাথে মজুরি চুক্তি করে। শ্রমিকদের মজুরি হলো তার শ্রমশক্তির দাম। শ্রমশক্তির দাম হলো একজন শ্রমিকের বেঁচে থাকা এবং তার পরিবারকে বাঁচিয়ে রাখার (যাতে একজন নতুন শ্রমিক তৈরি হতে পারে) খরচ। অন্যান্য পণ্যের মূল্য যেমন উৎপাদন ব্যয় দিয়ে ঠিক হয় তেমনি শ্রমশক্তির মূল্য হলো শ্রমশক্তির উৎপাদন ও পুনরুৎপাদন ব্যয়। অর্থাৎ এখানে সমান মূল্যের বিনিময় হচ্ছে। কেউ কাউকে ঠকাচ্ছে না। কিন্তু, ধরা যাক শ্রমিক উৎপাদনের ক্ষেত্রে আট ঘন্টা কাজ করছেন। এর মধ্যে তিনি যা উৎপাদন করছেন তার মধ্যে ধরা যাক তিন ঘন্টায় তিনি যা উৎপাদন করছেন তাতে তাঁর মজুরির খরচা উঠে যাচ্ছে। বাকি পাঁচ ঘন্টায় যে মাল উৎপাদন হচ্ছে সেটা পুঁজিপতির হাতে থাকছে। এটাই তার লাভ বা উদ্বৃত্ত মূল্য। তাই বিনিময়ের ক্ষেত্রে পুঁজিপতি শ্রমিকদের শ্রমশক্তির ঠিকঠাক দাম দিয়েও উৎপাদন প্রক্রিয়ায় শ্রমিককে কাজে লাগিয়ে উদ্বৃত্ত মূল্য বার করে নেওয়া সম্ভব। তবে পুজিঁবাদী ব্যবস্থায় মজুরি ঠিক করার ক্ষেত্রে রাজনীতির ভূমিকা থাকে। তবে সেই আলোচনা এখানে করা সম্ভব নয়। পুঁজিপতিরা চেষ্টা করে কম খরচে বেশি উৎপাদন করে বেশি লাভ করতে। সেজন্য তারা উৎপাদন পদ্ধতির উন্নতি ঘটানোর চেষ্টা করে। এককথায় কোন গাজোয়ারি না করেও একটা অর্থনৈতিক প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে পুঁজিপতির পক্ষে লাভ করা সম্ভব। তাই এই শোষণের পদ্ধতি প্রধানত অর্থনৈতিক। কিন্তু, সামন্তবাদের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা অন্যরকম। জমিদার-জোতদাররা উৎপাদন প্রক্রিয়া নিয়ে মাথা ঘামায় না। কৃষকরা উৎপাদন করে, কিন্তু সামন্তবাদীরা রাজনৈতিক, সামাজিক ক্ষমতার জোরে কৃষকদের থেকে যত বেশি পারে খাজনা আদায় করে। এটাকেই আমরা বলছি অর্থনীতি বর্হিভূত উপায়ে (অর্থাৎ ক্ষমতার জোরে) কৃষকদের থেকে উদ্বৃত্ত নিংড়ে নেওয়া। তবে অর্থনীতি বর্হিভূত শোষণ সব সময় গাজোয়ারির রূপেই হবে এমন কোন কথা নেই। যেমন, জোতদাররা যখন মজুর খাটিয়ে চাষ করছে তখন ওপর ওপর দেখলে মনে হবে এখানে পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক উপায়ে শোষণ চলছে। কিন্তু, আমরা আমাদের আলোচনায় দেখেছি যে জোতদাররা বিভিন্ন রকম অর্থনীতি বহির্ভূত পদ্ধতিকে ব্যবহার করে কৃষকদের কম মজুরিতে কাজ করাচ্ছে। এটাও আসলে অর্থনীতি বর্হিভূত শোষণ। কৃষকদের কাছে কোন উদ্বৃত্ত না থাকায় তাঁরাও উৎপাদন পদ্ধতির কোন উন্নতি করতে পারেন না। ফলে কৃষির উন্নতি আটকে যায়। তাই কৃষকদের হাত থেকে উদ্বৃত্ত বেরিয়ে যাওয়া আটকাতে দরকার জমিদার/জোতদার শ্রেণিকে উচ্ছেদ করে জমি চাষীদের মধ্যে বিলিয়ে দেওয়া। আর এই কাজটা নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব ছাড়া হবে না।) কংগ্রেস আমলে বড় জোতদাররা জমির একচেটিয়া মালিকানার জোরে এই উদ্বৃত্তকে নিংড়ে নিত। অর্থাৎ, লেঠেল দিয়ে ক্ষমতার জোরে কৃষকদের থেকে খাজনা আদায় করত। পাশাপাশি, তারা কৃষকদের শোষণ করার জন্য জাতপাত প্রথাকে ব্যবহার করত। উঁচুজাতের লোকেরা (প্রধানত ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্য জাতের লোকরা) ছিল মূলত জমির মালিক। দলিতরা যেমন – বাগদি, বাউরি, ডোম, রুইদাস, নমশুদ্রা ছিলেন ভূমিহীন কৃষক। জাতপাত প্রথাকে ব্যবহার করে এঁদের জমির মালিকানা থেকে বঞ্চিত করে রাখা হয়েছিল এবং সামান্য মজুরী দিয়ে এঁদের জোতদারের জমিতে খাটতে বাধ্য করা হত। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই টাকায় মজুরী দেওয়া হত না, ধান-চাল বা আধপেট খাবার দিয়ে অমানুষিক খাটান হত। সেজন্য নকশালপন্থী আন্দোলনে দলিতরাই ছিলেন সবচেয়ে সংগ্রামী শক্তি।

সি পি এম ক্ষমতায় আসার পর পরিস্থিতির কিছু পরিবর্তন ঘটে। ষাট ও সত্তরের দশকের বিরাট লড়াইয়ের ফলে পুরোনো ধরনের বড় জোতদাররা অনেকটাই দুর্বল হয়ে গেলেও আশির দশক থেকে সি পি এমের মদতে গ্রামাঞ্চলে সাম্রাজ্যবাদ নির্দেশিত সবুজ বিপ্লবের কর্মসূচী লাগু করা শুরু হয়। এর মধ্যে দিয়ে পুরোনো ধরনের সামন্তবাদকে রূপান্তরিত করার একটা প্রক্রিয়া শুরু হয় এবং এক নতুন ধরনের পুঁজিবাদের বিকাশের প্রক্রিয়া জোরদার হয় (অর্থাৎ কৃষি ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদের অনুপ্রবেশ আরও গভীরতর হয়)। আধা সামন্তবাদকে রূপান্তরিত করার এই প্রক্রিয়ার মধ্যেকার ভেঙে ফেলা এবং টিকিয়ে রাখার দ্বন্দ্বের বিকাশের মধ্যে দিয়ে গ্রামাঞ্চলে একটা নয়া জোতদার শ্রেণি গড়ে ওঠে (তার মানে এই নয় যে, পুরোনো জোতদাররা শেষ হয়ে যায়। তারা নিজেদেরকে নতুন পরিস্থিতির সাথে

খাপ খাইয়ে বদলে নেয়। নয়া জোতদারের অর্থ এরা শোষণের নতুন নতুন ধরনকে ব্যবহার করে। নয়া জোতদারদের মধ্যে পড়ে এলাকার পার্টি বস, সমবায়ের মাথা, পঞ্চায়েতের কর্মকর্তা, সামাজিক-ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান গুলির মাথা এবং অবশ্যই যে সব পুরোনো জোতদাররা এখনও টিঁকে আছে। সাধারণভাবে বললে, সেই সব লোকরা যারা গ্রামের রাজনৈতিক ক্ষমতার কাঠামোর শীর্ষে বসে আছে এবং নতুন নতুন রূপ ও পদ্ধতিকে ব্যবহার করে শোষণ চালাচ্ছে। জাতি-বর্ণগত দিক থেকে দেখলে উচ্চবর্ণের পাশাপাশি ও বি সি এবং এগিয়ে থাকা দলিতদের মধ্যে থেকে এরা এসেছে)। এরা পুরোনো জোতদারদের মত বিরাট বিরাট জমিদারির মালিক নয়। গ্রামাঞ্চলের এই নয়া শাসকদের শ্রেণি চরিত্র এবং শাসনের ধরনটাকে নির্ধারণ করাটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। নয়া জোতদারদের সাথে সাম্রাজ্যবাদ ও রাষ্ট্রের সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে উদ্বৃত্ত নিংড়ানোর এবং উদ্বৃত্ত ব্যবহারের প্রশ্নটাকে বিবেচনা করতে হবে। তাদের শাসনের ধরনটাকে নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে উদ্বৃত্ত নিংড়ানোর ধরনটাই হল চাবিকাঠি। কিন্তু, নয়া জোতদারদের শোষণের উৎস ও ধরন বহুমুখী, ফলে শাসনের ধরনটাও জটিল ও সর্বগ্রাসী। সেজন্য শোষণের ধরন এবং শাসনের রূপটাকে আমাদের একে অপরের সাথে সম্পর্কিতভাবে বুঝতে হবে। তবেই আমরা আঞ্চলিক রাজনৈতিক ক্ষমতার কাঠামোটাকে বুঝতে পারব।

১. ভাগচাষ ঃ পুরোনো জোতদারদের মত এরা বিরাট বিরাট জমিদারির মালিক না হলেও এখনও গ্রামের বেশির ভাগ জমিই এদের হাতে আছে। সরকারি তথ্য বলছে, গ্রামের শতকরা মাত্র চারটে পরিবার মোট চাষের জমির তিনভাগের একভাগের মালিক। এরা পুরোনো জোতদারদের মতই জমিতে কোন শ্রম না দিয়েই কৃষকদের থেকে ফসলের ভাগ নেয়। এরাজ্যের কমবেশী ১০ থেকে ১৬ ভাগ জমিতে ভাগচাষ হয়। ভাগচাষীরা মূলত গরিব ও ভূমিহীন চাষী। পশ্চিমবাংলার কিছু কিছু এলাকাতে ভাগচাষীরা এখন ফসলের ভাগের বদলে মালিকের সাথে টাকার চুক্তি করছেন। এর ফলে অনেক বামপন্থী বুদ্ধিজীবী বলছেন যে, পুরোনো সামন্ততান্ত্রিক ভাগচাষ প্রথার জায়গায় জমি ভাড়া নিয়ে চাষ করার পুঁজিবাদী পদ্ধতি বিকশিত হচ্ছে। এঁরা বিষয়টার ওপর ওপর দেখেই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলছেন, অন্তর্বস্তুকে দেখছেন না। জোতদার ভাগচাষীর থেকে ফসলে বা টাকায় যেভাবেই খাজনা নিক না কেন ফসলের কতটা ভাগ মালিক পাবে বা চাষী কত টাকা মালিককে দিতে বাধ্য থাকবে সেটা নির্ভর করে ভাগচাষীদের সামাজিক, আর্থিক ও রাজনৈতিক শক্তির উপর। লড়াই করে ভাগচাষীরা তাঁদের ভাগ আগের থেকে বাড়াতে পেরেছেন। কিন্তু, এরাজ্যের ভাগচাষীরা মূলত গরিব কৃষক এবং মালিকরা জমির একচেটিয়া মালিকানার জোরে তাঁদের থেকে উদ্বৃত্ত কেড়ে নিচ্ছে। কৃষকদের হাতে কোন উদ্বৃত্ত না থাকায় তাঁরা চাষের কোন উন্নতি করতে পারছেন না। মালিককে ভাগ দেবার পর সামান্য (চাষের খরচ প্রচন্ডভাবে বেড়ে যাওয়া এবং ফসলের দাম না পাওয়ার ব্যাপারটাকে মাথায় রাখলে সত্যিই সামান্য) যা কিছু পড়ে থাকে তাই দিয়ে তাঁরা কোনমতে বেঁচে থাকেন। আর ধনী চাষীরা গরিব চাষীদের থেকে জমি ভাড়ায় নিয়ে বড় আকারে পুঁজিবাদী চাষ করার ঘটনা (উল্টো বর্গা) এরাজ্যে খুবই সামান্য। সুতরাং, এ কথা বলাই যায় যে, ভাগচাষ প্রথা রূপের দিক থেকে পুঁজিবাদী হলেও অন্তর্বস্তুতে সামন্তবাদী। ভাগচাষ প্রথাকে পুঁজিবাদী বলে চালানোর আসল কারণ হলো জমিদারদের জমি দখল করে ভাগচাষীদের মধ্যে বিলি করার প্রশ্নটাকে ধামাচাপা দেবার বদমাইশী উদ্দেশ্য। এই ব্যাপারটাকে ভূমি সংস্কার কর্মসূচীর বাইরে ফেলার উদ্দেশ্য। সেজন্য সি পি এম ৩৪ বছরে ভাগচাষীদের জমির মালিকানা দেয়নি এবং তৃণমূলও এ ব্যাপারে একেবারেই নিশ্চুপ। কিন্তু, ষাট ও সত্তরের দশকে ভাগচাষীরা লড়াই করে জোতদারদের থেকে বহু জমি দখল করে নিয়েছিলেন। অনেক জায়গাতে মালিকরা ভয়ে কৃষকদের জমির একটা অংশ ছেড়ে দেয়। এজন্য পরবর্তীকালে মালিকরা ভাগচাষের বদলে ক্ষেতমজুর লাগিয়ে চাষ করার পদ্ধতি চালু করে।

২. মজুরী প্রথা ঃ মজুর লাগিয়ে চাষ করার পদ্ধতির মধ্যেও পরিবর্তন ঘটেছে। আগেও মালিকরা মজুর লাগিয়ে চাষ করত। কিন্তু, ষাট ও সত্তরের দশকে মজুররা ছিলেন মালিকের কাছে বাঁধা দাসের মত। সামান্য কিছু ধান-চাল বা খাবারের বিনিময়ে তাঁরা বাধ্য থাকতেন জোতদারের জমিতে ও বাড়িতে দিন রাত কাজ করতে (যেমন, বাঁধা বা মাহিন্দরি প্রথা)। এখন অবস্থাটার বদল ঘটেছে। দীর্ঘ শ্রেণি সংগ্রামের ফলে বাঁধা দাস প্রথার অনেকটা বিলোপ ঘটেছে। এখন ক্ষেতমজুররা নির্দিষ্ট মজুরির বিনিময়ে দৈনিক ভিত্তিতে কাজ করেন। এই ঘটনাটাকে দেখে অনেক বামপন্থী বুদ্ধিজীবী সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন যে, মালিকরা এখন স্বাধীন মজুর খাটিয়ে পুঁজিবাদী পদ্ধতিতে চাষ করছে। স্বাধীন মজুর মানে দু দিক থেকে স্বাধীন - নিজের শ্রম বিক্রি করার ক্ষেত্রে স্বাধীন এবং সমস্ত উৎপাদনের উপকরণের মালিকানা থেকে স্বাধীন। আমাদের দেখতে হবে যে, সত্যিই কি আজকের ক্ষেতমজুররা দুদিক থেকেই স্বাধীন। এরাজ্যের গ্রামাঞ্চলে ক্ষেতমজুরের সংখ্যা ৯০ লক্ষের বেশি। দিন দিন এই সংখ্যাটা বাড়ছে। জনগণনার রিপোর্ট বলছে ১৯৯১ সালে কৃষকদের মধ্যে ৪৬ ভাগ জনগণ ছিলেন ক্ষেতমজুর। সেখানে ২০০১ সালে সংখ্যাটা বেড়ে হয়েছে ৫৭ ভাগ। এই বিপুল ক্ষেতমজুর জনগণকে কাজ দেবার মতো শিল্পের বিকাশ আমাদের রাজ্যে হয় নি। ফলে এই বিপুল জনগণ গ্রামে থেকেই খুবই কম মজুরিতে চাষের কাজ করতে বাধ্য হন। ভারত সরকারের ২০০৫-০৬ রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে যে, সারা ভারতে যেখানে ক্ষেতমজুরদের মজুরি বেড়েছে সেখানে এরাজ্যে মজুরি কমছে। চাষে মজুরি এতই কম যে, এ রাজ্যের গ্রামগুলির অধিকাংশ গরিব পরিবার থেকে একজন বা দুজনকে অন্য জেলায় বা রাজ্যে কাজে যেতে হয়। যেমন, বীরভূম জেলা থেকে গরিব পরিবারগুলি চাষের মরশুমে বর্ধমানের উন্নত চাষের এলাকাতে চলে যান অথবা বর্ধমানের শিল্পাঞ্চলে বিভিন্ন ধরনের কাজে যেতে বাধ্য হন। এছাড়াও বেআইনি কয়লা বিক্রি, পোস্ত চাষ, ইটভাঁটাগুলিতে কাজ প্রভৃতি অন্যান্য কাজে তাঁদের করতে হয়। মুর্শিদাবাদের রাজমিস্ত্রীরা কাজের জন্য সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়েন। পশ্চিমবাংলার গ্রাম থেকে দলে দলে মানুষ মহারাষ্ট্র, তামিলনাড়ু, কর্ণাটক, কেরালা, গুজরাট প্রভৃতি রাজ্যে কাজে যাচ্ছেন। গ্রামগুলি প্রায় যুবক শূন্য হয়ে গেছে (পরিকল্পনা কমিশনের ২০০৮ সালের রিপোর্ট বলছে গ্রামের যুবকদের মধ্যে শতকরা ২৭ জন বেকার)। একথা বলাই যায় যে, কৃষি ক্ষেত্রে মজুররা তাঁদের শ্রমশক্তির দামের নিচে কাজ করছেন। এটা ঠিক যে আগের চেয়ে ক্ষেতমজুরদের মজুরি বেড়েছে। কিন্তু, ২০০৪-০৫ সালের কেন্দ্র সরকারের রিপোর্ট বলছে এরাজ্যের ৯৪.৫ শতাংশ ক্ষেতমজুর কেন্দ্র সরকার নির্ধারিত নূন্যতম মজুরির চেয়ে কম মজুরিতে কাজ করেন। তাই এ কথা বলাই যায় যে, ক্ষেতমজুররা এখন এক একজন জোতদারের বাঁধা দাস হিসাবে না থাকলেও তাঁরা সমগ্র কৃষিক্ষেত্রের সাথে বাঁধা দাসের মত অবস্থায় রয়েছেন। সংসার চালানোর জন্য তাঁদের পরিবারের কয়েকজন সস্তা শ্রমিক হিসাবে আমলাতান্ত্রিক পুঁজিবাদী শিল্পক্ষেত্রে কাজে যেতে বাধ্য হচ্ছেন। অর্থাৎ, আধা সামন্তবাদী কৃষি ক্ষেত্র এবং আমলাতান্ত্রিক পুঁজিবাদী শিল্পক্ষেত্র একে অপরকে টিঁকিয়ে রেখেছে এবং শক্তিশালী করছে। আধা সামন্ততান্ত্রিক কৃষি ক্ষেত্র ছাড়া সাম্রাজ্যবাদ ও তার দালাল পুঁজিপতিদের পক্ষে সস্তা শ্রমিক শোষণ করা সম্ভব হত না। সাম্রাজ্যবাদ নির্দেশিত আমলাতান্ত্রিক পুঁজিবাদের সীমিত বিকাশের বদলে যদি স্বাধীন পুঁজিবাদের অবাধ বিকাশ হতো তাহলে নয়া জোতদারদের পক্ষেও সম্ভব হতো না ক্ষেতমজুরদের কম মজুরিতে খাটানো (প্রতিযোগিতার মধ্যে দিয়ে কৃষি ও শিল্প ক্ষেত্রের মজুরি কাছাকাছি এসে যেত)। কম মজুরি এবং কাজ পাওয়ার অনিশ্চয়তার (বছরে কৃষিতে মাত্র ১১২ দিন কাজ পাওয়া যায়) জন্য ক্ষেতমজুররা বাধ্য হন জোতদারদের সাথে বিভিন্নি রকম অর্থনীতি বহির্ভূত চুক্তি করতে (যেমন, চাষের মরশুমে কম মজুরিতে কাজ করার শর্তে দাদন নেওয়া, কম মজুরিতে কাজ করার শর্তে ঋণ পাওয়া প্রভৃতি)। এস ইউ সির মতো যাঁরা মনে করেন যে, বছরের পর বছর ক্ষেতমজুরের সংখ্যাবৃদ্ধি সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন সম্পর্কের স্বাধীন পুঁজিবাদী সম্পর্কে রূপান্তরিত হওয়ার স্পষ্ট ইঙ্গিত তাঁরা এটা দেখতে ব্যর্থ হন যে মজুর খাটানোর পুঁজিবাদী রূপের আড়ালে সামন্ততান্ত্রিক সম্পর্কগুলি কাজ করে চলেছে।

৩. জাতপাত প্রথা ঃ ভূমিহীন কৃষকদের একটা বড় অংশই হলো দলিতরা। ব্রাহ্মণ্যবাদ যুগ যুগ ধরে দলিতদের সম্পত্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে। আজও একই পরিস্থিতি চলছে। বাংলার ১ কোটি ৮০ লক্ষ দলিতদের অধিকাংশই ভূমিহীন কৃষক। যেমন, বাউরিদের মধ্যে ৫৫ ভাগ মানুষ ক্ষেতমজুর। বাগদীদের ৫৪ ভাগ

ও মালদের ৬৪ ভাগ ক্ষেতমজুর। ষাট ও সত্তরের দশকের লড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে দলিতরা কিছু কিছু জমি দখল করেছিলেন। যদিও তার বেশিরভাগটাই চাষের খরচা চালাতে না পেরে অথবা সংসার চালাতে গিয়ে তাঁরা বেচে দিতে বাধ্য হয়েছেন। অনেক ক্ষেত্রেই সি পি এম নেতারা জমির পাট্টা আটকে রেখে দলিতদের নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করেছে (বিশেষ করে ও বি সি সম্প্রদায়ের ছোট কৃষকদের বিরুদ্ধে দলিতদের কাজে লাগানো হয়েছে এবং এভাবে জাতিগত অবিশ্বাস তৈরি করে শ্রেণি ঐক্যকে ভাঙা হয়েছে)। এই বিপুল দলিত জনগণ গ্রামের সস্তা শ্রমিক হিসাবে কাজ করেন। শহরের শিল্প ও সেবা ক্ষেত্রের সবচেয়ে নোংরা ও বিপদের কাজগুলি করার জন্য অসংগঠিত শ্রমিক হিসাবে এঁরাই কাজ করেন। অনেক বুদ্ধিজীবী, শাসকশ্রেণির প্রচার মাধ্যম, ভোটবাজ পার্টির নেতারা প্রচার করে যে, ভূমি সংস্কার হয়ে গেছে, আজকে জমি দখল করা মানে অন্যায়ভাবে অন্যের সম্পত্তি দখল করা। এভাবে দলিতদের জমির অধিকার থেকে চিরকালের জন্য বঞ্চিত করার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। কিছু কিছু এগিয়ে থাকা দলিত জাতি, যেমন নমশূদ্র, পোন্ড্রক্ষত্রিয়, রুইদাস প্রভৃতিদের মধ্যে থেকে একটা ধনী অংশ তৈরি হয়েছে। বিশেষ করে ভোটবাজ পার্টির নেতাগিরি, ব্যবসা, সরকারী চাকরি প্রভৃতির মধ্যে দিয়ে এরা প্রচুর সম্পদশালী হয়ে উঠেছে এবং নয়া জোতদার শ্রেণিতে পরিণত হয়েছে। এই ঘটনাটা আমাদের দেখিয়ে দেয় যে, জোতদারদের বিরুদ্ধে যাঁরা সংগ্রাম করেছিলেন তাঁদের মধ্যে থেকে সাম্রাজ্যবাদ ও রাষ্ট্র কিভাবে একটা অংশকে তুলে নিয়ে এসে নতুন শাসক শ্রেণিতে পরিণত করে।

৪. গরিব কৃষকদের শোষণ ঃ এরাজ্যের গ্রামের বিপুল জনগণ গরিব চাষী। গ্রামের মোট পরিবারের ৭৮ ভাগ হলো গরিব ও ভূমিহীন কৃষক। এঁদের সংখ্যাও দিন দিন বাড়ছে। গ্রামের নয়া জোতদার শ্রেণি এঁদেরকে বিভিন্নভাবে শোষণ করে। নয়া জোতদাররা পাম্প সেট, ট্রাকটার, পাওয়ার টিলার ভাড়া দিয়ে এবং সার, বীজ, কীটনাশক ধার দিয়ে গরিব কৃষকদের সাথে ফসল কমে দামে কিনে নেবার চুক্তি করে। চাষের খরচ দিন দিন বাড়ার ফলে গরিব চাষীরা বাধ্য হন এই ধরনের চুক্তি করতে। এটা করতে তাঁরা বাধ্য হন কারণ এলাকার ধান-চাল ও কৃষিজ ফসলের পাইকারি ব্যবসা নয়া জোতদাররা নিয়ন্ত্রণ করে। এদের বাদ দিয়ে গরিব কৃষকের পক্ষে সম্ভব হয় না ফসল মজুত করে পরে বেশি দামে বিক্রি করা। কারণ নয়া জোতদাররা তাদের রাজনৈতিক ক্ষমতার জোরে (পঞ্চায়েত ও প্রশাসনের সাথে যোগাযোগ এবং এরাই ভোটবাজ পার্টির নেতা অথবা পার্টিগুলিকে পয়সা দিয়ে কিনে রেখেছে) হিমঘরগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করে। আলুর বন্ডের উপর এদের নিয়ন্ত্রণ এর সবচেয়ে বড় উদাহরণ। " বর্ষার জলে ভিজে বা রোদে পুড়ে যারা আলু চাষ করেন তাঁরা লাভের মুখ দেখতে পান না, উল্টে... তাঁরা ক্রমশ বেশি বেশি করে ঋণের জালে জড়িয়ে পড়ছেন।... আলুর ব্যবসা পুরোপুরি হিমঘর মালিক এবং মহাজনদের একাংশের কব্জায় চলে গেছে। তারাই আলুর দাম নিয়ন্ত্রণ করে, প্রয়োজনের সময় তারা কৃত্রিম অভাব তৈরি করতেও সক্ষম। তারা এমনকি সার নিয়েও জুয়া খেলে।... সারের কৃত্রিম সংকট তৈরি করে চাষীদের ওপর এমন শর্ত চাপিয়ে দেয় যে, যদি কোন চাষী দু বস্তা ইফকো সার কেনে তবেই তাকে এক বস্তা আলু বীজ দেওয়া হবে। ... একজন প্রন্তিক চাষী কোথায় পাবেন এতো পুঁজি। সমবায় ব্যাংকের ভূমিকা অতি নগণ্য। সুদখোরী কারবার তাই অবাধে বেড়ে চলে। এক্ষেত্রে হিসাব কেমন হয়? তোমার যতো দরকার ধার নাও ও চাষ করো, কিন্তু ফসলের ৭৫ থেকে ৮০ শতাংশ মহাজনকে (তার শর্তে) বেচতে হবে। ফসল কম হলে দাদন পরের বছরের জন্য থেকে যাবে। এভাবে দাদনের পরিমাণ বাড়তে থাকবে। এবং এক সময় মহাজন টিপ ছাপ দিইয়ে চাষীর জমি আত্মসাৎ করবে। আলু চাষীদের বাঁচানোর জন্য সরকার অনেক হইচই করে বন্ড ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। এই বন্ড কাদের করায়ত্ত তা কি কেউ খোঁজ নিয়ে দেখেছে? আলু চাষে লাভ অবশ্যই আছে। এই লাভের ২০ শতাংশ ধনী কৃষকদের কাছে যাচ্ছে, ৪০ শতাংশ যাচ্ছে মহাজনদের কাছে আর বাকি ৪০ শতাংশ যাচ্ছে হিমঘর মালিকদের কাছে। স্থান বিশেষে এর সামান্য কম বেশি হতে পারে..." (সংবাদ প্রতিদিন, জয়ন্ত সিংহের প্রতিবেদন)। এখানে মনে রাখতে হবে এই ধনী চাষী, মহাজন, হিমঘর মালিক এরা সকলেই নয়া জোতদার শ্রেণির সদস্য এবং এরা পার্টি ও পঞ্চায়েত, প্রশাসনের সাথে যোগসাজসে গরিব চাষীদের উপর এই ধরনের অর্থনীতি বর্হিভূত শোষণ চালায়। এছাড়াও গরিব চাষীরা বছরের একটা বড় সময় ভূমিহীন কৃষকের মতই কম মজুরিতে জোতদারদের জমিতে কাজ করেন অথবা অসংগঠিত সস্তা শ্রমিক হিসাবে কাজ করতে শহরে বা অন্য রাজ্যে চলে যান। যাঁরা কৃষিতে স্বাধীন পুঁজিবাদ দেখে থাকেন তাঁরা দুটো বিষয়কে দেখতে পান না। এক, গরিব ও ভূমিহীন চাষীর সংখ্যা বেড়েই চলেছে। অর্থাৎ, কৃষিতে ছোট ছোট জোতকে একজায়গায় এনে বড় আকারে পুঁজিবাদী চাষ করার প্রবণতা অনুপস্থিত। দুই, এখনও ৭২ ভাগ কৃষি উৎপাদক নিজেদের ভরনপোষণের জন্য চাষবাস করেন, বাজারের জন্য নয়। অর্থাৎ, সাম্রাজ্যবাদের নির্দেশে এবং রাষ্ট্রের মদতে এমন এক ধরনের (আমলাতান্ত্রিক) পুঁজিবাদের জন্ম দেওয়া হয়েছে যে পুঁজিবাদ সামন্তবাদী উৎপাদন সম্পর্ককে টিঁকিয়ে রাখা ও নতুন রূপ দেবার মধ্যে দিয়ে নিজের উদ্বৃত্ত মূল্য নিস্কাশনের প্রক্রিয়ার মধ্যে অঙ্গীভূত করে নেয়।

৫. জমির উপর নিয়ন্ত্রণ ঃ যদিও নয়া জোতদাররা পুরোনো জোতদারদের মত বিরাট বিরাট জমিদারির মালিক না হলেও পার্টি, প্রশাসন, পঞ্চায়েত ও পুলিশের মদতে এরা গ্রামের অনেক বেশি পরিমাণ জমিকে নিয়ন্ত্রণ করে। গরিব কৃষকদের নিয়ন্ত্রণ করার একটা বড় উপায় হলো পার্টি অফিসে জমির পাট্টা আটকে রাখা। একজনের পাট্টা অন্যকে দেওয়া এবং এই নিয়ে কৃষকদের মধ্যে বিরোধ লাগিয়ে দিয়ে দুপক্ষ থেকেই পয়সা খাওয়া। এরকম ঘটনা এরাজ্যের গ্রামে বহু ঘটে থাকে। ফলে একটা নতুন শব্দই তৈরি হয়েছে - পাট্টাদাস। এছাড়াও, খাস জমি বিলি না করে নিজেরা হজম করে দেওয়ার ঘটনা আকছার ঘটে থাকে। নির্মল মুখার্জী ও দেবব্রত ব্যানার্জীর রিপোর্ট থেকে দেখা যাচ্ছে যে, ৮১ সালের শেষে বিলি না হওয়া খাস জমির পরিমাণ সাড়ে তিন লক্ষ একর। ৮১ থেকে ৯৩ সাল অব্দি বিলি হয় ৯৪ হাজার একর। অথচ এর মধ্যে ৮০ হাজার একর জমি উধাও হয়ে গেছে। পার্টি ও রাষ্ট্রের মদতে নয়া জোতদাররাই এই বিপুল পরিমাণ জমি চুরি করেছে। অনেক জায়গাতেই নয়া জোতদারদের নিজেদের নামে খুবই কম জমি আছে। কিন্তু, তা সত্বেও এরা বিপুল পরিমাণ জমিকে নিয়ন্ত্রণ করে। পাট্টা পাওয়া গরিব চাষীরা চাষের খরচ চালাতে না পেরে এদের কাছে জমি নামমাত্র দামে বেচে দিতে বাধ্য হয়েছেন। ফলে আমরা দেখি যে, ৪ লক্ষ কৃষক পাট্টা হারিয়েছেন এবং ১৫ শতাংশ বর্গাদার জমি হারিয়েছেন (আনন্দবাজার পত্রিকা, ৮ই নভেম্বর, ২০০৪)। এই ঘটনাগুলি দেখিয়ে দেয় যে, পার্টি, পঞ্চায়েত, প্রশাসন ও পুলিশের জালটাকে এমনভাবে গড়ে তোলা হয়েছে যাতে গরিব কৃষকদের নিয়ন্ত্রণ করা যায় এবং অর্থনীতি বহির্ভূত উপায়ে উদ্বৃত্ত নিংড়ে নেওয়া যায়।

৬. মহাজনি প্রথা ঃ কৃষকদের শোষণ করার একটা অন্যতম উপায় হিসাবে মহাজনি প্রথা আজও রমরমিয়ে চলছে। তবে আশির দশক থেকে মহাজনি শোষণের রূপ বদলেছে। সি পি এম আমলে গ্রামে গ্রামে বহু ঋণ সমবায় সমিতি গড়ে তোলা হয়েছে। প্রতিটি সমবায় সমিতিতে পরিচালন কমিটিগুলি সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশই হলো এই নয়া জোতদাররা। একটি তদন্ত রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, গ্রামের ধনী অংশটা মোট সমবায় ঋণের ৪৫ ভাগ নিচ্ছে, যারা গ্রামের জনগণের মাত্র ১১ ভাগ। গরিবরা যে ঋণ নিচ্ছেন তার বেশির ভাগটাই শোধ দিতে না পারার জন্য ব্যাংক বা সমবায় সমিতি থেকে আর ধার পাচ্ছেন না। ফলে গরিবদের মোট ঋণের ৬১ ভাগই হলো মহাজনদের কাছ থেকে নেওয়া। এমনকি সমবায় সমিতির মাথায় বসে থাকা কর্মকর্তারা নিজের প্রভাব খাটিয়ে সমবায় থেকে ঋণ নিয়ে অথবা ব্যাংকের লোকদের সাথে সাঁটগাঁট করে ব্যাংক থেকে ধার নিয়ে মহাজনী ব্যবসা খুলে বসেছে। (দি রেসাল্ট অফ ল্যান্ড রিফর্ম ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল - এ ফিল্ড সার্ভে রিপোর্ট। কার্তিক পাল)। ফসল উঠলে তা বাজার দরের চেয়ে কম দামে বেচতে হবে এই শর্তে গরিব কৃষকদের ঋণ দেওয়ার প্রথা অবাধে চলছে। কৃষকরা চাষের খরচ চালানোর জন্য এই নয়া জোতদারদের থেকে মোটা সুদে টাকা ধার করতে বাধ্য হয়। এভাবে মহাজনি করে নয়া জোতদাররা মোটা টাকা কামাই করে। আবার এদের ধার শোধ করার

জন্য কৃষকরা বাধ্য হয় ফসল ওঠার সাথে সাথে এদের কাছেই কম দামে অভাবী বিক্রি করতে। এভাবে দালাল-ফড়ে গিরি করে মাঝখান থেকে মোটা টাকা কামাই হয়।

৭. সমবায় ঃ সি পি এম ক্ষমতায় আসার পর ঢাকঢোল পিটিয়ে সমবায় অন্দোলন শুরু করেছিল। এই সমবায়গুলো আসলে গরিব চাষীদের অর্থনীতি বহির্ভূত উপায়ে শোষণ করার একটা অন্যতম হাতিয়ার। ঋণ সমবায়গুলিকে ব্যবহার করে নয়া জোতদাররা কিভাবে চাষীদের শোষণ করে তা আমরা আগেই বলেছি। সরকার এখন এমনকি গ্রামীণ ঋণ সমবায়গুলি থেকে সরে আসার পরিকল্পনা করছে। বৈদ্যনাথন কমিটি প্রস্তাব দিয়েছে যারা সমবায় ব্যাংক ব্যবহার করে তারাই কেবলমাত্র সমবায় ব্যাংকের পরিচালন সমিতিতে থাকতে পারবে, সরকারের কোন প্রতিনিধি থাকবে না। এর মানে গ্রামের প্রভাবশালী নয়া জোতদাররাই (বিশেষ করে পার্টি ও পঞ্চায়েতের মাথারা) পরিচালন সমিতিগুলি দখল করবে। এর ফলে গ্রামীণ ঋণ ব্যবস্থার উপর তাদের নিয়ন্ত্রণ আরও বাড়বে। উত্তর ২৪ পরগণার হাড়োয়া, শাসন, বেলেঘাটা প্রভৃতি অঞ্চলে সত্তর ও আশির দশকে কৃষকরা বিরাট লড়াই করে মাছের ভেড়ি গুলি থেকে বড় জমিদারদের উচ্ছেদ করে দেয়। এরপর ভেড়িগুলি পরিচলনার জন্য বহু সমবায় সমিতি গড়ে ওঠে। সি পি এমের নেতারা (এখন তৃণমূল) এই সব সমবায়ের মাথা হয়ে বসে। তারা সমবায়ের গরিব সদস্যদের সমান্য কিছু টাকা দিয়ে লাভের মোটা অংশটা নিজেরা হজম করে। এমনকি তারা পুরোনো জোতদারদের সাথে সাঁটগাঁট করে ঐ মালিকদেরই আবার ভেড়ি গুলি লিজে দেয় এবং গোপনে লাভের ভাগ নেয়। আর এই কাজের বিরুদ্ধে যাতে কেউ প্রতিবাদ করতে না পারে তার জন্য সশস্ত্র সংগঠিত গুন্ডা বাহিনী তৈরি করেছে। দুর্গের মতো বিরাট বিরাট পার্টি অফিসগুলি একদিকে পুরোনো জমিদারদের কাছারি বাড়ির মত, অন্যদিকে এলাকার লোকের এবং বাইরের লোকের কাজকর্ম ও চলাফেরার উপর নজরদারি করার জন্য পাহারাদারির চৌকি হিসাবে কাজ করে। এটা দেখিয়ে দেয় যে, এক সময়ের জমিদার বিরোধী আন্দোলনের নেতারা নিজেরাই কিভাবে নয়া জোতদার শ্রেণিতে রূপান্তরিত হয়েছে।

৮. সাম্রাজ্যবাদের এজেন্ট ঃ সাম্রাজ্যবাদী ও দেশি দালাল বুর্জোয়ারা কৃষি ক্ষেত্রে উৎপাদিত পণ্য কম দামে কেনে এবং শিল্পজাত পণ্য বেশি দামে বিক্রি করে। এভাবে দামের কাঁচি চালিয়ে তারা কৃষি ক্ষেত্রকে শোষণ করে। এই কাজে তাদের আঞ্চলিক এজেন্ট হিসাবে কাজ করে নয়া জোতদার শ্রেণি। গ্রামাঞ্চলের পণ্য চলাচলের গোটা প্রক্রিয়াটাকে নিয়ন্ত্রণ করে এই নয়া জোতদার শ্রেণি। আশির দশক থেকে সবুজ বিপ্লবের প্রক্রিয়া এরাজ্যে কৃষিক্ষেত্রে চালু হবার পর থেকে সাম্রাজ্যবাদী ও তার দালাল দেশি বড় পুঁজিপতিদের হাইব্রিড বীজ, সার, কীটনাশক, আগাছানাশক, ট্রাকটার, পাওয়ার টিলার প্রভৃতি চাষের উপকরণ বিক্রি বেশ কয়েকগুণ বেড়ে যায়। দেশি-বিদেশি বড় বড় কোম্পানির ডিলার-ডিস্ট্রিবিউটার হিসাবে গ্রামে সার-বীজ-কীটনাশক-চাষের যন্ত্রপাতি বিক্রি করে এরা মাঝখান থেকে মোটা লাভ করে। এরা চাষের এইসব উপকরণ ধারে দিয়ে চাষীদের বাধ্য করে ফসল ওঠার পর তাদের কাছেই কম দামে বেচতে। চাষীদের থেকে কম দামে কিনে এর কৃষিজাত পণ্য শিল্পক্ষেত্রকে বিক্রি করে। শিল্পপতিরাও কম দামে কাঁচামাল পাওয়ার জন্য এদের উপর নির্ভর করে। পাট চাষ এর একটা সবচেয়ে বড় উদাহরণ। চটকল মালিকদের সাথে সাঁটগাঁট করে এই সব দালালরা চাষীদের কাছ থেকে কমদামে পাট কেনে। মালিকরাও পাটের অভাব দেখিয়ে পাট ওঠার আগে আগে কারখানা লক আউট করে শ্রমিকদের চাপে ফেলে মজুরি বৃদ্ধি আটকে দেয়। আর চটকল বন্ধ (পাটের চাহিদা নেই)দেখিয়ে দালালরা কৃষকদের বাধ্য করে কম দামে পাট বেচতে। শুধুমাত্র চাষের উপকরণ এবং উৎপাদিত ফসলের ব্যবসাই নয়, কৃষকদের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষের ব্যবসাও মূলত এদের নিয়ন্ত্রণে। গঞ্জের বাজারগুলির ব্যবসা ও ব্যবসায়ী সমিতিকে মূলত এরা নিয়ন্ত্রণ করে। সাধারণভাবে বলা যায় যে, সাম্রাজ্যবাদ ও তার দালাল পুঁজিপতিদের উৎপাদিত মাল বিক্রি এবং তাদের শিল্পের জন্য কমদামে কাঁচামালের জন্য তারা নয়া জোতদারদের উপর নির্ভর করে। এখানেও পুঁজিবাদী পণ্য সঞ্চালনের মধ্যে সামন্ততান্ত্রিক সম্পর্কগুলি কাজ করে চলেছে। এটা আরও প্রমাণ করে যে, কেবলমাত্র পণ্য সঞ্চালনের বিকাশ নিজে থেকেই স্বাধীন পুঁজিবাদের জন্ম দেয় না। তার জন্য প্রয়োজন সাম্রাজ্যবাদী ও সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন সম্পর্ককে ভেঙে ফেলা যাতে দুই অর্থে স্বাধীন শ্রমিকের সৃষ্টি হয়। যারা পণ্য সঞ্চালনের লম্বা তালিকা তৈরি করে প্রমাণ করেন যে কৃষিতে স্বাধীন পুঁজিবাদ এসে গেছে তাঁরা এই বিষয়গুলিকে বিচার করেন না। ফলে তাঁরা কৃষিতে যে বিশেষ ধরনের (আমলাতান্ত্রিক) পুঁজিবাদ বিকশিত হচ্ছে তার আসল চরিত্রকে ধরতে পারেন না।

৯. সাম্রাজ্যবাদের নয়া পরিকল্পনা ঃ সাম্রাজ্যবাদ এদেশের কৃষিক্ষেত্রের জন্য কিছু কিছু নতুন পরিকল্পনা নিয়ে হাজির হয়েছে। প্রথমত, চুক্তিচাষের মাধ্যমে কৃষির বাণিজ্যকরণ। অর্থাৎ, কৃষকরা ধান চাষ না করে পেপসি কোম্পানির জন্য আলু, টমেটোর চাষ করবে (ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে। পেপসি কোম্পানির অধীনস্থ ফ্রিটো লে কোম্পানি গত বছর এরাজ্যের ছটি জেলায় ছড়িয়ে থাকা ১৮০০ চাষীর সাথে চুক্তি করে ১২০০০ টন আলু কিনেছে। ১৬০০ একর জমিতে এই চুক্তিচাষ হয়েছে। ফ্রিটো লে গোটা উৎপাদন প্রক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করে। তারা আগে থেকে চাষীর সাথে দামের চুক্তি করে নেয়। চাষীদের বাধ্য করা হয় কোম্পানির কাছ থেকেই সার, বীজ প্রভৃতি উৎপাদনের উপকরণ কিনতে।) প্রথম প্রথম চাষীদের লোভ দেখানোর জন্য ভালো দাম দেওয়া হবে। বেশি বেশি কৃষকরা যখন লাভের আশায় উৎপাদন করতে শুরু করবে তখন বড় বড় একচেটিয়া কোম্পানিরা নিজেদের সুবিধামত কম দাম ঠিক করবে। সরকারের পরিকল্পনা হলো পার্টি ও পঞ্চায়েতের মাতব্বর এই সমস্ত নয়া জোতদাররাই কোম্পানি ও কৃষকদের মধ্যে চুক্তির ব্যবস্থা করবে। আসলে এই শোষক নয়া জোতদাররাই বড় পুঁজির স্বার্থে কৃষকদের ভয় দেখিয়ে চুক্তিচাষে বাধ্য করার বা ভূল বুঝিয়ে, লোভ দেখিয়ে টেনে আনার দায়িত্ব নেবে। দ্বীতিয়ত, সরকার দ্বিতীয় সবুজ বিপ্লবের টার্গেট এলাকা হিসাবে বেছে নিয়েছে মূলত পূর্ব ভারতের কয়েকটি রাজ্যকে। পাঞ্জাব-হরিয়ানা-পশ্চিম উত্তরপ্রদেশের যে সমস্ত অঞ্চলে প্রথম সবুজ বিপ্লব হয়েছিল সে সব জায়গায় মাটির তলার সমস্ত জল ইতিমধ্যেই প্রায় ফুরিয়ে গেছে, জমি নোনা হয়ে গেছে। ফলে এবার বহুজাতিক সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির শকুনের চোখ পড়েছে অতি উর্বর এবং জল সম্পদে সমৃদ্ধ পূর্ব ভারতের উপর। কিন্তু, এরাজ্যের অবস্থাও ভালো নয়। আশির দশক থেকে প্রথম সবুজ বিপ্লবের যে কর্মসূচী সি পি এম চালু করেছিল তার ফলে মাটির তলার জল ব্যাপক হারে তুলে বিশাল পরিমাণ জমিতে বোরো চাষ করে আমরা ধান চাষে প্রথম হয়েছিলাম। ফল হয়েছে বিশাল এলাকাজুড়ে আর্সেনিক দূষণ, জমির উর্বরতা শক্তি নষ্ট। এখন আবার দ্বিতীয় সবুজ বিপ্লবের (জিন বিপ্লবের) কর্মসূচী নামানো হচ্ছে। উদ্দেশ্য হলো পরিবেশ ও মানুষের পক্ষে ভয়ানক ক্ষতিকর বাঁজা বীজ প্রযুক্তির ব্যবহার করে কৃষি উৎপাদন বাড়ানো এবং বিদেশে অবাধে ফসল রপ্তানি করা। এর ফলে কৃষকরা আরও বেশি বেশি করে বাধ্য হবে কারগিল, মনস্যান্টো, মাহিকোর মত দেশি-বিদেশি বড় কোম্পানির থেকে জৈব প্রযুক্তির বীজ এবং এই ধরনের বীজের উপযোগী সার, কীটনাশক, আগাছানাশক কিনতে। এখানেও এজেন্ট হিসাবে কাজ করবে নয়া জোতদাররা। কৃষিক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদের এই অনুপ্রবেশের মধ্যস্থতাকারী হিসাবে নয়া জোতদাররা থাকায় সাম্রাজ্যবাদেরও সুবিধা হবে। বড় বড় কৃষি ফার্ম গড়ে তোলার জন্য ছোট কৃষকদের উচ্ছেদ করার কাজটা এই নয়া জোতদাররা করবে। এক্ষেত্রে সাম্রজ্যবাদ, রাষ্ট্র ও নয়া জোতদারদের একটা আঁতাতকে পরিস্কারভাবে দেখা যেতে পারে। মমতা সাময়িকভাবে বাঁজা বীজ চাষ নিষিদ্ধ করলেও আগামী দিনে নতুন রূপে এগুলো আসতে চলেছে। চুক্তি চাষের পরিকল্পনা বাতিল হয় নি। খুব সম্ভবত মমতার পি পি পি মডেলের একটা রূপ হিসাবে আগামী দিনে চুক্তি চাষ চালু হতে চলেছে।

১০. জমি অধিগ্রহণ ঃ সাম্রাজ্যবাদের সাথে নয়া জোতদারদের আঁতাতের ব্যাপারটা সবচেয়ে ভালোভাবে আমরা দেখেছি সিঙ্গুর, নন্দীগ্রাম ও অন্যান্য যেসব জায়গায় সাম্রাজ্যবাদ ও তার দালাল পুঁজিপতিরা জমি দখল করার চেষ্টা করেছে বা দখল করেছে। সবার আগে জমি দিয়েছে জোতদার ও নয়া জোতদাররা এবং তাদের

হাতেই সবচেয়ে বেশি জমি থাকায় তারা লাখ লাখ টাকা কামাই করেছে। বড় বড় কোম্পানির জন্য জমি লুঠের জন্য এরা সমস্ত এলাকাতেই সমবায় ও সিন্ডিকেট এবং শক্তিশালী গুন্ডাবাহিনী তৈরি করেছে (এলাকার বেকার ছেলেদের এই কাজে লাগিয়েছে) এবং এই কাজের জন্য পুঁজিপতিদের থেকে মোটা কমিশন খেয়েছে। জমি দখলের পর আবাসন, হোটেল, শপিং মল, জুয়াখানা, অত্যাধুনিক বেশ্যা পট্টি প্রভৃতি নির্মাণ করার জন্য মাটি ফেলা, রাস্তা তৈরি, নির্মাণ সামগ্রী সরবরাহ, শ্রমিক যোগান দেবার ঠিকাদারিও পেয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই জমি অধিগ্রহণ বিরোধী আন্দোলনে জনগণকে প্রথম যে শত্রুর মোকাবিলা করতে হচ্ছে তারা হল সি পি এম আমলে তৈরি হওয়া এই নয়া জোতদার শ্রেণিটাই। এই কাজে অধিকাংশ এলাকাতেই সি পি এম-তৃণমূল জোট বেঁধে কাজ করে। এরাজ্যের রাজারহাটে সরকার-নয়া জোতদার শ্রেণির সহযোগিতায় যে মাত্রায় জমি ডাকাতি হয়েছে সে বিষয়ে দু চার কথা বলা জরুরি। সিংগুর-নন্দীগ্রাম নিয়ে যেমন হইচই হয়েছে রাজারহাট নিয়ে তা প্রায় হয় নি। অথচ রাজারহাটে নিঃশব্দে সাগরচুরি হয়ে গেছে। কিন্তু কেন ? একটু ইতিহাসের দিকে চোখ ফেরানো যাক। ১৯৯৩ সালে বামফ্রন্ট সরকার রাজারহাটে নতুন কলকাতা বানানোর সিদ্ধান্ত নেয়। ৪০টা মৌজার মধ্যে ৩৫টা ঢুকে গেল বড়লোকদের শহরের পেটে। চাষিদের কথা, বছরে সাড়ে পাঁচ লক্ষ মণ ধান উৎপাদন বন্ধ হবার কথা, শাক-সব্জি-মাছ উৎপাদন বন্ধ হবার কথা, খাদ্য সংকটের কথা কেন্দ্র-রাজ্য কোন সরকারই ভাবল না। উল্টে ৯৫ সালে নতুন শহরের উদ্বোধনের অনুষ্ঠানে প্রণব মুখার্জি, অজিত পাঁজারা সমস্বরে বামফ্রন্টের শহর পরিকল্পনার ভূয়সী প্রশংসা করে। প্রশ্ন হলো যে তৃণমূল সিংগুর-নন্দীগ্রামে সি পি এমের বিরুদ্ধে লড়ে গেল, রাজারহাটে তারা আটকে গেল কেন ? মমতা জনসভায় গুচ্ছের ফাইল নিয়ে সি পি এমের সব দুর্নীতির কাহিনী ফাঁস করার নাটক করলো অথচ ঝুলি থেকে বিড়াল বার করলো না কেন ? উত্তর একটাই ঃ রাজারহাটে নয়া জোতদারদের সি পি এম তরফ ও তৃণমূল তরফ নিজেদের মধ্যে গোপন যুদ্ধ বিরতি চুক্তি করে নিয়েছে গরিবদের রক্তশুষে মুনাফা করার স্বার্থে। রাজারহাটে গফফর- কালোবাবু- আরাবুল চক্রের কাজকর্ম থেকে সেটা পরিস্কার।

১১. জনগণের সম্পদ চুরি ঃ যেকোন পঞ্চায়েত এলাকায় ব্যায় করার জন্য বরাদ্দ সরকারি টাকার (জনগণের টাকা) খরচের ব্যাপারটা এরাই নিয়ন্ত্রণ করে। কারণ পার্টি ও পঞ্চায়েতের মাথায় এরাই বসে আছে। প্রশাসনের বিভিন্ন পদে এরাই বসে আছে। এদের প্রায় প্রতিটি পরিবার থেকে অন্তত একজন সরকারি চাকরি করে (মোটা ঘুষ দিয়ে বা যোগাযোগের মাধ্যমে এদের পক্ষেই সম্ভব সরকারি চাকরি, ইস্কুল মাস্টারি জোটানো। জাতপাতের সম্পর্ক এবং পারিবারিক যোগাযোগ এখানে একটা বড় ভূমিকা পালন করে।) বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের টাকা বা মালপত্র এরা প্রায় পুরোটাই ঝেড়ে দেয়। আমাদের দেশে দ্বিতীয় প্রজন্মের সংস্কার চালু হওয়ার পর কাজের সুযোগ বাড়িয়ে গরিবি দূর করার ঘোষিত লক্ষ্যে সরকার ১৯টা প্রকল্প অনুমোদন করে। এর মধ্যে ৪-৫টা ছাড়া বাকি গুলির নামই শোনেনি সিংহভাগ গরিব মানুষ। এই সব খাতে ভালো পরিমাণ টাকা আসছে তা গরিবদের কাছে পৌঁছানোর আগেই পার্টি কাছারিতে ঢুকে পড়ছে। কাদের নিয়ে স্বনিযুক্তি গোষ্ঠী গড়া হলে সরকারি স্বীকৃতি মিলবে তা ঠিক করে দিচ্ছে ক্ষমতাসীন পার্টি। গরিবের জব কার্ড তার নিজের হাতে থাকছে না। পঞ্চায়েত-পার্টি অফিসে জমা থাকছে। একশ দিনের কাজ না মেলায় সমঅংকের টাকা কজন ক্ষতিপূরণ পেয়েছে ? এসব খাতের মোটা টাকা পার্টি নেতাদের পকেটে ঢোকে। ইস্কুল কমিটিগুলিকে নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমেও এরা বিরাট টাকা লোটে। সি পি এম ও তৃণমূলের এত মারামারি আসলে জনগণের সম্পদের উপর নিয়ন্ত্রণকে কেন্দ্র করে নয়া জোতদারদের নিজেদের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব। এই সব পার্টির নেতারা প্রশাসনকে নির্দেশ দেয় কোন্ টাকা কাকে দেওয়া হবে বা কোন্ খাতে ব্যায় হবে। সরকারি টাকা বা ক্ষমতার উপর নিয়ন্ত্রণ শুধুমাত্র জনগণের সম্পদ শোষণ করার জন্যই নয় বরং একাজে তাদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্যও আছে। এগুলিকে ব্যবহার করে তারা জনগণের একটা অংশকে কিনে নিয়ে নিজেদের গণভিত্তিকে বাড়ানো ও গুন্ডা বাহিনী তৈরির চেষ্টা করে এবং এগুলির বিলি বন্টনকে কেন্দ্র করে জনগণের মধ্যে বিরোধ তৈরি করা ও জিইয়ে রাখার চেষ্টা করে। এদের আয়ের আর একটা বড় উৎস হলো রেশন ডিলারী। প্রশাসনের সাথে মিলে জনগণের খাবার লুঠ করে খোলা বাজারে বিক্রি করে মোটা কামাই করার এটা একটা অন্যতম উপায়। এখন পশ্চিমবাংলায় পাকা বাড়িওয়ালারা বি পি এল এবং কাঁচা বাড়িতে বসবাসকারী জনগণ এ পি এল। এই ঘটনাগুলি নয়া জোতদার শ্রেণি এবং রাষ্ট্রের আঁতাতকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়। একটা জিনিষ দিনের আলোর মত স্পষ্ট - নয়া জোতদারদের বিরুদ্ধে গ্রামের গরিবের লড়াই জনগণের এই বিপুল সম্পদ লুঠের বিরুদ্ধে লড়াইও।

১২. উদ্বৃত্তের ব্যবহার ঃ ২০০০ সালের আগে অব্দি এরাজ্যের কৃষি উৎপাদন কিছুটা বেড়েছিল। কিন্তু, এই বৃদ্ধিতে বড় জমির মালিকদের ভূমিকা খুবই কম। মূলত মাঝারি মাপের জমির মালিকরা সেচ ব্যবস্থার সুবিধা নিয়ে বোরো চাষের মাধ্যমে উৎপাদন বেশ খানিকটা বাড়াতে পেরেছিলেন (মানবেন্দু চ্যাটার্জী ও অতনু সেনগুপ্ত)। এই মাঝারি মাপের জমির মালিকরাই হলেন মূলত আমাদের রাজ্যের ধনী কৃষক। বড় জমির মালিক জোতদার বা নয়া জোতদাররা এই বৃদ্ধিতে খুব একটা ভূমিকা রাখে নি। কারণ তারা নিজেরা উৎপাদন প্রক্রিয়ায় অংশ নেয় না এবং উৎপাদনের পদ্ধতি নিয়ে তাদের খুব একটা মাথাব্যাথা নেই। সাম্রাজ্যবাদ ও রাষ্ট্রের মদতে তৈরি হওয়া গ্রামাঞ্চলের এই নয়া জোতদার শ্রেণিটার সামন্ততান্ত্রিক চরিত্র আরও স্পষ্ট হয় তাদের উদ্বৃত্ত ব্যবহারের ধরন থেকে। স্বাধীন পুঁজিবাদী কৃষক বা ধনী কৃষকরা নিজে শ্রম দিয়ে, মজুর খাটিয়ে, উন্নত কৃষি পদ্ধতিকে ব্যবহার করে কম খরচে ফসল উৎপাদন করে বেশি মুনাফা করার চেষ্টা করে। তারা এই মুনাফাকে পুনরায় চাষের কাজে লাগিয়ে বড় আকারে চাষ করে কৃষির উন্নতি ঘটায়। কিন্তু, এরাজ্যের গ্রামাঞ্চলের নয়া জোতদাররা শোষণ করে পাওয়া উদ্বৃত্তকে কৃষির উন্নতির কাজে লাগায় না। বরং এটাকে তারা মহাজনি, ইটভাটার ব্যবসা, বাস-লরির ব্যবসা, ঠিকাদারি, ছেলে-মেয়েকে বাইরের বড় ইস্কুলে পড়ানো, গ্রামে বা কাছের শহরে আধুনিক বাড়ি তৈরি, মজুতদারি, রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার (জনগণের একটা অংশকে কিনে নেওয়া, গুন্ডা পোষা, ভোটে দাঁড়ানো) প্রভৃতি কাজে লাগায়। অর্থাৎ, কৃষকদের আরও বড় আকারে অর্থনীতি বহির্ভূত শোষণের কাজে অথবা অকৃষি ক্ষেত্রে কাজে লাগায়। ফলে কৃষির কোন উন্নতি হয় না এবং সমগ্র কৃষি ক্ষেত্র একটা বদ্ধ জলায় পরিণত হয়। সেজন্য আমরা দেখছি যে, গত কয়েক বছর ধরে এরাজ্যের কৃষি উৎপাদন বিকাশের হার কমছে। তাই এটা বলা চলে যে, আমাদের রাজ্যের গ্রামের নয়া জোতদার শ্রেণি প্রধানত একটি সামন্ততান্ত্রিক শ্রেণি এবং এদের মধ্যে যে পুঁজিবাদী চরিত্র এসেছে তা আসলে দালাল ও আমলাতান্ত্রিক চরিত্রের।

১৩. বাজারের উপর নিয়ন্ত্রণ ঃ আমাদের উপরের আলোচনা থেকে এটা পরিস্কার যে নয়া জোতদাররাই গ্রামের জমি, ঋণ ও শ্রমের বাজারকে নিয়ন্ত্রণ করে। এরা হল একই সংগে জমি ইজারা/ভাগে দেবার বাজারে ইজারাদাদার, শ্রমের বাজারে ক্ষেতমজুর নিয়োগকারী এবং ঋণের বাজারে ঋণদাতা। গ্রামের গরিবরা যে বাজারেই যায় একই জোতদারকে দেখে প্রধান প্রতিপক্ষ হিসাবে। যেহেতু, জমি, শ্রম ও ঋণের বাজার পরস্পর সংযুক্ত তাই জোতদারদের উদ্বৃত্ত নিংড়ানোর সুযোগও অপরিসীম। ভূমিহীন ও গরিব চাষির , এমনকি মধ্য চাষীরও শোষিত হওয়ার মাত্রা অত্যধিক। এর সাথে যুক্ত হয়েছে কৃষি উপকরণ ও ফসলের বাজার। এখানেও নয়া জোতদার শ্রেণি ক্রেতা ও বিক্রেতার ভূমিকায় এবং রাজনৈতিক ক্ষমতার জোরে গ্রামের গরিবদের উপর নিজেদের শর্ত চাপিয়ে দেওয়ার অবস্থায়। এককথায়, আগের জোতদাররা যে পরিমাণ উদ্বৃত্ত লুঠ করতে পারত পুঁজিবাদী বাজারের সংযোগকে ব্যবহার করে নয়া জোতদাররা তার কয়েক গুণ উদ্বৃত্ত নিংড়ে নিচ্ছে। এখানেও পুঁজিবাদী রূপের অধীনে সামন্ততান্ত্রিক অন্তর্বস্তু কাজ করে চলেছে।

উপরের আলোচনা থেকে তিনটি বিষয়কে চিহ্নিত করা যায় ঃ

(১) কৃষিতে পুঁজিবাদের যে বিকাশ ঘটছে তা জাতিবাদী–সামন্ততন্ত্রকে খতম করে দেওয়ার মাধ্যমে ঘটছে না। বরং আধা সামন্তবাদকে নতুন রূপে টিঁকিয়ে রাখার মধ্যে দিয়ে এটা ঘটছে। পুঁজিবাদী রূপের সাথে সামন্তবাদী উৎপাদন সম্পর্কগুলি জড়িয়ে পেঁচিয়ে রয়েছে এবং এমনকি পুঁজিবাদী উদ্বৃত্ত মূল্য নিস্কাশনের প্রক্রিয়ার মধ্যে সামন্ততান্ত্রিক শোষণের সম্পর্কগুলি কাজ করে চলেছে। উপরের আলোচনা থেকে এটা পরিস্কার যে গ্রামের নয়া জোতদার শ্রেণি তাদের রাজনৈতিক ক্ষমতা, জমি ও উৎপাদনের অন্যান্য উপকরণের উপর তাদের একচেটিয়া মালিকানা বা নিয়ন্ত্রণ এবং জাত–পাত প্রথাকে ব্যবহার করে কৃষকদের থেকে উদ্বৃত্ত নিংড়ে নিচ্ছে। ফলে এই পুঁজিবাদের চরিত্র সামন্ততান্ত্রিক।

(২) এরাজ্যের কৃষিতে পুঁজিবাদের যে বিকাশ ঘটছে তার প্রধান বৈশিষ্ট্য হল এই পুঁজিবাদ সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থে ও নিয়ন্ত্রণে জন্ম নিয়েছে ও বিকশিত হচ্ছে। ফলে এর বিকাশ অবাধ নয়, নিয়ন্ত্রিত ও অধীনস্থ। কৃষিক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির অনুপ্রবেশের মাধ্যম হিসাবে কাজ করছে নয়া জোতদাররা। সাম্রাজ্যবাদ তার নিজের প্রয়োজনে এই শ্রেণিটাকে তৈরি করেছে। পুরোনো জোতদারদের দিয়ে এই কাজটা হচ্ছিল না। জনগণ বিদ্রোহ করছিলেন এবং লড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে পুরোনো জোতদারদের শেষ করে দেন। এই পরিস্থিতিতে সাম্রাজ্যবাদ সবুজ বিপ্লব এবং সীমিত ও নিয়ন্ত্রিত ভুমি সংস্কারের পরিকল্পনা নিয়ে হাজির হয় এবং সামন্তবাদ বিরোধী লড়াইয়ে যারা অংশ নিয়েছিল তাদের (বিশেষত, ও বি সি এবং এগিয়ে থাকা দলিতদের) মধ্যে থেকে একটা গতিশীল দালাল অংশকে তুলে আনে। ফলে নয়া জোতদারদের মধ্যে যে পুঁজিবাদী চরিত্র এসেছে তা আসলে দালাল চরিত্রের।

(৩) এই নতুন শ্রেণিটার বিকাশে সাম্রাজ্যবাদের দালাল রাষ্ট্র পুরোপুরি মদত দেয়। ব্যাংক ঋণ থেকে শুরু করে সমস্ত সরকারি সুযোগ সুবিধার বেশির ভাগটাই এরা পেয়ে থাকে। এরা পার্টি–পঞ্চায়েতের মাথায় বসে থাকার সুবিধা নিয়ে গ্রামের জন্য বরাদ্দ সরকারি টাকা লুঠ করে এবং এই ক্ষমতাকে ব্যবহার করে কৃষকদের শোষণ করে। এমনকি উপরের দিকের প্রশাসনিক পদগুলিতেও এরাই বসে আছে। সেজন্য নয়া জোতদারদরে মধ্যে যে পুঁজিবাদী চরিত্র এসেছে তা প্রতিযোগিতামূলক নয় বরং একচেটিয়া ও আমলাতান্ত্রিক।

সাধারণভাবে বলা যায় যে, আশির দশক থেকে পশ্চিমবাংলার গ্রামে সামন্তবাদের ভিত্তির উপর, সাম্রাজ্যবাদের নিয়ন্ত্রণের অধীনে এবং রাষ্ট্রীয় মদতে এক বিশেষ ধরনের পুঁজিবাদের বিকাশ ঘটানোর প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল। সেজন্য এই পুঁজিবাদের চরিত্র সামন্ততান্ত্রিক, দালাল এবং আমলাতান্ত্রিক। এই পুঁজিবাদ পুরোনো ধরনের সামন্ততান্ত্রিক সম্পর্কগুলিকে পরিবর্তিত করে এবং নতুন রূপ দেয়। এই প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে একটা নতুন ধরনের (আমলাতান্ত্রিক পুঁজিবাদী) জোতদার শ্রেণিকে গড়ে তোলে। আজকে যখন সাম্রাজ্যবাদ আরও গভীরভাবে কৃষি ক্ষেত্রকে নিজের থাবার তলায় নিয়ে আসতে চাইছে তখন এই নয়া জোতদার শ্রেণিটাই তার হাতিয়ার হিসাবে কাজ করছে।

২. গ্রামাঞ্চলে রাজনৈতিক ক্ষমতা কাঠামোয় পরিবর্তন ঃ অতীত বনাম বর্তমান

আমরা উপরের আলোচনায় দেখেছি যে, নয়া জোতদারদের শোষণের উৎস ও ধরন বহুমুখী। পুরোনো শোষকদের শোষণের উৎস ছিল মূলত জমি, মহাজনি এবং ফসলের ব্যবসা। কিন্তু, নয়া জোতদারদের ক্ষেত্রে বিষয়টা এতটা সহজ ও প্রকাশ্য নয়। অনেক ক্ষেত্রেই এদের জমি খুব বেশি নয় এবং শোষণের প্রধান উৎসও জমি নয়। ফলে অর্থনীতিবিদরা যখন জমির পরিমাণের ভিত্তিতে গ্রামের লোকের মধ্যে শ্রেণি বিভাজন করেন তখন তাঁরা এটা ভুলে যান যে, যাদের তাঁরা জমির পরিমাণের ভিত্তিতে হয়তো মধ্য কৃষক বা গ্রামীণ বেকারের সারিতে ফেলেছেন তার মধ্যে হয়তো এই নয়া জোতদাররা পড়ে গেছে। সেজন্য একটা রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে যে, ৭.৫ বিঘা অব্দি জমি আছে এরকম পরিবার জমি ছাড়া অন্যান্য সম্পদের ৬৩ ভাগের মালিক এবং এরা ব্যাংক বা অন্য প্রতিষ্ঠান থেকে নেওয়া ঋণের ৪৯ ভাগ নিচ্ছে (সুদিপ্ত ভাট্টাচার্য)। এর অর্থ এই মালিকদের মধ্যে একটা অংশ রয়েছে যাদের অবস্থা বেশ ভালো। নয়া জোতদারদের এই বহুমুখী শোষণকে টিঁকিয়ে রাখার জন্য একটা জটিল ও সর্বগ্রাসী রাজনৈতিক কাঠামোকে গড়ে তোলা হয়েছে। গ্রামের রাজনৈতিক ক্ষমতার এই কাঠামোটাকে বোঝাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। নচেৎ এই রাজ্যে আধা সামন্তবাদ বিরোধী সংগ্রাম গড়ে তোলা যাবে না।

পুরোনো জোতদারদের আমলে এলাকার রাজনৈতিক ক্ষমতা ছিল বড় জোতদার, মহাজন এবং ব্যবসাদার চক্রের হাতে। গ্রামের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনকে তারাই নিয়ন্ত্রণ করতো। কেন্দ্রীয় রাষ্ট্র ব্যবস্থা তাদের মাধ্যমেই এলাকার উপর নিজের শাসনকে প্রয়োগ করতো। জোতদারদের এলাকাগুলি ছিল অনেকটা স্বাধীন প্রজাতন্ত্রের মত। সামাজিক মেরুকরণ ও শ্রেণি দ্বন্দ্ব ছিল খুবই তীক্ষ্ণ এবং জনগণের এই সমস্ত শত্রুদের সহজেই চিহ্নিত করা যেত। ফলে তাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে খুব দ্রুত কৃষক জনগণকে শ্রেণি সংগ্রামের ময়দানে সমাবেশিত করা যেত। পঞ্চায়েত বলে তেমন কিছু ছিল না এবং শাসকশ্রেণির পার্টিগুলির এলাকার মাথা ছিল জোতদার নিজে। পার্টি কাঠামো বলে তেমনকিছু ছিল না। আশির দশক থেকে অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। এখন আমরা দেখতে পাই যে, জোতদাররা প্রতক্ষ্য শাসনের বদলে পার্টি ও পঞ্চায়েতের মাধ্যমে শাসন চালায়। এগুলির উপর নিয়ন্ত্রণই তাদের ক্ষমতার উৎস। তারা গ্রামাঞ্চলে পার্টি–পঞ্চায়েত–প্রশাসন–পুলিশের একটা জটিল চক্রকে গড়ে তুলেছে। এর মধ্যে নেতৃস্থানীয় ভূমিকা পালন করে পার্টি। এই প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের মাথায় বসে আছে নয়া জোতদাররা এবং এটাই তাদের ক্ষমতার উৎস। এই ক্ষমতাকে ব্যবহার করে তারা এলাকার অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনের প্রতিটি দিককে নিয়ন্ত্রণ করে। ওপর ওপর দেখলে মনে হবে সামন্ততান্ত্রিক ধাঁচে রাজা বা জমিদারের ব্যক্তিগত শাসনের বদলে এখন পুঁজিবাদী ধাঁচে নির্বাচিত প্রতিষ্ঠান, রাজনৈতিক দল, কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রীয় প্রশাসন প্রভৃতির শাসন কায়েম হয়েছে। কিন্তু, মনে রাখতে হবে যে এই সব প্রতিষ্ঠান বা দল কোন শ্রেণি উর্দ্ধ প্রতিষ্ঠান নয়। এগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করে গ্রামের নয়া জোতদার শ্রেণি এবং এই নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমেই তারা তাদের রাজনৈতিক শাসন চালায়। সেজন্য বলা চলা যে, পুঁজিবাদী ধাঁচের শাসন কাঠামোটা আসলে গ্রামের সামন্ততান্ত্রিক কর্তৃত্বকে টিঁকিয়ে রেখেছে। মূল কথা হলো বিষয়টার অন্তর্বস্তুকে বিচার করে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের নামে পঞ্চায়েতগুলিকে গড়ে তোলা হলেও আসলে একদিকে, এগুলি কেন্দ্রীয় রাষ্ট্র ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণকে একেবারে নিচ অব্দি প্রসারিত করে (জনগণের মধ্যেও একধরনের স্বশাসনের মোহ তৈরি হয়) এবং অন্যদিকে, এগুলিকে নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে নয়া জোতদাররা বিপুল পরিমাণ সরকারি টাকা এবং এলাকার উপর তাদের কর্তৃত্বকে বজায় রাখে । রাজ্য সরকারের একটা রিপোর্ট (২০০৪) বলছে যে, পঞ্চায়েত সদস্যদের মধ্যে জোতদার, ব্যবসাদার, শিক্ষক, চাকরিজীবীদের সংখ্যা বাড়ছে। এমনকি বেকার ও অন্যান্য সেবামূলক কাজে যুক্ত লোকদের সংখ্যা ৩০ থেকে ৪০ ভাগ। এরা কারা? এদের বেশির ভাগটাই হল এলাকার পার্টি বস। এদের জমি না থাকলেও (বা কম থাকলেও) গ্রামের সমবায়, ইস্কুল কমিটি প্রভৃতিকে এরা নিয়ন্ত্রণ করে। সরকারি টাকার ভাগ বাটোয়ারা এদের হাতেই। এছাড়াও আছে সরকারি ঠিকাদারি, ব্যবসা প্রভৃতি। এই নিয়ন্ত্রণকে ব্যবহার করে এরা নামে বেনামে বিপুল সম্পদের মালিক হয়েছে। দেখা যাচ্ছে যে,

এই ধরনের অকৃষিজীবী লোকের সংখ্যা পঞ্চায়েত সদস্যদের ৬০ভাগ। এটাই প্রমাণ করে যে, শুধুমাত্র জমির মালিকানার পরিমাণ দিয়ে গ্রামের শাসকদের চিহ্নিত করা যাবে না। বরং, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ এবং ক্ষমতার গোটা পরিপ্রেক্ষিতটাকে বিবেচনা করতে হবে।

আঞ্চলিক ক্ষমতার কাঠামোর অন্যতম স্তম্ভ (নেতৃত্বকারী) হল পার্টি। পার্টির ভূমিকাটাকে গভীরভাবে বোঝা দরকার। একেবারে তলার স্তর অব্দি শাখা প্রশাখা বিস্তৃত জালের মত পাটি ও গণ সংগঠনের কাঠামো পুরোনো জোতদারদের পার্টি কংগ্রেসের ছিল না (সি পি এমের থেকে সংগঠন তৈরি করাটা পরবর্তীকালে কংগ্রেস বা তৃণমূল শিখেছে)।

১. এরাজ্যের শাসকশ্রেণির একটা সুবিধা ছিল হাতের কাছে তারা সি পি এমের মত একটা শোধনবাদী পার্টিকে পেয়ে যায়। ৭৭ সালে ক্ষমতায় আসার পর সি পি এম সরকারি ক্ষমতাকে ব্যবহার করে পার্টি ও গণ সংগঠনের একটা বিশাল জালকে গড়ে তোলে। সি পি এমের নেতারা নিজেরাই নয়া জোতদারে পরিবর্তিত হয় বা তাদের দালালে পরিণত হয়। পুরোনো জোতদারদের একটা বড় অংশ রঙ পাল্টে সি পি এমে ভিড়ে যায়। সরকারি টাকা, ঠিকাদারি, সমবায়গুলির নিয়ন্ত্রণ ও শোষণের ভাগ নিয়ে নয়া জোতদারদের মধ্যে তীব্র বিরোধ আছে। অতীতে যখন বিরোধী বলে কিছু ছিল না তখন এদের এই বিরোধ সি পি এমের দুই গোষ্ঠীর মধ্যে বিরোধ হিসাবে প্রকাশ পেত। পরবর্তীকালে নয়া জোতদারদের একটা বড় অংশ তৃণমূলের পতাকার তলায় সংগঠিত হয়। অধিকাংশ এলাকাতে দুই পক্ষ শান্তিপূর্ণভাবে ভাগ বাটোয়ারা করে খায়। যেসব এলাকাতে আগে সি পি এম বিরোধীশূন্য করে দিয়েছিল সেখানে বিরোধীরা এখন অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে সি পি এমকে উচ্ছেদ করার জন্য মারামারি শুরু করেছে। তৃণমূলের সি পি এমের মত সুসংগঠিত পার্টি কাঠামো না থাকলেও তারা এখন গ্রামাঞ্চলে সংগঠিত সশস্ত্র গুন্ডা বাহিনী গড়ে তুলছে। তবে একটা কথা বলাই যায় যে, অন্যান্য রাজ্যের সাথে বাংলার একটা ফারাক হলো এখানকার গ্রামাঞ্চলে শাসকশ্রেণির মধ্যে দ্বন্দ্ব খুবই তীব্র। এর সুযোগ বিপ্লবীরা নিতে পারে।

২. পুরোনো জোতদারদের লেঠেল বাহিনীর জায়গায় এসেছে পার্টিগুলির সংগঠিত ক্যাডার/গুন্ডা বাহিনী। এই ব্যাপারেও এরাজ্য অন্যদের থেকে এগিয়ে। সরকারি সুযোগ সুবিধা দিয়ে এমনকি খেটে খাওয়া মানুষের মধ্যে থেকে কিছু লোককে ক্যাডার/গুন্ডা/দালাল বানানো হয়েছে। এরা অনেক বেশি সংগঠিত এবং এদের হাতে রয়েছে বিপুল পরিমাণ আগ্নেয়াস্ত্র। আমরা দেখেছি কিভাবে সি পি এম ও তৃণমূলের সশস্ত্র গুন্ডা বাহিনী বড় পুঁজির স্বার্থে রাজারহাটে গ্রামের পর গ্রামের লোকদের মেরে, ভয় দেখিয়ে উচ্ছেদ করেছে। সিঙ্গুর, নন্দীগ্রামে অবশ্য এটা করতে গিয়ে পাল্টা ঝাড় খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়েছিল। যেকোন এলাকায় বিপ্লবীদের যদি এই শক্তিকে মোকাবিলা করার উপযুক্ত প্রস্তুতি না থাকে তাহলে বিপুল ক্ষয়ক্ষতি হবে।

৩. পার্টির নেতারাই ঠিক করে দেয় সরকারি টাকার কতটা, কোথায় খরচ করা হবে, কাকে লোন পাইয়ে দেওয়া হবে, এমনকি জলের কল কোন পাড়ায় কার বাড়ির সামনে বসবে। এগুলির মাধ্যমে তারা বিশেষত গরিব মানুষের মধ্যে সামাজিক ভিত্তি তৈরি করে। যে কোন প্রতিবাদ আন্দোলন দমন করার জন্য তারা এই সামাজিক ভিত্তিটাকে কাজে লাগায়। জনগণের একটা অংশের বিপক্ষে আর একটা অংশকে লড়তে পাঠায়। এছাড়াও বিভিন্ন পার্টিগুলি সুবিধা দিয়ে নিজেদের সামাজিক ভিত্তি তৈরি করে এবং নিজেদের এলাকার উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার জন্য জনগণের একটা অংশের সাথে আরেকটা অংশকে লড়িয়ে দেয়। সেজন্য এরাজ্যের গ্রামে আমরা দেখি জনগণ শ্রেণির ভিত্তিতে বিভাজিত হওয়ার বদলে পার্টিতে পার্টিতে বিভক্ত হয়ে একে অপরের সাথে মারামারি করছেন। তাই এখন আমরা দেখছি সি পি এমের সমর্থক পাট্টাদারকে উচ্ছেদ করার জন্য তৃণমূল সমর্থিত পাট্টাদার যাচ্ছে। আগে সামন্তবাদ বিরোধী সংগ্রাম পরিচালিত হত সরাসরি বড় জোতদারদের কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে। বড় জোতদাররা কংগ্রেসী মদতপুষ্ট হলেও প্রথমেই সংগ্রাম কংগ্রেস বনাম জনগণ এই রূপ নিত না। অর্থাৎ শ্রেণি সংগ্রাম ছিল তুলনায় সরল ও বিশুদ্ধ ধরনের ঃ সামন্তবাদ বনাম গরিব জনগণ। বর্তমানে নয়া জোতদাররা যেহেতু প্রায় ক্ষেত্রেই শাসক পার্টির নেতা তাই সামন্ততন্ত্র বিরোধী সংগ্রাম প্রথম থেকেই শাসক পার্টি বনাম জনগণ-এই চেহারা নিচ্ছে। লড়াইটা খুব কঠিন, কারণ গোটা শাসক পার্টিকে শারীরিকভাবে মুছে দেওয়া সম্ভব নয়। আর শাসক পার্টির মধ্যেও গরিব মানুষ থাকে, যাদের আদর্শগতভাবে জিতে নেওয়াও বিপ্লবী শ্রেণি সংগ্রামের দাবি। পরিস্থিতি বদলের সাথে তাল মিলিয়ে গ্রামাঞ্চলে শ্রেণি সংগ্রামের এই নতুন রূপটাকে আমাদের অবশ্যই ঠিকঠাকভাবে বুঝতে হবে। তাই বিপ্লবীদের সামনে একটা অন্যতম কর্তব্য হলো জনগণকে শ্রেণি ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ করা এবং শ্রেণি সংগ্রাম গড়ে তুলে শাসক শ্রেণির পার্টিগুলির গণভিত্তিকে ভেঙে দেওয়া। এটা কোন সহজ কাজ নয়। গত তিরিশ বছরে বহু ঘটনা ঘটেছে যেখানে বিপ্লবীদের দমন করার জন্য সি পি এম গরিব মানুষকে জড়ো করেছে। এখন এই কাজটা তৃণমূল করছে। জনগণের মধ্যে গণ ভিত্তি তৈরি করা এবং সেটাকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করার এই ফ্যাসিবাদী পদ্ধতি আজকের দিনে পার্টিগুলির কর্ম পদ্ধতির একটা অন্যতম অঙ্গ।

৪. ভোটবাজ পার্টিগুলি জনগণের মধ্যে দ্বন্দ্ব তৈরি করে বা বাড়িয়ে তোলে এবং জনগণের পিছিয়ে পড়া অংশকে কাজে লাগায়। সি পি এমের জমানায় হরিণঘাটায় রিলায়েন্সের বিরুদ্ধে আন্দোলনরত খুচরো ব্যবসায়ীদের পিটবার জন্য এলাকার কৃষকদের কাজে লাগায় সি পি এম। কৃষকদের সি পি এম বোঝায় যে, রিলায়েন্স তাদের সময়মতো ন্যায্য দাম দেবে। এখন তৃণমূল এই ধরনের কাজ করছে। সি পি এম আমলে বহু পাট্টাদারকে জমির পাট্টা দেওয়া হয় নি বা একের পাট্টা অন্যকে দেওয়া হয়েছিল। এখন তৃণমূলের নেতাদের মদতে কিছু কিছু এলাকায় পুরোনো জোতদারদের সাথে পাট্টাদারদের চুক্তি হচ্ছে যে সি পি এমের পাট্টাদারদের উচ্ছেদ করার পর জমির একটা অংশ পুরোনো মালিক ফেরত পাবে এবং আর একটা অংশ বঞ্চিত পাট্টাদাররা নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেবে।

৫. শাসক শ্রেণির পার্টি ও গণ সংগঠনগুলির প্রধান কাজ হলো রাষ্ট্রের প্রসারিত হাত হিসাবে কাজ করা। তাদের এই পার্টি জালটার কাজ হলো প্রতক্ষ্য রাষ্ট্রীয় বাহিনীর হস্তক্ষেপের আগে ও পাশাপাশি প্রতিটি সংগ্রামকে দমন করা। সেজন্য ছাত্রদের ন্যায্য সংগ্রাম দমন করার জন্য প্রথম হামলা চালায় এস এফ আই, শ্রমিক আন্দোলনে সিটু, কৃষক আন্দোলনে কৃষক সমিতি, কর্মচারীদের জন্য আছে কোঅর্ডিনেশন কমিটি। এখন ঠিক এই কাজগুলো করার জন্য তৈরি হচ্ছে তৃণমূলের গণ সংগঠন। এরা শুধু রাষ্ট্রের প্রসারিত হাত হিসাবেই কাজ করে না, এছাড়াও চোখ কান হিসাবে কাজ করে। এরা এলাকার প্রতিটি লোকের উপর নজরদারী চালায় এবং পুলিশের কাছে সময়মতো রিপোর্ট করে। প্রশাসন ও পুলিশের সাথে যোগাযোগ রাখার জন্য পার্টির কয়েক জনকে বিশেষ দায়িত্ব দেওয়া হয়। সেজন্য বিপ্লবীদের এমন ধরনের সংগঠনের জাল গড়ে তুলতে হবে যাতে ওদের চোখ কানকে ফাঁকি দেওয়া যায়।

৬. পার্টিগুলির এই অক্টোপাসের মত সংগঠন জনগণের জীবনের প্রত্যেকটি দিককে নিয়ন্ত্রণ করে। ফলে গ্রামাঞ্চলে এক দম বন্ধ করা পরিবেশ তৈরি হয়েছে। পারিবারিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের প্রতিটি দিককে নিয়ন্ত্রণ করে পার্টি। পার্টি ও পঞ্চায়েত অফিসগুলি পরিণত হয়েছে পুরোনো জোতদারদের কাছারি বাড়ির মত। গ্রামের বিচার সালিশ থেকে শুরু করে গ্রামের প্রত্যেকটা বিষয়কে নিয়ন্ত্রণ করা হয় পার্টি অফিস থেকে। যে কোন পারিবারিক, সামাজিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক বিরোধে পার্টি মাথা গলায় এবং পার্টির মতামত ছাড়া এই সব সমস্যার সমাধান করার অর্থ পার্টির বিরুদ্ধে কার্যত বিদ্রোহ। জনগণের জীবনের যে সব দিক

নিয়ে পুরোনো জোতদাররা মাথা ঘামাত না সে সব বিষয় এখন পার্টির নিয়ন্ত্রণে এসেছে। এসবের মধ্যে দিয়ে পার্টি তার গণভিত্তিকে গড়ে তোলে এবং জনগণের মধ্যে বিরোধ জিইয়ে রাখে। সমস্ত সামাজিক প্রতিষ্ঠানকে নিয়ন্ত্রণ করে পার্টি। মন্দির-মসজিদ কমিটি, যুবকদের ক্লাব, ইস্কুল কমিটি, ব্যবসায়ী সমিতি প্রভৃতির উপর পার্টির কড়া নিয়ন্ত্রণ এবং এই নিয়ে নিজেদের মধ্যে মারামারিও চলে। এমনকি বিভিন্ন জাতের নিজস্ব নেতৃত্বস্থানীয় কমিটিগুলিকেও নিয়ন্ত্রণ করে পার্টি। সবচেয়ে বড় উদাহরণ হলো মতুয়া সম্প্রদায়ের সর্বোচ্চ কমিটিকে নিয়ন্ত্রণের জন্য সি পি এম ও তৃণমূলের মারামারি। (তবে তৃণমূলের রমরমা শুরু হওয়ার পর গত কয়েক বছরে একটা নতুন প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। আগে ধর্মীয় বা জাতপাত ভিত্তিক প্রতিষ্ঠানগুলি বা এই সব প্রতিষ্ঠানের মাথারা মূলত রাজনৈতিক ব্যাপারে মাথা গলাত না বা গলাতে ভয় পেত। ধর্মীয় নেতারা রাজনৈতিক নেতৃত্বের সাথে আঁতাত করে ও তাদের অধীনে থেকে কাজকর্ম চালাত। কিন্তু, শ্রেণি সংগ্রাম দুর্বল হয়ে পড়ার ফলে বামপন্থী চিন্তাভাবনা দুর্বল হয়ে পড়া এবং এই সব ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও তার মাথাদের যেভাবে তৃণমূল মাথায় তুলেছে (সি পি এমও পিছিয়ে নেই) তার ফলে এরা এখন রাজনৈতিক ব্যাপারে মাথা গলাতে শুরু করেছে। বিহার বা উত্তর প্রদেশের মত এরাজ্যেও ইমাম বা মৌলানা বা মতুয়া সম্প্রদায়ের নেতারা কোন পার্টিকে ভোট দিতে হবে তা নিয়ে ফতোয়া জারি করতে শুরু করেছে। এই ভয়ানক প্রবণতার দিকে আমাদের নজর রাখতে হবে।) এককথায়, নয়া জোতদাররা শোষণের সমস্ত উৎসগুলি এবং রাজনৈতিক কর্তৃত্বকে বজায় রাখার জন্য সমস্ত সামাজিক প্রতিষ্ঠানকে নিয়ন্ত্রণের জন্য গ্রামাঞ্চলে একটা সর্বগ্রাসী ক্ষমতার কাঠামো গড়ে তুলেছে। সি পি এমের বিরুদ্ধে জনগণের বিদ্রোহ আসলে এই কাঠামোটার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। তৃণমূলও এখন এই ধরনের একটা কাঠামো তৈরি করার চেষ্টা করছে।

৭. পার্টির আর একটা বড় ভূমিকা হল শ্রেণি বিরোধকে প্রশমিত করা বা ভোঁতা করে দেওয়া।। বিভিন্নভাবে তারা এটা করে। কিনে নিয়ে, ভয় দেখিয়ে, কিছু ছাড় দিয়ে, পারিবারিক চাপ তৈরি করে, আইনের রাস্তায় ঠেলে দিয়ে, আন্দোলনের একেবারে শুরুতেই প্রতিবাদীদের খতম করে দিয়ে, সামাজিক বয়কট, অরাজনৈতিক গন্ডগোলে জড়িয়ে কেস দিয়ে জেলে পোরা, সময়মতো পুলিশকে কাজে লাগানো প্রভৃতি পদ্ধতি তারা ব্যবহার করে। জনগণের সাথে প্রশাসনের সম্পর্কটাকে তারা নিয়ন্ত্রণ করে। পার্টিকে বাদ দিয়ে জনগণের পক্ষে পুলিশ– প্রশাসনের থেকে কোন সাহায্য পাওয়া অসম্ভব। পার্টির নির্দেশ ছাড়া পুলিশ– প্রশাসন কোন পদক্ষেপ নেয় না। পার্টি– পঞ্চায়েত– প্রশাসন– পুলিশের এই জটিল বুননটাই গ্রামের আঞ্চলিক ক্ষমতার কাঠামো। এই কাঠামোকে নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমেই নয়া জোতদাররা তাদের শাসন চালায়।

৮. পার্টিগুলি এরকম বিরাট সংগঠন এবং গণ ভিত্তি গড়ে তোলার ফলে শাসক শ্রেণির পক্ষেও গ্রামের জনমতকে রাজনৈতিকভাবে প্রভাবিত করা এবং নিজেদের দিকে ঘোরানোও অনেক সুবিধা জনক। ফলে বিপ্লবীদেরও একেবারে নিচের স্তর অব্দি জনগণের মধ্যেও শাসক শ্রেণির বিরুদ্ধে রাজনৈতিক লড়াই দিতে হবে। রাজনৈতিক সংগ্রামের বিষয়টা সেজন্য আগের চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

সাধারণভাবে বললে, পুরোনো জোতদারদের আমলের তুলনায় আজকের দিনে গ্রামে সাম্রাজ্যবাদের আরও বড় আকারে অনুপ্রবেশের সাথে সাথে কেন্দ্রীয় রাষ্ট্র ব্যবস্থা তার কাঠামোকে গ্রাম স্তর অব্দি প্রসারিত করেছে। একাজে তার হাতিয়ার হল পার্টি এবং পঞ্চায়েত। ওপর ওপর দেখলে এটা থেকে মনে হবে যে এর মধ্যে দিয়ে গ্রামের সামন্তশ্রেণির ক্ষমতাকে ছেঁটে দেওয়া হল। কিন্তু, আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে পুরোনো বা নতুন জোতদার শ্রেণি– উভয়ই টিঁকে আছে সাম্রাজ্যবাদের মদতে এবং নিয়ন্ত্রণে। জনগণের সংগ্রামের ফলে যখন পুরোনো রূপের আধা সামন্তবাদকে আর চালানো যায় না তখন সাম্রাজ্যবাদীরা নতুন রূপের মধ্যে দিয়ে আধা সামন্তবাদকে টিঁকিয়ে রাখে। পুরোনো রূপটা ভেঙে পড়া এবং নতুন রূপের মধ্যে দিয়ে টিঁকিয়ে রাখা– এই প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে সাম্রাজ্যবাদ আরও বেশি করে কৃষি ক্ষেত্রে অনুপ্রবেশ করে। আমাদের দেশের সামন্তবাদ যখন ভেঙে পড়ে তখন আঠারো শতকের শেষে ও উনিশ শতকের শুরুতে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে ইংরেজরা এদেশে একটা নতুন দালাল জমিদার শ্রেণিকে তৈরি করে। পরবর্তীকালে, যখন জনগণের সংগ্রামের জন্য জমিদারি ব্যবস্থাকে টিঁকিয়ে রাখা গেল না তখন মূলত অনুপস্থিত জমিদারদের জায়গায় গ্রাম ভিত্তিক শোষক হিসাবে (মধ্যস্বত্বভোগী) জোতদারদের তুলে আনা হয়। পরবর্তীকালে যখন জোতদারি ব্যবস্থাও ষাট–সত্তরের দশকের সংগ্রামের বসন্তের বজ্রনির্ঘোষে ভেঙে পড়ে তখন জোতদার বিরোধী সংগ্রামের মধ্যেকার একটা অংশকে নয়া জোতদার হিসাবে তুলে আনা হয়। প্রতিটি সংকটের সুযোগে সাম্রাজ্যবাদ ও দেশীয় দালাল পুঁজি আরও বড় আকারে অনুপ্রবেশ ঘটায়। সামন্তবাদ বিরোধী সংগ্রাম শ্রমিক–কৃষকের রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের দিকে (বিপ্লবের দিকে) না এগিয়ে গেলে এটাই স্বাভাবিক। সুতরাং, প্রশ্নটা জোতদারদের ক্ষমতা কমা বা বাড়ার নয়। প্রশ্নটা হলো গ্রামে আধা সামন্তবাদকে কোন্ রূপে টিঁকিয়ে রাখা হচ্ছে। একটা কথা সকল সময় মনে রাখতে হবে সাম্রাজ্যবাদ কখনোই সামন্ততন্ত্রকে পুরোপুরি উচ্ছেদ করে পুঁজিবাদের অবাধ বিকাশের রাস্তা পরিস্কার করতে পারে না কারণ সেটা করলে আধা উপনিবেশিক দেশের সস্তা শ্রম ও প্রাকৃতিক সম্পদ লুঠ করে অতি মুনাফা নিংড়ে নেওয়ার তার মূল স্বার্থ ক্ষতিগ্রস্থ হবে। উল্টোদিকে, আবার এটা ধরে নিলে চলবে না যে আধা সামন্তবাদের একটাই রূপ আছে – জমিদাররা ডান্ডাবাজি করে কৃষকদের থেকে উদ্বৃত্ত নিংড়ে নিচ্ছে। এরকমটা ধরে নেবার কারণেই অনেক বুদ্ধিজীবী এটা ধরে নেন যে, বড় জমিদার যখন নেই তার মানে সামন্তবাদও খতম হয়ে গেছে। সি পি এমও এমন প্রচার করে থাকে। এরা সাম্রাজ্যবাদের সাথে সামন্তবাদের সম্পর্ককে দেখতে চায় না। ফলে এরা এটা বুঝতে অক্ষম যে, সাম্রাজ্যবাদ ও দালাল রাষ্ট্রকে উচ্ছেদ না করে সামন্তবাদী উৎপাদন সম্পর্ককে উচ্ছেদ করা যায় না। ফলে এরা আধা সামন্তবাদের অপসারণ ও পুনর্গঠনের দ্বন্দ্বটাকে উপলব্ধি করতে অক্ষম। (একই কারণে এরা শিল্প ও সেবা ক্ষেত্রে যে পুঁজিবাদের বিকাশ ঘটেছে তার আমলাতান্ত্রিক ও দালাল চরিত্রকে না বুঝে তাকে এরা স্বাধীন পুঁজিবাদ বলে থাকে।) তারা এটা বুঝতেও অক্ষম যে, গ্রামে সাম্রাজ্যবাদের মদতে ও নিয়ন্ত্রণে গড়ে ওঠা নয়া জোতদার শ্রেণির বিরুদ্ধে লড়াই না করে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সত্যিকারের লড়াই গড়ে তোলা যায় না। এই লড়াইটা না করলে আমরা কেবলমাত্র শহরে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী প্রচারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থেকে যাব।

৩. কয়েকটি প্রশ্ন ঃ উত্তরের খোঁজ

অনেকে গ্রামে পুঁজিবাদের এই বিকাশকে বিকৃত পুঁজিবাদ বলছেন। তাঁরা অবশ্য পুঁজিবাদের অবিকৃত রূপটি কবে ও কোথায় ছিল সেটা চিহ্নিত করছেন না। পুঁজিবাদ একটা নৈরাজ্যবাদী ব্যবস্থা হওয়ার জন্য সকল সময়ই উৎপাদিকা শক্তির অপরিকল্পিত, মাথাভারী, একপেশে ও বিকৃত বিকাশ ঘটায়। এটা পুঁজিবাদের দূর্গ সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলিতেও সত্য। এই বিকৃত বিকাশের কারণেই রাশিয়াতে পুঁজিবাদের পুরোনো (সংশোধনবাদী) রূপটা ভেঙে পড়েছিল (১৯৯১)। এখন আমরা দেখছি পুঁজিবাদী–সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলিতে আর্থিক ক্ষেত্রের ফাটকাপুঁজির বাড় বাড়ন্ত, উৎপাদন শিল্প মার খাচ্ছে। মূল কথা হলো আমাদের দেশের পুঁজিবাদের চরিত্রকে নির্ধারণ করা। আসলে এই সব বুদ্ধিজীবীরা সাম্রাজ্যবাদের ভূমিকাটাকে দেখতে পান না অথবা আড়াল করেন। এছাড়াও, তাঁরা এই পুঁজিবাদের সাথে সামন্তবাদ ও রাষ্ট্রের সম্পর্কটাকে দেখতে পান না। সেজন্য তাঁরা আমাদের দেশের পুঁজিবাদের সামন্ততান্ত্রিক, দালাল ও আমলাতান্ত্রিক চরিত্রটাকে দেখতে ব্যর্থ হন। এই সব বুদ্ধিজীবীরা সামন্তবাদের সাথে আধা সামন্তবাদকে গুলিয়ে ফেলেন। ফলে সামন্তবাদের প্রাচীন রূপগুলিকে না দেখলেই তাঁরা ধরে নেন যে সামন্তবাদ শেষ।

আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হলো জমিতে শ্রম দেবার প্রশ্ন। বিপ্লবীরা জোতদার ও কৃষকের পার্থক্য করেন জমিতে পরিশ্রম করা বা না করা দিয়ে। জোতদার হলো সেই যে জমিতে পরিশ্রম করে না। কিন্তু, আজকের দিনে নয়া জোতদারদের মধ্যে অনেকে আছে যারা জমিতে শ্রম দেয় বা কিছুদিন আগেও দিত বা তার পরিবারের লোকেরা এখনও দেয়। (সাধারণভাবে, নয়া জোতদারদের মধ্যে যারা আগে জমিতে শ্রম দিত তাদের অধিকাংশটাই এখন আর শ্রম দেয় না।) অনেকের আবার জমিই নেই। তাই জমিতে শ্রম দেবার ব্যাপারটাকে যান্ত্রিকভাবে প্রয়োগ করা চলবে না। জমিতে শ্রম দেবার ব্যাপারটা অবশ্যই এখনও জোতদার নির্ধারণের প্রধান মাপকাঠি। তবে পাশাপাশি এটাও বিচার করতে হবে যে, গ্রামের সামগ্রিক অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক কার্যকলাপে সে কোন্ ভূমিকা নিচ্ছে। বিশেষ করে দেখতে হবে যে সামাজিক, রাজনৈতিক ক্ষমতার জোরে কৃষকদের অর্থনীতি বর্হিভূত উপায়ে শোষণ করছে কিনা। সেজন্য গ্রামের রাজনৈতিক ক্ষমতার চূড়ায় বসে থাকা লোকদেরকেও (বিশেষ করে পার্টির নেতাদের) নয়া জোতদার বলেই গণ্য করতে হবে। আমাদের কর্মীরা যখন গ্রামের জনগণের শ্রেণি বিশ্লেষণ করবেন তখন তাঁদের এই বিষয়টাকে মাথায় রাখতে হবে। তাঁদের অবশ্যই শাসক শ্রেণির পার্টির নেতা ও সাধারণ কর্মীর মধ্যে ফারাক করতে হবে। কর্মীদের অবশ্যই আমাদের দিকে জিতে নিতে হবে।

কোন কোন বুদ্ধিজীবী বলছেন যে, চাষ করে লাভ না থাকার জন্য কৃষকদের আর জমির প্রতি টান নেই। সেজন্য জমি দখলের আন্দোলন করতে কৃষকরা আগ্রহী হচ্ছে না। তাই কৃষি উপকরণের দাম কমানো এবং ফসলের ন্যায্য দামের দাবিতে আগে আন্দোলন করতে হবে এবং এই আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে যখন উপকরণের দাম কমবে ও ফসলের ন্যায্য দাম চাষীরা পাবে (অর্থাৎ কৃষি যখন আবার লাভজনক হবে) তখন তারা আবার জমি দখলের দাবিতে লড়াইতে নামবে। এই সব বুদ্ধিজীবীরা ভুলে যান যে, জমির প্রতি টান কৃষকদের আছে কিনা সেটা সিঙ্গুর, নন্দীগ্রামে দেখা গেছে। ছোট একটুখানি জমির টুকরোকে রক্ষা করার জন্য কৃষকরা জান দিয়ে দিয়েছে। এছাড়াও এঁদের দৃষ্টি কেবলমাত্র ধনী বা মধ্য চাষীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। সেজন্য তাঁরা চাষে লাভের ভিত্তিতে জমির প্রতি টান হিসাব করেন।

কিন্তু, আবার এটাও সত্য যে, গত তিরিশ বছরে এরাজ্যে তেমন কোন জমি দখলের আন্দোলন হয় নি। কেন হয় নি? কিভাবে হবে? এই প্রশ্নগুলির চটজলদি কোন সমাধান নেই। কিছু প্রাথমিক কথাবার্তা বলা যেতে পারে। প্রথমত, অতীতের মত বড় বড় জোতদার এবং খোলাখুলি অত্যাচার চালিয়ে খাজনা আদায়ের পদ্ধতিও এখন নেই। ফলে আগের মতো জমিকে কেন্দ্র করে তীব্র শ্রেণি দ্বন্দ্বও নেই। দ্বিতীয়ত, সংশোধনবাদীদের দীর্ঘকালের প্রচার ও প্রভাবের জন্য জনগণের মধ্যে জমি দখলের প্রশ্নে অবস্থান অনেকটা অস্পষ্ট হয়ে গেছে। তাঁদের মধ্যে এই আইনিবাদী ধারণা গেঁথে দেওয়া হয়েছে যে, সিলিংয়ের নিচের জমি দখল করার মানে অন্যের সম্পত্তিতে অন্যায়ভাবে হাত দেওয়া। তৃতীয়ত, এখন দূরে বা কাছের শহরে বা অন্য রাজ্যে গিয়ে কাজ পাবার সম্ভাবনা আগের থেকে বেড়েছে। ফলে পরিবারের এক বা দুজন বাইরে কাজে গিয়ে কিছু আয় করে সংসারে পাঠাতে পারছে। সেজন্য চাষের থেকে আয় কম হলেও কোনমতে পুষিয়ে যাচ্ছে। চতুর্থত, শাসকশ্রেণির রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলি একেবারে তলার স্তর অব্দি প্রসারিত হওয়ার জন্য তারা জমির প্রশ্নে কৃষকদের ক্ষোভ বিক্ষোভকে অনেকটাই অন্য দিকে (আইন, প্রশাসন, মিটমাট করা প্রভৃতি দিকে) ঘুরিয়ে দিতে পারে। পঞ্চমত, সাধারণভাবে দেখলে অতীতের জমি দখলের আন্দোলনগুলিতে জোতদারের জমি দখলের পরে সচেতন বা অসচেতনভাবে কৃষকরা জোতদারের কর্তৃত্বকে শেষ করে দেবার দিকে এগিয়ে গেছেন (সি পি এম-এর নেতৃত্বে পিছন থেকে রাশ টেনে ধরা বা সরকারি ক্ষমতাকে ব্যবহার করে করা নিয়ন্ত্রিত তথাকথিত কৃষক সংগ্রামগুলি অবশ্য এর ব্যতিক্রম) অথবা জোতদারের কর্তৃত্বকে শেষ করে দেবার পর তার জমিজমা দখল করেছেন। জমি দখলের আন্দোলনের ইতিহাস দেখিয়ে দিয়েছে যে, রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল এবং জমি আন্দোলন গভীরভাবে জড়িত। জমি দখলের অর্থ অর্থনৈতিকভাবে জোতদারের কোমর ভেঙে দেওয়া। সেজন্য জোতদার সর্বশক্তি নিয়ে প্রতিরোধ করবে এবং রাষ্ট্রও ছেড়ে দেবে না। কৃষকরাও এটা বোঝেন। তাই জোতদারের রাজনৈতিক ক্ষমতাকে উচ্ছেদ করার লক্ষ্য ও প্রস্তুতি ছাড়া একটা আংশিক দাবির সাধারণ অর্থনৈতিক আন্দোলন হিসাবে জমি দখলের লড়াই লড়া যাবে না। সেজন্য আগে জমি দখলের জন্য আন্দোলন, তারপর দখল করা জমি রক্ষার জন্য প্রতিরোধ সংগ্রাম এবং তারপর রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের জন্য সংগ্রাম- এই ধাপে ধাপে এগোনোর সহজ ফর্মূলা চলবে না। (তার মানে অবশ্য এই নয় যে কোন কোন এলাকায় যেখানে এখনও বড় বড় জোতদার টিঁকে আছে সেখানে জমি দখলের আন্দোলন হবে না বা করা যাবে না। এসব জায়গায় রাষ্ট্র চেষ্টা করবে আন্দোলনকে সিলিং বর্হিভূত জমি দখলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখতে।) ষষ্ঠত, পুরোনো জোতদারদের বিরুদ্ধে বীরভূমের খানপুরে গত কয়েক মাস ধরে চলমান কৃষক আন্দোলন কয়েকটি আগ্রহব্যঞ্জক শিক্ষা হাজির করেছে। ভুয়ো ভূমিসংস্কারবাদীরা কত একর জমি উদ্বৃত্ত ঘোষিত হয়েছে - তার মধ্যে কত জমি সরকারে ন্যস্ত ও তারপর বন্টিত হয়েছে তার আংকিক হিসাব দেখিয়ে প্রমাণ করার চেষ্টা করে যে, ভূমিসংস্কার সম্পূর্ণ হয়েছে। খানপুরে দেখা গেল যে, পুরাতন জোতদারদের একাংশ এখানে এক বিচিত্র কায়দা নিয়েছে। (১) তারা সরকার সিলিং অতিরিক্ত জমি খাস ঘোষণা করলেই সেই নিদের্শের বিরুদ্ধে মামলা করে তার অধিগ্রহণ ও বিলি বন্টন ঠেকিয়ে রেখেছে। (২) ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরকে হাত করে তারা মামলাবন্দী খাস জমি এবং অন্যান্য অবিতর্কিত খাস জমি বেআইনিভাবে নিজেদের কিছু পেটোয়া গরিব মানুষকে ভাগে চাষ করতে দিয়ে বহু বছর ধরে উৎপন্ন ফসলের অংশ ভোগ করে আসছে। (৩) ওয়াকফ্ বোর্ডের কাছ থেকে ভুয়া ওয়াকফ্ কমিটির অনুমোদন করে ওয়াকফ্ সম্পত্তির আয়ও ভোগ করে গেছে দিনের পর দিন। (৪) খাস জমিতে মাদ্রাসা বানিয়ে একদিকে চাকরি দেবার নাম করে বেকার যুবকদের কাছ থেকে ঘুষ নিয়েছে, নিজেদের আত্মীয়স্বজনদের প্যানেলে ঢুকিয়েছে। অন্যদিকে, মিড ডে মিলের বরাদ্দ টাকার একটা বড় অংশ নিজেদের পকেটে পুরেছে। (৫) পয়সা দিয়ে পার্টি ও পঞ্চায়েতের মাথাদের কিনে রেখেছে। এক্ষেত্রে, আইন অনুযায়ী যত জমি এদের প্রতক্ষ্য অধিকারে থাকার কথা বাস্তবে তার থেকে বহুগুণ বেশি জমি এরা নিয়ন্ত্রণ করে। সবচেয়ে অত্যাচারি ও দুর্নীতিগ্রস্থ বলে চিহ্নিত এই গোষ্ঠীটির বিরুদ্ধে গ্রামের সমস্ত গরিব এককাট্টা হয়েছেন এবং জমি দখল করেছেন। এক্ষেত্রে শিক্ষা এটাই ঃ গ্রামাঞ্চলে নিবিড় তদন্ত করতে পারলে শাসকশ্রেণির লম্বা চওড়া দাবির আড়ালে এমন সব লুকোনো দাবি মিলবে যেগুলিকে অবশ্যই লাগাতার শ্রেণি সংগ্রামের অ্যাজেন্ডার অংশ করা সম্ভব। (এই ঘটনাটা এটাও দেখিয়ে দেয় যে কিভাবে পুরোনো জোতদাররা নয়া জোতদারদের কায়দা শিখে নিয়েছে এবং পার্টিকে নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে শাসন শোষণ চালাচ্ছে)। সপ্তমত, গত কয়েক বছরে পশ্চিমবাংলায় যত আন্দোলন হয়েছে তার বেশির ভাগই খুব দ্রুত সি পি এমের কর্তৃত্বকে চ্যালেঞ্জ করার দিকে এগিয়ে গেছে অথবা সরাসরি সি পি এমের কর্তৃত্বকে চ্যালেঞ্জ করেই শুরু হয়েছে। আজকে তৃণমূল একের পর এক সি পি এমের পার্টি অফিস দখল নিচ্ছে এবং এর পিছনে জনগণের একটা বড় অংশের সর্মথন আছে। কারণ, ঐ অফিসগুলিই ছিল আসলে জমিদার বাড়ি, নয়া জোতদারদের কর্তৃত্বের প্রতীক। সুতরাং আমাদের সামনে কর্তব্য হলো নয়া জোতদারদের অর্থনৈতিক শোষণ এবং রাজনৈতিক ক্ষমতাকে সমস্ত দিক থেকে চ্যালেঞ্জ করা ও ভেঙে ফেলার প্রক্রিয়ায় জমি দখলের প্রশ্নটাকে তোলা। এছাড়াও জমি দখলের প্রশ্নটাকে আবার জনগণের চেতনায় নিয়ে আসার জন্য একদিকে রাজনৈতিক শিক্ষা দেওয়ার কাজটা জোরদার করতে হবে এবং অন্যদিকে ঐ লক্ষ্যে পৌছোনোর জন্য নির্দিষ্ট শ্লোগানগুলিকে ঠিক করতে হবে ও সংগ্রামের বাস্তব পদক্ষেপগুলিকে নিতে হবে। তবে একথা বলা যায় যে, অন্যান্য দাবির গণ আন্দোলনের মতো জমির দাবিতে চটজলদি সংগ্রাম গড়ে তোলা যাবে না। মূল যে বিষয়টাকে মাথায় রাখতে হবে, রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের চেতনায় উদ্বুদ্ধ করাটাই নির্ধারক। কাজটা সোজা নয়। কিন্তু, যারা সাম্যবাদের লক্ষ্যে সমাজ বদলের জন্য সংগ্রাম গড়ে তুলতে চায় তাদের সামনে করার মতো কোন সোজা কাজ নেই।

মাওবাদী পার্টি

অজিত

(এই লেখাটি thenaxalbari.blogspot.com থেকে নেওয়া হয়েছে।)

সর্বহারার অগ্রণীর ধারণাটা মূলস্রোতের মালয়ালম প্রচারমাধ্যমে একটা আলোচ্য বিষয় হয়ে উঠেছে। সি পি এমের অধঃপতন এবং গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের পচা নোংরা নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করার চেয়ে বরং এটা একটা স্বাস্থ্যকর ব্যাপার। বিশ্বায়নের দিকে সি পি এম যত ঢলে পড়েছে তত পার্টির উপর তাদের নেতাদের আমলাতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ আরও শক্তিশালী হয়েছে। এটাকেই ভুলভাবে (বা ইচ্ছাকৃতভাবে) তুলে ধরা হয়েছে প্রকৃত মার্কসবাদী পার্টির ধারণা হিসাবে এবং সেইভাবে এর সমালোচনা করা হয়েছে। যে কেউ মনে করতে পারেন যে, সি পি এম যখন খোলাখুলি শাসকশ্রেণির অবস্থান নিচ্ছিল তখন তাই দেখে দুঃখিত হয়ে এম এন বিজয়নের (মারা গেছে) সেই বিকৃত সমালোচনা যে, "পার্টির মধ্যে আলো বাতাস ঢুকতে দেওয়াটাই ভুল হয়েছিল"। অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে, মাওবাদী শিবিরের মধ্যেকার মতাদর্শগত সংগ্রাম পার্টির ধারণাটাকেও ছুঁয়ে গেছে। মানবজাতি ও নতুন সমাজের অগ্রণী হয়ে উঠতে হলে কোন সংগঠনের কি কি গুণ থাকা উচিত এবং এর সাথে তাল মিলিয়ে পার্টি গড়ে তোলার পদ্ধতি কি হওয়া উচিত ? সর্বহারার একনায়কত্বে পার্টির অবস্থান কি হওয়া উচিত ? আজকের দিনে একটা সর্বহারা পার্টি কি মাওবাদী পার্টি না হয়েও তার কমিউনিষ্ট গুণগুলি বজায় রাখতে পারে ? মাওবাদী পার্টি কি কেবলমাত্র কমিউনিষ্ট পার্টির আর একটা নাম ? নাকি মাওবাদী পার্টির প্রকৃতি ও কাজের পদ্ধতির মধ্যে নতুন কিছু আছে ?

পুজিঁবাদের যুগে, শ্রেণিগুলি (বা শ্রেণির বিভিন্ন অংশগুলি) তাদের স্বার্থকে প্রকাশ করে ও বাস্তবায়িত করে প্রধানত রাজনৈতিক দলের (একটা সামাজিক সংগঠন) হাতিয়ারকে ব্যবহার করে। শত্রু শ্রেণিগুলির সাথে লড়াই করে নিজের লক্ষ্য অর্জন করার জন্য সর্বহারা শ্রেণির নিজস্ব রাজনৈতিক দল গঠন করার প্রয়োজনীয়তার কথা মার্কস বলেছিলেন। একে প্রয়োগের মধ্যে দিয়ে যাচাই করা ও প্রতিষ্ঠা করা এবং একে একটা বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব হিসাবে বিকশিত করার কাজটা করেছিলেন লেনিন। লেনিনবাদী পার্টি ধারণা যাঁদের কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে তাঁরা হলেন পেশাদার বিপ্লবীরা, যাঁরা বিপ্লবী কার্যকলাপে নিজেদের পুরোপুরি নিয়োজিত করেন এবং বিপ্লব করাটাকেই যাঁরা নিজেদের পেশা হিসাবে গ্রহণ করেন। লেনিনের এই ধারণাকে এই বলে সমালোচনা করা হয়েছে যে, এটা একটা উচ্চবর্গের (elite) জন্ম দেবে যারা জনগণের উপর প্রভুত্ব করবে। এছাড়াও, লেনিনের এই দৃষ্টিকোণ যে শ্রমিকরা নিজে থেকেই তাঁদের মুক্তির পরিচালক মতাদর্শে উপনীত হতে পারবেন না এবং লেনিনের এই বক্তব্য যে বাইরে থেকে এই মতাদর্শকে তাঁদের মধ্যে নিয়ে যেতে হবে – এই সম্পর্কে মন্তব্য করা হয়েছে যে, এটা উচ্চবর্গবাদকে (elitism) মাথায় তুলে নাচা। উচ্চবর্গীয় মানসিকতার নির্দিষ্ট প্রকাশ হিসাবে লেনিনবাদী পার্টি ধারণাকে অভিযুক্ত করা হয়েছে। বলা হয়েছে লেনিনের এই ধারণায় শ্রমিকদের শক্তিকে (potential) কম করে দেখা হয়েছে। কেউ কেউ এই যুক্তি দিয়েছেন যে, যতদিন লেনিন বেঁচে ছিলেন ততদিন তাঁর ব্যক্তিগত সক্ষমতার জোরে লেনিনবাদী পার্টি ধারণার খারাপ দিকগুলি নিয়ন্ত্রণে ছিল, কিন্তু এগুলি স্তালিনের সময়ে ভয়ানক মৃত্যু নাচের রূপে ফেটে বেরিয়ে আসে (পিয়ারসন, মাতৃভূমি – ৮৭/৩, মার্চ ২৯, ২০০৯)।

লেনিনবাদী পার্টি ধারণা যে পর্যায়কালে গড়ে উঠছিল সেই সময় এই প্রশ্নে যে মতাদর্শগত সংগ্রামগুলি হয়েছিল সেগুলি সম্পর্কে আমাদের প্রথমে জানতে হবে। এর শুরু হয় অবিভক্ত রাশিয়ার কমিউনিষ্ট পার্টির (সেই সময় নাম ছিল রাশিয়ার সমাজ গণতান্ত্রিক শ্রমিক পার্টি) দ্বিতীয় কংগ্রেসে পার্টি সংবিধানের উপর বিতর্কের মধ্যে দিয়ে। লেনিনের খসড়া প্রস্তাবকে দক্ষিণপন্থীরা (ট্রটস্কিও তাদের সাথে গলা মিলিয়েছিল) অতি কেন্দ্রিকতাকে মদত দেবার অভিযোগে অভিযুক্ত করে। এমনকি পার্টি সদস্য হওয়ার জন্য কোন একটা পার্টি কমিটির সদস্য হওয়া এবং পার্টির কাজকর্মে অংশ নেবার যে মাপকাঠিকে লেনিন তুলে ধরেছিলেন সেটা তাদের চোখে ছিল অপ্রয়োজনীয় কেন্দ্রিকতা। তাদের পাল্টা প্রস্তাব ছিল যে, যারাই পার্টিকে সাহায্য করবে তাদেরকেই পার্টির সদস্যপদ দেওয়া। এভাবে তারা পার্টিকে অবসর সময়ের কর্মীদের একটা ঢিলেঢালা সংগঠনে পরিণত করতে চেয়েছিল। এটাই হলো লেনিন ও তাঁর বিরোধিদের মধ্যে মতপার্থক্যের মর্মবস্তু।

ক্ষমতা দখলের লক্ষ্যে চলমান একটা বিপ্লবী সংগ্রামের সামনের সারির কর্মী হতে প্রস্তুত এবং যাঁরা এই কাজের জন্য তাঁদের গোটা জীবনকে উৎসর্গ করছেন ও এই কাজের মধ্যে দিয়ে নেতৃত্ব দেবার জন্য প্রয়োজনীয় গুণ ও দক্ষতা অর্জন করেছেন তাঁদের নিয়ে একটা সংগঠন গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তাকে লেনিন পরিস্কারভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। এই দৃষ্টিকোণ থেকেই তাঁর পার্টি সংক্রান্ত ধারণা গড়ে উঠেছিল। তাঁর এই ধারণার পিছনে একটা প্রভাবশালী উপাদান হিসাবে কাজ করেছিল সেই সময়কার জারের রাশিয়ার বিশেষ পরিস্থিতি যেখানে কোনরকম খোলামেলা কার্যকলাপ চালানো সম্ভব ছিল না এবং সবসময় জারের গুপ্ত পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে কাজ চালানোটা ছিল বাধ্যতামূলক। লেনিনের পার্টি ধারণার উপর রাশিয়ার বিশেষ পরিস্থিতির গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবকে দেখা যায় যখন তিনি জোর দেন যে, পার্টির নেতৃত্বদায়ী কমিটিগুলির হাতে পুরোপুরি কেন্দ্রীভূত নেতৃত্ব দেবার ক্ষমতা থাকতে হবে এবং বিভিন্ন পার্টি কমিটি ও কমিটির সদস্যদের মধ্যে একটা আধুনিক কারখানার শ্রমবিভাজনের ধাঁচে কঠোর দায়িত্বের বিভাজন থাকতে হবে। কিন্তু, একইসাথে এটাও মাথায় রাখতে হবে যে তাঁর এই দৃষ্টিকোণের মধ্যে অন্তর্নিহিত রয়েছে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের পার্টি ধারণার থেকে সরে আসা, যদিও যে আশু পরিস্থিতির সমস্যার সমাধান করার জন্য তিনি তাঁর পার্টি ধারণাকে হাজির করছিলেন তা ছিল রাশিয়ার সেই সময়কার অবস্থা। পার্টি ধারণার প্রশ্নে ঠিক এইখানেই লেনিন তাঁর সময়কার অন্যদের থেকে নিজেকে আলাদা করে নিয়েছিলেন। কট্টর দক্ষিণপন্থীদের আক্রমণকে পাশে সরিয়ে রেখে বরং এই বিষয়টাকে বিস্তারিত ব্যাখা করার জন্য এবারে রোজা লুক্সেমবার্গ ও ট্রটস্কি (এই লোকটা কিছুদিনের জন্য বিপ্লবী শিবিরে যোগ দিয়েছিল) লেনিনকে যে সমস্ত সমালোচনা করেছিল তার মধ্যে ঢোকা যাক।

রাশিয়ার বিপ্লবী আন্দোলনের মধ্যেকার "অতি কেন্দ্রিকতাবাদী" ধারার প্রতিনিধি হিসাবে লেনিনকে চিহ্নিত করেছিলেন রোজা লুক্সেমবার্গ। লুক্সেমবার্গের এই সমালোচনার ভিত্তি ছিল বিপ্লবী গণ আন্দোলন ও পার্টির মধ্যে সম্পর্কের বিষয়ে তাঁর ধারণার মধ্যে। লুক্সেমবার্গ বলেছিলেন যে, "সমাজতান্ত্রিক অর্থে কেন্দ্রিকতা শ্রমিক আন্দোলনের যেকোন পর্যায়ে প্রয়োগযোগ্য কোন চূড়ান্ত বিষয় নয়। কেন্দ্রিকতা হল একটা প্রবণতা যা শ্রমজীবী জনগণ তাঁদের সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে যত বেশি বেশি করে বিকশিত হন ও রাজনৈতিকভাবে শিক্ষিত হয়ে ওঠেন সেই অনুপাতে বাস্তব হয়ে ওঠে"। "বাস্তব ঘটনা হলো সমাজ গণতন্ত্র সর্বহারা শ্রেণির সংগঠনে *যোগ* দেয় না। বরং সমাজ গণতন্ত্র নিজেই হল সর্বহারা শ্রেণি। এবং এই কারণে সমাজ গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা ব্ল্যাঙ্কিপন্থী কেন্দ্রিকতার থেকে অন্তর্বস্তুর দিক থেকে আলাদা ... সমাজ গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতাকে বলা যায় যে, এটা হলো সর্বহারা শ্রেণির অগ্রণী অংশের "আত্ম কেন্দ্রিকতা"। এটা হলো সর্বহারার নিজের পার্টির মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন" ('রাশিয়ার সমাজ গণতন্ত্রের সাংগঠনিক সমস্যা', মূল দলিলেই জোর দেওয়া হয়েছে)। তাঁর এই ব্যাখা ও তার সাথে কমিউনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রিকতার স্বেচ্ছামূলক চরিত্রের উপর তাঁর এই জোর দেওয়া আসলে শ্রেণি ও তার অগ্রণী অংশ, পার্টি ও ব্যাপক বিপ্লবী সংগ্রামের মধ্যেকার পার্থক্যকে কমবেশি মাত্রায় বাতিল করে দেয়। যদিও লুক্সেমবার্গ "আত্ম কেন্দ্রিকরণ" শব্দটাকে ব্যবহার করেছেন, কিন্তু আসলে এটার অর্থ হয়ে দাঁড়িয়েছে "স্বতঃস্ফূর্ত"। শ্রেণি ও তার অগ্রণী অংশ, পার্টি ও ব্যাপক বিপ্লবী সংগ্রামের মধ্যেকার পার্থক্যকে হালকা করে দেওয়াটা ট্রটস্কির বিরোধিতার মধ্যেও দেখা যায়। সে বলেছিল, "যদি শ্রমবিভাজনকে একটা *সাংগঠনিক নীতি* হিসাবে মেনে নেওয়া হয় তবে তা কেবলমাত্র একটা কারখানাতেই প্রয়োগ করা যেতে পারে, কিন্তু সমস্ত ধরনের রাজনৈতিক দলে এই নীতিকে মেনে নেওয়া যায় না, বিশেষ করে আমাদের পার্টিতে কোন মতেই মেনে নেওয়া যেতে পারে না। এটা কি আমাদের কাছে পরিস্কার নয় যে, শ্রম বিভাজনের এই "নীতি" কোন মতেই সেই সংগঠনের বৈশিষ্ট্য হতে পারে না যা সর্বহারা শ্রেণির শ্রেণি চেতনাকে বিকশিত করার দায়িত্ব নিজের হাতে তুলে নিয়েছে ?" ("আমাদের রাজনৈতিক কর্তব্য", খন্ড–৩, সাংগঠনিক প্রশ্ন, মূল লেখায় জোর দেওয়া হয়েছে)।

লেনিন পার্টি কেন্দ্রিকতার স্বেচ্ছামূলক চরিত্রকে অস্বীকার করেন নি। এটা চাপিয়ে দেওয়া কেন্দ্রিকতা নয়, বরং স্বেচ্ছায় মেনে নেওয়া হয়, যাঁরা বিপ্লবের স্বার্থকে মাথায় রাখেন তাঁরা সচেতনভাবে এটা মেনে নেন। এটাই হল লেনিনের স্বেচ্ছামূলক কেন্দ্রিকতার ধারণা। লুক্সেমবার্গ যেভাবে কেন্দ্রিকতাকে একটা "প্রবণতা" হিসাবে দেখেছিলেন যা সংগ্রামের প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়েই কেবলমাত্র বাস্তবায়িত হবে তার বিপরীতে লেনিনের কাছে কেন্দ্রীভূত পার্টি ও তার দায়িত্বের বিভাজন ছিল এমন একটা বিষয় যাকে সচেতনভাবে প্রতিষ্ঠা করতে হবে ও প্রথম থেকেই এই পদ্ধতিতে শিক্ষিত করতে হবে। যদিও এটা বিপ্লবী স্বতঃস্ফূর্ততার ভালো দিকটাকে বাতিল করে না।

আর একবার পরিস্কার করে বলা দরকার যে, লেনিন যেখান থেকে শুরু করেছিলেন তা হলো বিপ্লব সংগঠিত করা ও চালানোর জন্য কিধরনের সংগঠন দরকার। বিপ্লব বা সর্বহারা শ্রেণি ও তার বিকাশ সম্পর্কে মনের মধ্যে তৈরি করা কোন ধারণার থেকে লেনিন শুরু করেন নি, বরং শত্রু ও জনগণের নির্দিষ্ট অবস্থার বিচার বিশ্লেষণ করেই তিনি একটা সমাধান হাজির করেছিলেন। সেজন্য ১৯০৫ সালের অভ্যুত্থানের আগে তিনি যেরকম কঠোর কেন্দ্রিকতা ও পার্টিতে নতুন কর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে যেরকম সতর্কতা নেবার কথা বলছিলেন তার বদলে অভ্যুত্থানের সময় তিনি এমন রূপের সংগঠন গড়ে তোলার পক্ষে যুক্তি দেন যার মধ্যে ব্যাপক সংখ্যায় শ্রমিক শ্রেণির লড়াকু অংশকে যুক্ত করা যায়। এটার মানে লেনিন নিজে লেনিনবাদের বিপক্ষে গেছিলেন এমনটা নয়, বরং এটাই *ছিল* লেনিনবাদ। এই ঘটনায় তিনি পরিস্থিতির এই মূল্যায়ন দ্বারা পরিচালিত হয়েছিলেন যে, অভ্যুত্থানের সময় জনগণের বিপ্লবী উদ্দীপনা তাঁদের মতাদর্শগত, রাজনৈতিক দূর্বলতাকে অনেকটা মাত্রায় পুষিয়ে দেবে। এটা জনগণের উপর লেনিনের গভীর বিশ্বাস এবং বিপ্লবী সংগ্রামের ক্ষেত্রে সচেতন পদক্ষেপ ও স্বতঃস্ফূর্ততার মধ্যেকার দ্বান্দ্বিক সম্পর্কটার উপলব্ধিকে দেখিয়ে দেয়। কোন সন্দেহ নেই যে, লেনিনবাদী কেন্দ্রিকতা ও সাংগঠনিক নীতিগুলি এমন কোন চরম (absolute) বিষয় নয় যেগুলি "সংগ্রামের স্তর যাই হোক না কেন" চূড়ান্তভাবে প্রয়োগযোগ্য। লেনিনের কর্ম বিভাজনের নীতি কখনোই সমস্ত পার্টির সদস্যদের ও ব্যপক সংখ্যায় জনগণের চেতনার মানকে উন্নত করার কাজকে বাতিল করে না।

অগ্রণীর ধারণাকে লেনিন যেরকম দ্বান্দ্বিকভাবে দেখেছিলেন সেরকম দৃষ্টান্তমূলক পদ্ধতি এবং তিনি যেসমস্ত সাংগঠনিক নীতিগুলিকে সূত্রায়িত করেছিলেন সেগুলির থেকে কি তাঁর পরবর্তীকালের আন্তর্জাতিক কমিউনিষ্ট আন্দোলন সরে এসেছিল ? পিয়ারসন যেভাবে নেতাদের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যগুলির পিছনে দৌড়ে বেড়িয়েছে তার চেয়ে বরং লেনিন ও তাঁর পরবর্তীকালের কমিউনিষ্ট আন্দোলনের মধ্যেকার এরকম পার্থক্যগুলির দিকে নজর দেওয়াটা অনেক বেশি লাভজনক। স্থানকাল বিচার না করে বলশেভিক পার্টির সাংগঠনিক নিয়মগুলিকে সার্বজনীনভাবে প্রয়োগ করার বিপদ সম্পর্কে লেনিন সচেতন ছিলেন। তৃতীয় আন্তর্জাতিকের (কমিউনিষ্ট আন্তর্জাতিক – কমিন্টার্ন) বির্তকে অংশগ্রহণের সময় লেনিন লক্ষ্য করেন যে আন্তর্জাতিকের সাংগঠনিক নীতিগুলির মধ্যে জোরালো রুশ প্রভাব আছে এবং তিনি সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন যে অন্যান্য দেশের কমরেডরা এগুলিকে ঠিকঠাক উপলব্ধি করতে পারবে কিনা। সেইসময় দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের সাংগঠনিক পদ্ধতি থেকে বিচ্ছেদ ঘটানোর তাড়াহুড়োর মধ্যে লেনিনের এই দুশ্চিন্তার বিষয়টা তেমন নজর কাড়ে নি। ইতিমধ্যে রাশিয়ার কমিউনিষ্ট পার্টি সেদেশের শাসক পার্টিতে পরিণত হওয়ায় কঠোর কেন্দ্রিকরণ জরুরি হয়ে ওঠে। বিপ্লবী রাষ্ট্রের অস্তিত্বের জন্যই পার্টির লৌহদৃঢ় ঐক্য একটা ভীষণ জরুরি বিষয় হয়ে উঠেছিল। এই প্রেক্ষাপটেই রাশিয়ার পার্টি তার পুরোনো প্রয়োগের যে ধরন চালু ছিল তার থেকে সরে এসে দশম কংগ্রেসে পার্টির মধ্যে সমস্ড়গ্রুপ এবং তাদের পত্রপত্রিকা বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নেয়। পরবর্তীকালে, এটাই কমিউনিষ্ট পার্টির সাংগঠনিক নীতিগুলির ভিত্তির অংশ হয়ে ওঠে।

এই সময়কালে লেনিন, রাশিয়ার পার্টি ও কমিনটার্ণের দৃষ্টিভঙ্গী ছিল যে, পশ্চিম ইউরোপে একটা বিপ্লবী অগ্রগতি আসন্ন। বিভিন্ন দেশের রাজনৈতিক বিকাশ এই মতের সঠিকতাকে প্রমাণ করে। পরিস্থিতির এই আশু প্রয়োজন অবশ্যই সাংগঠনিক নীতিগুলির সূত্রায়নকে প্রভাবিত করেছিল। যদিও যে বিপ্লবী

পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল তা ঠান্ডা হয়ে আসে। এই সময় লেনিন ভাঁটার পরিস্থিতিতে ভবিষ্যত পদক্ষেপ কি হবে তা ঠিক করার জন্য একটা পুরোদস্তুর পুনর্মূল্যায়নের প্রয়োজনের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। কিন্তু, এই পুনর্মূল্যায়নের কাজ হাতে নেবার আগেই তিনি আততায়ীর বুলেটে আহত হয়ে শয্যাশায়ী হন এবং মারা যান। এটা জানা যায় না যে, তিনি যেসমস্ত বিষয়ে পুনর্মূল্যায়নের কথা ভেবেছিলেন তার মধ্যে পার্টি ধারণা এবং সাংগঠনিক নীতিগুলি ছিল কিনা। যাই হোক না কেন, পরবর্তীকালে পুনর্মূল্যায়নের এই কাজটা আর হাতে নেওয়া হল না। একটা বিশেষ পরিস্থিতিতে কাজের যে পদ্ধতি ও সাংগঠনিক নিয়মকে গ্রহণ করা হয়েছিল সেগুলিকে পরবর্তীকালে খুবই যান্ত্রিক পদ্ধতিতে সূত্রায়িত করা হয়েছিল।

স্তালিনের যান্ত্রিক ভুলগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল তাঁর মনোলিথিক পার্টির ধারণা। মাও এই ধারণাকে সমালোচনা করার আগে অব্দি স্তালিনের এই মডেলটাকেই আন্তর্জাতিক কমিউনিষ্ট আন্দোলনে অনুসরণ করা হয়েছিল। পার্টি হল এমন একটা শক্তি যাকে প্রশ্ন করা যায় না এবং যা সব সময়ই সঠিক – পার্টিকে পুজো করার এই দৃষ্টিভঙ্গী শক্তিশালী হয়ে ওঠে। স্তালিনের পার্টি ধারণার মধ্যে যান্ত্রিক চিন্তার প্রভাবকে পরিস্কার ভাবে দেখা যায়, যা সমাজতন্ত্রে শ্রেণি সংগ্রাম ও আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বকে বাতিল করে। পার্টিকে সক্রিয় দ্বন্দ্বের একটা ক্ষেত্র হিসাবে দেখা হয় নি। পার্টিকে একটা জীবন্ত সত্তা হিসাবে দেখা হয় নি যা আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক দ্বন্দ্বগুলিকে উপলব্ধি করার মধ্যে দিয়ে সমাজে নিজের নেতৃত্বের অবস্থান এবং প্রাসঙ্গিকতাকে ক্রমাগত পুনরুজ্জীবিত করে। মতাদর্শগত সংগ্রাম হয়ে গেছিল আনুষ্ঠানিক। গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা পরিণত হয়েছিল আধিপত্য ও বশ্যতার সম্পর্কে। এটা আশা করাই যায় যে, যে সমস্ত পার্টি ক্ষমতায় ছিল এবং যে সমস্ত পার্টি ক্ষমতা দখলের জন্য সংগ্রাম করছিল তাদের মধ্যে পার্থক্য ছিল। যারা ক্ষমতা দখলের জন্য সংগ্রাম চালাচ্ছিল তারা শত্রুর দমনের সামনে টিঁকে থাকার জন্য বাধ্য হয়েছিল জনগণের উপর অনেক বেশি নির্ভর করতে। আত্ম-সমালোচনা, শুদ্ধিকরণ এবং এই সমস্ত ইস্যুতে মতাদর্শগত সংগ্রাম পার্টির ভেতরের পরিবেশকে জীবন্ত করে তুলেছিল। যদিও, মনোলিথিক পার্টি ধারণার চাপ সব সময়ই বজায় ছিল। মতাদর্শগত সংগ্রামের তুলনায় সদস্যপদ বাতিল করে দেওয়াই বেশি গুরুত্ব পেয়েছিল। যতক্ষণ অব্দি পার্টি তার মার্কসবাদী-লেনিনবাদী দিশা বজায় রেখেছিল ততক্ষণ অব্দি এর মানে দাঁড়াত যারা তাদের কমিউনিষ্ট গুণ হারাত তাদের পার্টি থেকে সরিয়ে দেওয়া। কিন্তু, তাসত্ত্বেও মতাদর্শ পিছনের সারিতে চলে গিয়ে সাংগঠনিক পদক্ষেপ নেবার দিকটাই প্রাধান্যে চলে এসেছিল।

মাও এই নেতিবাচক ঐতিহ্য এবং এর পিছনে যে যান্ত্রিক চিন্তা কাজ করছিল তার থেকে বিচ্ছেদ ঘটান। আক্ষরিক অর্থেই এটা ছিল অগ্রণীর ধারণাকে নতুন করে গড়ে তোলা। এবং এটা সর্বহারার নেতৃত্বদায়ী ভূমিকা ও লেনিনবাদী পার্টির ধারণার আরও গভীরতর ও সমৃদ্ধতর উপলব্ধির রাস্তা খুলে দেয়। পার্টি ধারণার প্রশ্নে প্রতিষ্ঠিত চিন্তা থেকে মাওয়ের সরে যাওয়াটা একেবারে শুরু থেকেই দেখা যায়। হুনানের কৃষক আন্দোলনের উপর ১৯২৭ সালে লেখা রিপোর্টে মাও পরিস্কারভাবে তুলে ধরেন যে, বিদ্রোহি কৃষকদের নেতৃত্ব দিতে যে বিপ্লবী পার্টি ব্যর্থ হবে সেই পার্টিকে জনগণ ছুঁড়ে ফেলে দেবেন। তখনও অব্দি মার্কসবাদী তত্ত্বে যাদের পিছিয়ে পড়া হিসাবে দেখা হতো সেই কৃষকরা একটা সর্বহারা পার্টির বিপ্লবী চরিত্রের পরীক্ষা নেবেন ও নির্ধারণ করে দেবেন – মাওয়ের এই বক্তব্য কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বদায়ী ভূমিকাকে চরম বিষয় হিসাবে দেখার (absolutist) চিন্তার উপর একটা সাহসী আক্রমণ। এটা সর্বহারার ঐতিহাসিক ভূমিকা এবং অগ্রণীর ধারণাটাকে নতুন করে ভাবার জন্য জায়গা তৈরি করে।

যদিও পুঁজিবাদ (তার সর্বোচ্চ স্তর সাম্রাজ্যবাদ) ধ্বংস করার ঐতিহাসিক আন্দোলনে অন্যান্য শ্রেণি ও সামাজিক স্তরগুলি সর্বহারার গুরুত্বপূর্ণ বন্ধু কিন্তু তারা এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দিতে পারে না। অন্যান্য শ্রেণি ও সামাজিক স্তরের প্রত্যেকের কাছে মুক্তির ইস্যুগুলি নির্দিষ্ট – ভূমিহীন কৃষকদের কাছে জমি, দলিতদের কাছে জাতপাতের নিপীড়ন, নারীদের কাছে পুরুষদের আধিপত্যবাদ, আদিবাসীদের কাছে জনজাতিগত নিপীড়ন, নিপীড়িত জনগণের কাছে জাতিগত দমন, সংখ্যালঘুদের কাছে ধর্মীয় উৎপীড়ন প্রভৃতি। তাঁদের মুক্তির ইস্যুগুলি নির্দিষ্ট হবার জন্য গোটা বিপ্লবী লক্ষ্যের পরিপ্রেক্ষিত থেকে এগুলি আংশিকও বটে। কিন্তু, সর্বহারার ক্ষেত্রে অবস্থাটা এরকম নয়। পুরোনো ধরনের শোষণ মূলক ব্যবস্থা যেমন, জাতিবাদী সামন্তবাদের থেকে পুঁজিবাদী বন্ধন আলাদা। খিদের জ্বালা ছাড়া পুঁজিবাদী ব্যবস্থা সর্বহারার উপর অন্য কোন বাধ্যবাধকতা চাপিয়ে দেয় না। এবং যেহেতু নীতির দিক থেকে দেখলে সর্বহারা স্বাধীন সেজন্য কোন নির্দিষ্ট ধরনের মুক্তি তাদের সাথে খাপ খায় না। তাদের মুক্তির জন্য সমস্ত রূপের শোষণ ও দমনকে উচ্ছেদ করতে হবে। সেজন্য সর্বহারা শ্রেণির মুক্তির পূর্বশর্ত হলো সমগ্র মানবজাতির মুক্তি। তাঁদের এই বস্তুগত সামাজিক অবস্থাটাই হল সেই উৎস যেখান থেকে বেরিয়ে আসে সর্বহারার নেতৃত্বদায়ী ভূমিকা। এই বস্তুগত ভিত্তিটাই সর্বহারাকে বাধ্য করে শোষণ মুক্ত দুনিয়া গড়ে ওঠা অব্দি বিপ্লবকে চালিয়ে যেতে।

যদি সর্বহারা নেতৃত্ব সম্পর্কে মার্কসবাদী ধ্যানধারণাকে চরমে পরিণত করা হয় তবে তা অবশ্যই পার্টি পুজোর দিকে নিয়ে যাবে (সন্দীপন, মুন্নানিপোরালি, ১৩১)। আন্তর্জাতিক কমিউনিষ্ট আন্দোলনের ইতিহাস এবং বর্তমান দেখিয়ে দেয় কিভাবে এই পার্টি পুজোর উৎপত্তি হয়েছে এই যান্ত্রিক সমীকরণ থেকে যে সমীকরণ বলে – সর্বহারা = বিপ্লব ও কমিউনিষ্ট পার্টি = অগ্রণী। উল্টোদিকে, সর্বহারার উপরের স্তরের মধ্যে প্রায়ই যে অর্থনীতিবাদী ঝোঁক দেখা যায়, শোধনবাদ যে সামাজিক নিস্ক্রিয়তা তৈরি করে, সংস্কারবাদী রাজনীতি যা এই অর্থনীতিবাদকে শক্তিশালী করে এবং শ্রম ও শ্রমের ক্ষেত্রের প্রকৃতির মধ্যে যেসমস্ত পরিবর্তন দেখা গেছে তার ফলে সর্বহারার নেতৃত্বদায়ী ভূমিকার ব্যাপারটাকে বাতিল করার দৃষ্টিভঙ্গী তৈরি হয়েছে। পরিচিতির রাজনীতির স্রোতে ভেসে গিয়ে তারা মনে করে যে, ভবিষ্যতে এই সমস্ত আন্দোলনগুলিই সামাজিক পরিবর্তনের নেতৃত্ব দেবে।

এভাবে আমরা দুটো দিক পেলাম। একদিকে, সর্বহারা ও কমিউনিষ্ট পার্টিকে পুজো করা। এটা স্বার্থপরতা যা নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থকে সাধারণ স্বার্থ হিসাবে ন্যায়সংগত প্রতিপন্ন করার জন্য কমিউনিষ্ট পার্টিকে পুজো করার ঝান্ডা ওড়ায়। অন্যদিকে, আমাদের দৃষ্টিকে আংশিক বিষয়ের মধ্যে নামিয়ে আনার জন্য আলসের ঢেঁকিদের চক্রান্ত, শোষণ মুক্ত দুনিয়া গড়ে তোলার মহান কর্তব্যকে ফালতু কল্পনা বলে ঘোষণা করে বাতিল করে দেবার চক্রান্ত। মাওবাদ এই দুষ্ট চক্রকে কেটে

এগিয়ে যায়। সর্বহারার নেতৃত্বদায়ী ভূমিকা এবং কমিউনিষ্ট পার্টির অগ্রণী ভূমিকা হল একটা সম্ভাবনাময় শক্তি, ঐতিহাসিক পরিস্থিতি যাকে ধারণ করে। কোন একটা নির্দিষ্ট সমাজের ঐতিহাসিক মুহূর্তে সৃজনশীল হস্তক্ষেপের মধ্যে দিয়েই কেবলমাত্র এই শক্তিকে বাস্তবায়িত করা যায়। অন্যান্য ঘটনার মতই এটাও হল বিপরীতের ঐক্য। এটাই হলো হুনান রিপোর্টে মাওয়ের সতর্কবাণীর তাৎপর্য।

এরই ধারাবাহিকতা আমরা দেখতে পাই হুনান রিপোর্টের পঞ্চাশ বছর পরে মাওয়ের এই পর্যবেক্ষণের মধ্যে – "পার্টির একেবারে ভিতরেই রয়েছে বুর্জোয়ারা"। সোভিয়েত ইউনিয়নে পুঁজিবাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং চিনে পুঁজিবাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠা ঠেকানোর জন্য তিনি যে সাংস্কৃতিক বিপ্লব শুরু করেছিলেন সেই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই মাও এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন। মাওয়ের এই ধারণাকে স্তালিনের মনোলিথিক পার্টি ধারণার দৃষ্টিকোণ থেকে উপলব্ধি করা যাবে না। মাও পার্টির মধ্যে যে বুর্জোয়ার অস্তিত্বের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করাতে চেয়েছেন তা পার্টির মধ্যে বুর্জোয়া এজেন্টদের অনুপ্রবেশ ও পার্টি সদস্যদের অধঃপতিত করে দেবার থেকে আলাদা। পার্টির শুদ্ধিকরণের মাধ্যমে এই সমস্ত বুর্জোয়া এজেন্টদের আটকানোর চেষ্টা লেনিন ও স্তালিন করেছিলেন। মাও একটা নয়া বুর্জোয়া শ্রেণির কথা বলেছিলেন। বুর্জোয়া অধিকারের মত পুঁজিবাদী উৎপাদন সম্পর্কের অবশেষ এবং সর্বহারার একনায়কত্বে কমিউনিষ্ট পার্টির রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও শাসনকারীর ভূমিকা (এটা সমাজতন্ত্রের একটা অবশ্যম্ভাবী উপাদান) থেকেই জন্ম নেয় এই সব নয়া বুর্জোয়ারা। এর বিরুদ্ধে সংগ্রামে নির্ধারক বিষয় হলো বিপ্লব ও তার অধিকতর বিকাশকে নিরন্তর এগিয়ে নিয়ে যাবার বহুমূখী কর্তব্য পালন করার ক্ষেত্রে একটা সঠিক মতাদর্শগত–রাজনৈতিক লাইন। যদি শোধনবাদী লাইন নেতৃত্ব দখল করে তবে পার্টিতে বুর্জোয়ারা আধিপত্যের অবস্থানে চলে আসবে। পার্টি ও রাষ্ট্রের রঙ বদলে যাবে।

এটা অগ্রণী হিসাবে কমিউনিষ্ট পার্টির ভূমিকা সম্পর্কে আর একটা দ্বন্দ্বকে তুলে ধরে। উপরে আমরা যে সম্ভাব্য বিপদের কথা বলেছি তার প্রধান উৎস বাহ্যিক প্রভাবের মধ্যে নেই। এর উৎস রয়েছে পার্টি যে বিপ্লবের নেতৃত্ব দিয়েছে তার মধ্যে, যে সমাজ সৃষ্টি করেছে তার মধ্যে। অন্য কথায় বললে, বিপ্লবী সংগ্রামের অগ্রণী হিসাবে পার্টি সফলভাবে তার দায়িত্ব পালন করার মধ্যে দিয়ে যে বিপরীতের ঐক্য উঠে এসেছে তার মধ্যেই রয়েছে এই সমস্যার উৎস। সাম্যবাদের দিকে এগিয়ে যাবার দিকে নেতৃত্ব দেবার সম্পূর্ণ উল্টোদিকে দাঁড়িয়ে আছে এই সম্ভাব্য বিপদ (নয়া বুর্জোয়া শ্রেণির উত্থান ও পুঁজিবাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠার বিপদ – অনুবাদক)। কোন একটা সমাজতান্ত্রিক সমাজে এদের মধ্যে কোনটা বাস্তবায়িত হবে সেটা নির্ধারিত হয় প্রতিটি সুনির্দিষ্ট ঐতিহাসিক মূহূর্তে পার্টির মধ্যে ও সমাজে চলমান শ্রেণিসংগ্রামের মধ্যে দিয়ে। পার্টিকে একটা বিপরীতের ঐক্য হিসাবে উপলব্ধি করা – এটাই হলো তত্ত্ব ও প্রয়োগের উভয় ক্ষেত্রেই মাওবাদী পার্টি ধারণাকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য পুরানো ধারণা থেকে বিচ্ছেদের শুরুর বিন্দু।

চিন বিপ্লব ও আন্তর্জাতিক কমিউনিষ্ট আন্দোলন থেকে শিক্ষা নিয়ে মাও পার্টি সম্পর্কে বেশ কিছু প্রস্তাব বিস্তারিতভাবে সামনে আনেন। প্রথম থেকে শেষ অব্দি একটা বিষয়ের উপর মাও যুক্তিসম্মতভাবে জোর দিয়েছিলেন – জনগণ ও পার্টি এবং নেতৃত্ব ও কর্মীবাহিনীর মধ্যে সম্পর্কের ক্ষেত্রে নিজেকে উপরওয়ালা হিসাবে দেখানোর মনোবৃত্তিকে রুখে দিয়ে জনগণকে সেবা করার কমিউনিষ্ট সচেতনতাকে দৃঢ়ভাবে গড়ে তোলা। এটা নেতৃত্বের ভূমিকা বা গুরুত্বকে অস্বীকার করে না। মাও সেই দৃষ্টিভঙ্গীর বিরোধীতা করেছিলেন যা নেতৃত্বকে চরম করে তোলে এবং জনগণ ও কর্মীদের ভক্ত, নিষ্ক্রিয় হাতিয়ারে পরিণত করে। তিনি সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে, পার্টির ক্যাডাররা যত প্রয়োজনীয়ই হোন না কেন, জনগণই হচ্ছেন সমাজ পরিবর্তনের আসল কারিগর, সেজন্য ক্যাডারদের ভূমিকাকে বাড়িয়ে দেখা চলবে না। এই একই দৃষ্টিকোণ তিনি কেন্দ্রীয় কমিটি ও নিম্নতর কমিটি এবং সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও জনগণের সম্পর্কের ক্ষেত্রেও নিয়েছিলেন। নিচের তলা থেকে তথ্য না এলে কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারে না। অনেক সময় নিচের তলা সমস্যার সমাধান বার করে থাকে, এরকম ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় কমিটির কাজ হলো গোটা দেশে এটাকে প্রচারে নিয়ে যাওয়া। মাওয়ের এরকম পর্যবেক্ষণগুলি নির্ভুল নেতৃত্বের ধারণাকে ধ্বসিয়ে দেয়। মাওয়ের এই ধারণাগুলি গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার সাংগঠনিক নীতি এবং মার্কসবাদী জ্ঞানতত্ত্বের মধ্যেকার সম্পর্ককে সামনে নিয়ে আসতে সাহায্য করে। মাও চিহ্নিত করেছিলেন যে, বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে সংগ্রামটাই সমাজতন্ত্রে শ্রেণি সংগ্রামের একমাত্র উপাদান নয়। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও জনগণ এবং পার্টি ও জনগণের মধ্যেকার দ্বন্দ্বগুলিও সমাজতন্ত্রে শ্রেণি সংগ্রামের অন্তর্ভুক্ত। একেবারে ১৯৫০ সালেই মাও সতর্ক করেছিলেন যে, যেসব লোক মনে করেন যে ক্ষমতা দখল যেহেতু হয়ে গেছে তাই তাঁরা জনগণের উপর প্রভুত্ব করতে পারেন জনগণ তাঁদের শিক্ষা দেবেন। তিনি বলেছিলেন যে, কমিউনিষ্ট পার্টির একটা শিক্ষার দরকার এবং সেজন্য তিনি জনগণের ধর্মঘট ও প্রতিবাদ করার অধিকারের পক্ষে সওয়াল করেছিলেন ("পার্টির মধ্যেকার বুর্জোয়া ধ্যানধারণার বিরুদ্ধে লড়াই করুন", "চিনের কমিউনিষ্ট পার্টির অষ্টম কেন্দ্রীয় কমিটির দ্বীতিয় বর্ধিত অধিবেশনে ভাষণ", খন্ড – ৫, মাও রচনাবলী)।

এখানে যেটা চোখে পড়ার মতো তা হলো তলা থেকে সংগ্রাম গড়ে ওঠা , জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত উদ্যোগের উপর মাও যে গুরুত্ব দিয়েছিলেন। উপর থেকে সচেতন হস্তক্ষেপ এবং নিচ থেকে স্বতঃস্ফূর্ত চাপের মধ্যেকার দ্বান্দ্বিক সম্পর্কটার এই লেনিনবাদী উপলব্ধি, যেটা লেনিনের পরবর্তীকালে আন্তর্জাতিক কমিউনিষ্ট আন্দোলন থেকে হারিয়ে গেছিল সেটাকে মাও কেবলমাত্র আবার নতুন করে তুলে ধরলেন তাইই নয় বরং সাংস্কৃতিক বিপ্লব ও পুঁজিবাদ পুনঃপ্রতিষ্ঠার বিপদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রয়োগের মাধ্যমে একে এক নতুন উচ্চতায় তোলেন। এভাবে মাও পার্টি ধারণাকে বিকশিত করেন এবং কোন ব্যক্তির আচরণগত বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে নয় বরং দৃঢ় মতাদর্শগত–রাজনৈতিক নীতির নতুন ভিত্তির উপর একে প্রতিষ্ঠিত করেন।

মাওয়ের এই নতুন বিকাশকে মাও পরিচালিত চিনের কমিউনিষ্ট পার্টি কতটা মাত্রায় আত্মস্থ করছিল ? এটা একটা প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন। ঠিক এখান থেকেই আমাদের মূল্যায়ন শুরু করতে হবে যে, ষাটের দশকে মাও সে তুং চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ হয়ে যে আন্তর্জাতিক কমিউনিষ্ট আন্দোলন গড়ে উঠেছিল অথবা নব্বইয়ের দশকের মাওবাদীরা যারা গভীরতর ধারণার দাবি করে তারা কতটা মাত্রায় মাওবাদী পার্টি ধারণাকে আত্মস্থ ও বাস্তবায়িত করেছিল ? চিনের কমিউনিষ্ট পার্টি গড়ে

উঠেছিল কমিনটার্নের ধাঁচে। আমাদের প্রশ্নটার উত্তর খোঁজার সময় এই দিকটা ও তার পাশাপাশি দীর্ঘকাল ধরে কমিনটার্নের পদ্ধতি ও স্টাইলে কাজ করার প্রেক্ষাপটটাকে মনে রাখতে হবে। আমরা যেভাবে চিহ্নিত করেছি যে, মাও একেবারে শুরু থেকেই এই মডেল ভেঙে বেরোতে শুরু করেন। কিন্তু, তাঁর নতুন দৃষ্টিভঙ্গী একমাত্র সাংস্কৃতিক বিপ্লবের মধ্যে দিয়েই সত্যিসত্যিই প্রতিষ্ঠিত হয়। বাস্তবে, পার্টি সম্পর্কে মাওয়ের শিক্ষাগুলি কেবলমাত্র ১৯৭৩ সালে এসে প্রথম শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে সংকলিত হয় “চিনের কমিউনিষ্ট পার্টির মৌলিক ধ্যানধারণা” বইতে, যেটা সাংহাই টেক্সট বুক বলে পরিচিত (এর তিন বছর পর পুঁজিবাদের পথের পথিকরা যখন ক্ষমতা দখল করেছিল তখন তারা সবচেয়ে প্রথমে যে কাজগুলো করেছিল তার মধ্যে একটা ছিল এই বইটাকে নিষিদ্ধ করা)। এর থেকে সিদ্ধান্ত টানা যায় যে, চিনের পার্টিকে মাওবাদী দৃষ্টিকোণ অনুযায়ী নতুন করে গড়ে তোলা হচ্ছিল, যদিও এই গড়ে তোলার প্রক্রিয়ার মধ্যে ভালোরকম অসমতা ছিল। বাস্তবত, বিপ্লবী প্রয়োগ এবং প্রয়োগের অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে উঠে আসা নতুন অন্তর্দৃষ্টিকে আত্মস্থ করার মধ্যে দিয়েই মাওয়ের এই নতুন দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে উঠেছিল।

কিন্তু, পরিস্থিতির চাপিয়ে দেওয়া এই সীমাবদ্ধতাকেই শুধু দেখলে চলবে না। আর একটা ব্যাপারও ছিল – কমিনটার্ন দৃষ্টিকোণ থেকে অসম্পূর্ণ বিচ্ছেদ ঘটানো। এর মধ্যে মাওকে ঘিরে যে ব্যাক্তিপুজোর বাতাবরণ তৈরি করা হয়েছিল সেটার দিকে বিশেষ নজর দেওয়া দরকার। লেনিনের দৃষ্টিভঙ্গীর সম্পূর্ণ বিপরীতে গিয়ে স্তালিন এই ব্যক্তিপুজোর রাজনীতি শুরু করেছিলেন। যখন সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতা ক্রুশ্চেভ ব্যক্তি পুজোর বিরোধীতার নামে স্তালিনকে নসাৎ করার মধ্যে দিয়ে পুঁজিবাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য মতাদর্শগত জমি তৈরি করছিল তখন মাও স্তালিনকে রক্ষা করার দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নেন। কিন্তু, এই রক্ষার কাজটা করার সাথে সাথে স্তালিনের ভুলগুলির মার্কসবাদী সমালোচনাও করা হয়েছিল, কোনটা বর্জন করতে হবে ও কোনটা গ্রহণ করতে হবে তার মধ্যে পার্থক্য করা হয়েছিল। আমাদের ভেবে দেখতে হবে যে, এই কাজটা সম্পূর্ণ হয়েছিল কিনা। ব্যক্তিপুজোকে মার্কসবাদ কখনোই মেনে নেয় না। কিন্তু, ব্যক্তিপুজোকে পুরোপুরি বর্জন করার বদলে মাও ব্যক্তিপুজোর চরম প্রকাশগুলির বিরুদ্ধে সমালোচনার মধ্যেই নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখেন। যদিও চিনের শ্রেণি সংগ্রামের জটিল পরিস্থিতির দোহাই দিয়ে এটাকে ঠিক বলে প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়, কিন্তু নীতির দিক থেকে এটাকে কখনোই মেনে নেওয়া যায় না। ব্যাপারটা এরকম নয় যে, কতটা প্রশংসা করা হলো বা কেউ প্রশংসার যোগ্য কিনা। এই ধরনের ব্যক্তিপুজো কোন ব্যক্তি বা নেতা এবং পরোক্ষভাবে সেই পার্টি যে সবসময়ই নির্ভুল এই চেতনাকে লালনপালন করে। মাওবাদী পার্টির ধারণা এই ধরনের চেতনাকে বাতিল করে। কিন্তু চিনা পার্টির “সবসময়ই সঠিক” - এই ধরনের বিশেষণে এই ধরনের নির্ভুলতার চেতনা দেখা যায়। আজকের দিনেও মাওবাদী পার্টিগুলি তাদের নেতাদের ব্যক্তিপুজোকে ন্যায়সংগত প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করে মাওয়ের উদাহরণ টেনে। এটা দেখিয়ে দেয় যে, এই বিষয়ে স্পষ্টতা অর্জন করাটা কতটা জরুরি।

সাধারণভাবে, কমিনটার্নের পার্টি ধারণা থেকে বিচ্ছেদ ঘটাতে মাওবাদীরা কতটা সফল হয়েছে ? তাঁরা যে পার্টি গড়ে তুলেছেন ও নেতৃত্ব দিচ্ছেন সেগুলি কতটা মাওবাদী ? জনগণের সাথে থাকা ও তাঁদের সেবা করার বদলে তাঁদের উপর প্রভুত্ব করার তত্ত্ব কেউই হাজির করবেন না বা এধরনের প্রভুত্বকে ন্যায়সংগত প্রতিপন্ন করবেন না, কিন্তু অনেক ঘটনাতেই এই ধরনের প্রভুত্ব করার ব্যাপারটা দেখা গেছে। রাজনীতিকে কেন্দ্রে রেখে পার্টির প্রতি আনুগত্যের বদলে পার্টির উপর অন্ধ বিশ্বাস, নেতৃত্বকে নির্ভুল মনে করে তার উপর অন্ধ বিশ্বাস এবং ব্যক্তি পুজো, বিরোধিতা ও সমালোচনাকে সহ্য না করতে পারা, যেকোন পদ্ধতি যদি তা “পার্টি ও বিপ্লবের জন্য” হয় তবে তাতে অনুমোদন দেওয়ার মত বাস্তববাদ – এই ধরনের কমিনটার্নবাদী প্রভাব প্রায়ই কাজের পদ্ধতি ও দৃষ্টিকোণের মধ্যে দেখা যায়। কমিনটার্নবাদী শব্দটা ব্যবহার করা হয়েছে কারণ এগুলি কেবলমাত্র স্তালিনের একার ভুল নয়। এছাড়াও, এর মধ্যে নিহিত রয়েছে আন্তর্জাতিক কমিউনিষ্ট আন্দোলনের ইতিহাসের একটা গোটা পর্যায়ের সমস্যাগুলি। এর সাথে আমাদের অবশ্যই যোগ করতে হবে – সেই সময় দৃষ্টিকোণ ও বিকাশের সমস্যাও ছিল। কারণ এটাই ছিল সেই সময় যখন কমিউনিষ্ট মতাদর্শ সারা দুনিয়া জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছিল, যখন কমিউনিষ্ট পার্টি গড়ে তোলাটাকে উৎসাহিত করা হয়েছিল এবং একটা সত্যিকারের আন্তর্জাতিক বিপ্লবী সর্বহারা আন্দোলনকে রূপ দেওয়া হয়েছিল। মাওবাদ যেসমস্ত মহান উল্লম্ফন অর্জন করেছিল তার মধ্যে একটা ছিল কমিনর্টানের ইতিবাচক ভূমিকাকে এতটুকু ছোট না করেও সেই সময়কালের খারাপ ঐতিহ্য থেকে বিচ্ছেদ ঘটানো। এটাকে অবশ্যই আরও গভীরতর করতে হবে। কোন সন্দেহ নেই যে, আজকের মাওবাদী পার্টিগুলিই অতীত দিনের কমিউনিষ্ট পার্টির ধারাবাহিকতা। কিন্তু, অতীতের দৃষ্টিকোণ বা পদ্ধতিকে ভিত্তি হিসাবে নিলে চলবে না, বরং অগ্রণীর ধারণার ক্ষেত্রে মাওবাদ যে উচ্চতা অর্জন করেছিল সেটাকেই হতে হবে আজকের দিনের মাওবাদী পার্টির ভিত্তি।

(মালয়ালম থেকে অনুবাদ, মুন্নানিপোরালি পত্রিকার ২০০৯ সালের জুলাই-আগষ্ট মাসের ১৩১-১৩২ নং ইস্যুতে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। আরো স্পষ্ট করার জন্য এবং স্টাইলের উন্নতির জন্য লেখক মূল লেখার মধ্যে সংশোধন করেছেন। –মুন্নানিপোরালি)

দুই লাইনের পার্টি : মাওবাদী দৃষ্টিকোণ

মিলিটারি কুচকাওয়াজের পার্টি বনাম জীবন্ত সত্তার পার্টি

উদারনৈতিক বুর্জোয়ারা বরাবরই বলে আসছে যে, শৃঙ্খলা কাকে বলে তা শিখতে হলে বুর্জোয়া দলগুলিকে কমিউনিষ্ট পার্টির কাছেই যেতে হবে। বলে আসছে, কমিউনিষ্ট পার্টিতে সব কিছুই চলে তেল দেওয়া মেশিনের মতো, একটাই সুইচ কেন্দ্রীয় কমিটির নির্দেশ মাফিক। বস্তুত, বুর্জোয়া শ্রেণি শাসনের কড়া শৃঙ্খলার দস্তুর প্রতিষ্ঠার জন্য কমিউনিষ্টদের ছাত্র হতেও বুর্জোয়া তাত্ত্বিকদের আপত্তি নেই। কমরেড মাও সে তুঙের নেতৃত্বে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের আগে পর্যন্ত বহুকাল কমিউনিষ্ট বিপ্লবীরা নিজেরাও এভাবেই ভেবে এসেছেন। কেন্দ্রিয় কমিটির প্রতিটি নির্দেশ একেবারে খোদ ভগবানের মুখ নিসৃত বাণী – তাকে প্রশ্ন করতে নেই – মনের কোনো কোণে লেশমাত্র তা নিয়ে জিজ্ঞাসাও থাকতে নেই। কারণ "বিশ্বাসে মিলায় বিপ্লব, তর্কে বহুদূর"। উপর থেকে নিচ পর্যন্ত পার্টিকে যে মিলিটারি কুচকাওয়াজের মত দেখাচ্ছে এ নিয়ে বিপ্লবী কমিউনিষ্টদের মধ্যে কম আত্মসন্তুষ্টি ছিল না। সাংস্কৃতিক বিপ্লব ভাবনার এই পুরাতন ধারাকে একেবারে শিকড় থেকে নাড়িয়ে দেয়। মূর্ত অনুশীলনে সাংস্কৃতিক বিপ্লব সর্বোচ্চ জোর দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করে যে, বিপ্লবের জন্য স্বেচ্ছা শৃঙ্খলা, কেন্দ্রিয় লাইন–পরিকল্পনা, পার্টির প্রতি আনুগত্য অবশ্যই জরুরি – কিন্তু কখনই ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে, বিপ্লবী পার্টি মেশিন নয়, কর্মীরাও নাটবল্টু নন। বিপ্লবী পার্টি হল সর্বহারার সবচেয়ে এগিয়ে থাকা মানুষদের সংগঠন। এক বিপুল জীবন্ত সত্তা। বিপ্লব হল মহত্তম সৃষ্টি, যা সফল হতে পারে শ্রেণিসংগ্রামের ভিত্তিতে প্রাণবন্ত বির্তক – শেখার মানসিকতা – লেনদেন – নিত্যনূতন আত্মখন্ডনের নিরন্তর প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে। বির্তক বলতে কমরেড মাও কচকচির আড্ডাকে বোঝান নি। বিপ্লবকে সমৃদ্ধ করে এমন গঠনমূলক বির্তকের কথা অর্থাৎ মতাদর্শগত মন্থনের কথা বুঝিয়েছেন। পার্টির প্রতি দাসসুলভ আনুগত্যের বিপরীতে দ্বান্দ্বিক আনুগত্যের ভাবনাকে উৎসাহিত করেছেন। চেতনার অসম বিকাশ সমাজ জীবনের বাস্তব সত্য। সবাই সমান মাপের নেতা হলে স্টেজ ভেঙে পড়ে – আবার সবাই অনুসরণকারী হলে জাহাজ হয়ে পড়ে নাবিকহীন দিশাহীন। কাজেই বিপ্লবী পার্টিতেও দরকারি স্তরবিন্যাস থাকবে। কিন্তু, এই বাস্তবতার সাথে কোন বিরোধ নেই এই দাবির যে, বিপ্লবী পার্টিতে প্রত্যেককেই হতে হবে স্বনির্ভর এবং উদ্যোগি সংগঠক। অর্থাৎ কেন্দ্রিয় ভাবনা ও পরিকল্পনার সাথে ব্যক্তিগত উদ্যোগের কোন কাজিয়া নেই। মনোলিথিক পার্টির ধারণা এই উদ্যোগের গোড়াতেই কুড়ুল মারে। সাংস্কৃতিক বিপ্লব এই উদ্যোগকেই উন্মুক্ত করে।

অগ্রণী পার্টি বনাম জনগণ

মুস্কিল হচ্ছে এগিয়ে যাওয়া যেমন ভাল – এগিয়ে যাবার বিপদও আছে। বিচ্ছিন্নতার বিপদ। বিপ্লবী কমিউনিষ্ট পার্টি যেহেতু অগ্রসর চেতনার মানুষদের নিয়ে তৈরি হয়, তাই পার্টির ভিতরেই থাকে "উপরওয়ালা" হয়ে ওঠার বিপদ। নাক উঁচু মাষ্টারির মানসিকতার বিপদ। এবং শেষমেশ, জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ার বিপদ। এটাকে ঠেকানোর একমাত্র উপায় : "জনগণের কাছ থেকে শেখো, জনগণের কাছেই ফিরে যাও"। এই নীতিরই গভীরতম প্রয়োগ হল মহান সর্বহারা সাংস্কৃতিক বিপ্লব। সাংস্কৃতিক বিপ্লবের গোটা পর্যায়জুড়ে তীব্র এবং তীক্ষ্ণ মতাদর্শগত সংগ্রামে চিনা জনগণের ব্যাপকতম অংশগ্রহণ দেখিয়ে দিয়েছে জনগণের মধ্যে কি বিপুল সম্ভাবনা লুকিয়ে আছে। দেখিয়ে দিয়েছে পার্টি এবং জনগণের মাঝখানে কোন আকাশছোঁয়া চিনাপ্রাচীর নেই। দেখিয়ে দিয়েছে "অগ্রণী ভাবনা" শুধু পার্টির মধ্যেই নেই, জনগণের মধ্যেও আছে। "ভুল চিন্তা ও পদ্ধতি" শুধু জনগণের মধ্যেই নেই – বিপ্লবীদের মধ্যেও আছে।

বিপ্লবী পার্টি কি কখনো ভুল করে না ?

বিপ্লবীদের সমৃদ্ধ অতীত অভিজ্ঞতা এবং নিরন্তর অনুশীলনের মধ্যেই রয়েছে এই প্রশ্নের উত্তর। বিপ্লবী পার্টি তৈরি হয় রক্তমাংসের মানুষদের নিয়ে এবং কে না জানে যে, ভুল করা একটি মানবিক বিশেষত্ব। যে জাহাজ চিরকাল বন্দরে নোঙরে বন্দি থাকে, এক মুহূর্তের জন্যও তার ডুবে যাবার বিপদ নেই। এমন জাহাজ জগদ্দল পাথরের মতোই নিরর্থক অস্তিত্ব। একে জাহাজই বলা চলে না। বিপ্লবীরা ভুল করেন। বিপ্লবী পার্টিও ভুল করে। কিন্তু, বিপ্লবী পার্টি নিঃশর্ত শিক্ষা নেয় – নির্দিষ্ট লাইনের মূর্ত প্রয়োগ থেকে, শ্রেণি সংগ্রামের থেকে, জনগণের জীবনের ছোট বড় সব ধরনের অভিজ্ঞতা থেকে। বিপ্লবী পার্টি নিজেকে পুনর্গঠিত করতে ভয় পায় না। বিপ্লবী লক্ষ্য থেকে এক চুলও সরে না গিয়েও। এই প্রশ্নে বিপ্লবী পার্টি বুর্জোয়াদের ব্যঙ্গবিদ্রুপের তোয়াক্কা করে না। "কমিউনিষ্টরা ভুল প্রবণ" – বুর্জোয়াদের এই সমালোচনাকে বিপ্লবীরা পাত্তা দেয় না। কারণ তারা মনে করে – গভীরভাবে বিশ্বাস করে – বিপ্লবের স্বার্থেই ভুল সংশোধন জরুরি।

সমস্যাটা কিন্তু এখানে নয়। ভুল করলে তা শুধরে নেবার কাজ বিপ্লবীরা অতীতেও করেছেন, ভবিষ্যতেও করবেন। প্রশ্নটা হচ্ছে, ভুল কেন হয় ? বা পৌনঃপুনিক অর্থাৎ বারবার ভুলই বা কেন হয় ? অনেক কারণের মধ্যে একটা বড় কারণ : মতাদর্শগত নিষ্ক্রিয়তা, যার গোড়ায় রয়েছে পার্টি পূজা ও নেতা পূজার মানসিকতা – যে মানসিকতা নেতাকে বটগাছ হিসাবে দেখায় – প্রতিটি নির্দেশকে বিনা প্রশ্নে অক্ষরে অক্ষরে মানতে শেখায়। বিপ্লবী নেতৃত্বকে "অন্তরের নেতা", "আন্তর্জাতিক কর্তৃত্ব" ভাবতে শেখায়, লিন পিয়াওয়ের মত করে মাও সে তুংয়ের উদ্ধৃতিগুলিকে মুখস্ত করতে উৎসাহিত করে, মাও সে তুংয়ের রাজনীতিকে "মেড ইজি" করে ফেলতে চায়। মাও সে তুং কে "দশহাজার বছরে একবারই মাত্র জন্মান" – এমন প্রতিভা হিসাবে তুলে ধরে এবং পরিণতিতে পার্টি কর্মীদের মতাদর্শগত প্রশিক্ষণের দরকারকে বাস্তবে গৌণ করে ফেলে। ফলে আমরা একবার করে ধাক্কা খাই, আর ব্যক্তি নেতৃত্বের ভুল ও বিচ্যুতির মধ্যেই তার উৎস খুঁজতে গিয়ে বিভ্রান্ত হই। রাজনৈতিক লাইনের মধ্যে ভুল খুঁজতে না চাওয়া – অবশ্যই একটি সাবেকি এবং পশ্চাদ্‌পদ চিন্তা – এমনকি বিপ্লবীদের মধ্যে থাকলেও। এটা এক ধরনের মতাদর্শগত জড়তার লক্ষণ। সাংস্কৃতিক বিপ্লব এই মতাদর্শগত জড়তার শিকড় ধরেই টান দেয়। পার্টির সর্বোচ্চ নেতার বিরুদ্ধে বড় বড় পোষ্টারের মাধ্যমে নাম ধরে ধরে সমালোচনা করছেন জনগণ – এমনকি পার্টিকর্মীরাও। সমালোচিত নেতাও আত্মপক্ষ সমর্থনে সমালোচনার জবাব দিচ্ছেন প্রকাশ্য জনসভায় : এমন ঘটনার কোন সমান্তরাল পৃথিবীর আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না। এসবই দেখায় যে, পার্টির মধ্যে ঠিকও আছে, ভুলও আছে এবং জনগণ তার যোগ্য সমালোচক হওয়ার ক্ষমতা ধরেন।

কেন চাই দুই লাইনের লড়াইয়ের পার্টি ?

"এক সময় ভাবা হয়েছিল যে, সর্বহারার ক্ষমতা দখলের পর রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রশ্নটির মীমাংসা হয়ে গেছে। বিপ্লবের প্রধান কাজ পুরোনো অর্থনীতির রূপান্তরসাধন করে একটি নতুনকে সংগঠিত করা ... এটা উপলব্ধি করা যায় নি যে, বুর্জোয়ারা পুনরায় রাষ্ট্র ক্ষমতায় ফিরে আসতে পারে, সর্বহারা হারাতে পারে তার রাজনৈতিক ক্ষমতা এবং সর্বহারা একনায়কত্ব পুনরায় রূপান্তরিত হতে পারে বুর্জোয়া একনায়কত্বে। ... এই রূঢ় বাস্তবের প্রতি প্রত্যেক মার্কসবাদী–লেনিনবাদীর সর্বাধিক মনোনিবেশ করা প্রয়োজন এবং এগুলোকে গুরুত্ব সহকারে ভেবে দেখা দরকার"। ("সর্বহারার একনায়কত্ব ও মহান সর্বহারা সাংস্কৃতিক বিপ্লব" – ওয়াং লি, চিয়া ই শুয়ে, লি শিন।) এই বোধের জমিতে দাঁড়িয়েই মাও সে তুং বলেছিলেন : "চিন একটি সমাজতান্ত্রিক দেশে পরিণত হলেও শ্রেণি সংগ্রাম কোনো অর্থেই সম্পূর্ণ শেষ হয়ে যায় নি" (মাও রচনাবলী, পঞ্চম খন্ড)। মাও বলেছিলেন, বিপ্লবকে আঁকড়ে ধরে উৎপাদন বাড়ানোর কথা। নানা চিন্তা, নানা প্রক্রিয়া, নানা ঘটনা, নানা শ্রেণির ভিতর পৃথকীকরণের মধ্য দিয়ে সংগ্রামের অভিমুখ নির্ণয়ের কথা। মাও বললেন যে, কেবল কমিউনিষ্ট পার্টির ক্ষমতা দখলেই শ্রমিকশ্রেণির শাসন নিশ্চিত হয় না। এর জন্য চাই জনগণের ব্যপক অংশগ্রহণ। কথাটা কেবল উৎপাদনের ক্ষেত্র – সাংস্কৃতিক ও রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে সত্য নয় – এমনকি পার্টির ক্ষেত্রেও সত্য। এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই মাও ঘোষণা করলেন : "প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা ন্যায়সংগত"। কোথাও যাতে কেবল পার্টি, কেবল রাষ্ট্র বা কেবল গণফৌজের একচেটিয়া মুরুব্বিপনা বাসা বাঁধতে না পারে তার জন্য সৃষ্টি হল বিপ্লবী কমিটি। জনগণের অন্য ধরনের গণ সংগঠনগুলি ও গণ মিলিশিয়াকেও যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হল। ওপর থেকে ক্ষমতা হাতিয়ে স্বৈরতান্ত্রিক শাসন চাপিয়ে দেবার বিরুদ্ধে নানা ধরনের রক্ষাকবচ তৈরি করা হল। এই প্রথম কোন সমাজতান্ত্রিক দেশে জনগণ পার্টির কাজ, পার্টি নেতৃত্বকে সমালোচনার অধিকার পেলেন। প্রতিষ্ঠিত হল চার বড় অধিকার। তৈরি হল গণতান্ত্রিক দেওয়াল। ১৭২ জন কেন্দ্রিয় কমিটির সদস্যের মধ্যে শতকরা ৭০ ভাগ জনগণের দ্বারা খোলামেলা সমালোচিত হলেন। চিহ্নিত হল জনগণের সক্রিয়তার দ্বারা পার্টিকে চোখের মণির মত রক্ষা করার পথ। কমরেড মাও পার্টি পরিসর এবং জনগণের পরিসরের মধ্যেকার পুরাতন চিন্তা প্রভাবিত পাঁচিলটাকে এমনভাবে ভেঙে দিলেন যে, বুর্জোয়াদের ক্ষমতায় ফিরে আসার বিরুদ্ধে মতাদর্শগত সংগ্রাম আর শুধুমাত্র পার্টির ব্যাপার থাকল না – গোটা দেশের জনগণ এই সংগ্রামে সামিল হলেন। একই সংগে কমিউনিষ্ট পার্টির মধ্যে ঘাপটি মেরে লুকিয়ে থাকা বুর্জোয়া পথের অনুসারিরাও জনগণের সামনে উন্মুক্ত হয়ে গেল। একদিকে, কমরেড মাও মুক্তকন্ঠে ঘোষণা করলেন যে, উৎপাদন শক্তির প্রধান অংশ হলো শ্রমজীবী মানুষ – তাকে না দেখার অর্থ হল সবচেয়ে বড় উৎপাদন শক্তিকে না দেখা। সামাজিক বিপ্লব এই উৎপাদন শক্তিকেই মুক্ত করে – সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হলে উৎপাদন শক্তির সাথে সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠিত হলেও তা নিখুঁত হয় না। উপরিকাঠামোর সাথে অর্থনৈতিক ভিত্তির সামঞ্জস্য ও দ্বন্দ্ব দুইই থাকে। বুর্জোয়ারা এই পর্যায়ে টিঁকে থাকে , জন্মলাভ করে। তাই উৎপাদন সম্পর্ক বিরাট এগিয়ে গেছে – উৎপাদন শক্তি নিদারূণ পিছিয়ে রয়েছে – এমন ভাবনা আসলে বুর্জোয়ার অস্তিত্ব বাতিল করার সাথে সাথে বিপ্লবকেই বাতিল করে দেয় এবং পুঁজিবাদী পথে উৎপাদন শক্তির বিকাশের পথকে খুলে দেয়। অন্যদিকে, লিউ শাও চি – ইয়াং শিয়েন চেন – তেং শিয়াও পিংরা প্রচার করে উৎপাদন শক্তির তত্ত্ব, যার সার কথা হলো : চিনা সমাজের ক্ষেত্রে প্রধান দ্বন্দ্ব হলো অগ্রসর সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার সাথে পশ্চাদপদ্‌ উৎপাদন শক্তির দ্বন্দ্ব, পুঁজিবাদী বিকাশ আর সমাজতান্ত্রিক বিকাশ পরস্পরকে সহযোগিতা করে দিব্যি এগোতে পারে। তারা বলে রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি, সমবায় অর্থনীতি, কৃষি ও কুটির শিল্পের ব্যক্তিগত অর্থনীতি, ব্যক্তিগত পুঁজিবাদী অর্থনীতি এবং রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদী অর্থনীতি – এই পাঁচটি বিভাগ পরস্পরের সহযোগিতা করে চলবে। এই হল ইয়াং শিয়েন চেন-এর "পরস্পর সহযোগিতা তত্ত্ব"। লিউ শাও চি প্রচার করে পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম না করে তাকে আত্মস্থ করে নেওয়ার তত্ত্ব। প্রকাশ্যে বলে যে, প্রকৃত খোলাবাজার একধরনের পুঁজিবাদের জন্ম দিতে পারে, কিছু বুর্জোয়া উপাদান, কিছু উপরতলার লোকজন, কিছু ব্যবসাদার, কিছু ফেরিওয়ালার আবির্ভাব হতে পারে – কিন্তু তাতে থরহরিকম্প হবার কিছু নেই, কারণ আমরা পুঁজিবাদের প্লাবনকে ভয় করি না। বিপ্লবী বীরের ভঙ্গি করে এইভাবে পুঁজিবাদের পুনরুত্থানের বিপদের বিরুদ্ধে জনগণের মতাদর্শগত সজাগতাকেই শিথিল করে দেওয়া হল। সাংস্কৃতিক বিপ্লব, সমাজতান্ত্রিক সমাজে দুই শ্রেণির সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে বিকাশের তত্ত্ব অর্থাৎ এক ভেঙে দুই হবার মধ্যে দিয়ে অগ্রগতির দার্শনিক তত্ত্বকে প্রয়োগ করে কমরেড মাওয়ের নেতৃত্বে চিনের কমিউনিষ্ট পার্টির মধ্যেকার বিপ্লবী সদর দপ্তর পুঁজিবাদের পুনরুত্থানের এই বিপদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে নেতৃত্ব দেয়। বিপরীতে লিউ শাও চি দুই শ্রেণির সমন্বয় অর্থাৎ দুই জুড়ে এক হবার প্রতিক্রিয়াশীল শ্রেণিসংগ্রাম বিরোধি মতাদর্শ সামনে আনে। রাজনীতি–অর্থনীতি–সংস্কৃতির প্রত্যেক অলিগলিতে এইসব বিপরীত লাইনভাবনার মধ্যে দ্বন্দ্বসংঘাতের ঘূর্ণিঝড় বিপুল বেগে আছড়ে পড়ে। সমাজতন্ত্রের পর্বে বুর্জোয়া – সর্বহারার দ্বন্দ্বকে কার্পেটের তলায় লুকিয়ে না ফেলে তাকে তীব্রতর করে তোলার মাধ্যমে যেমন পুঁজিবাদের নতুন করে বেঁচে ওঠা এবং সর্বহারা একনায়কত্বকে ধ্বংস করে বুর্জোয়া একনায়কত্ব ফিরিয়ে আনার চেষ্টাকে রুখে দিতে হয়, একইভাবে সর্বহারা বিপ্লবী পার্টির মধ্যে অবিরাম দুই লাইনের লড়াইয়ের উদ্দেশ্য হল পার্টির বিপ্লবী সত্তাকে বাঁচিয়ে রাখা এবং তাকে উচ্চতর স্তরে বিকশিত করা। কারণ মতাদর্শগত দ্বন্দ্বসংঘাতহীন পার্টি হল বদ্ধজলা। কারণ আমাদের ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা বলে "স্রোতের জল দূষিত হয় না। কপাটের কব্জা পোকায় খায় না"। যতদিন বিভিন্ন পরস্পর বিরোধি স্বার্থের প্রতিনিধি শ্রেণি থাকে, ততদিন শ্রেণি সংগ্রামও থাকে – এ হল আমাদের ইচ্ছা নিরপেক্ষ সত্যি। সর্বহারা বিপ্লবী পার্টি যেহেতু শ্রেণিসমাজের গর্ভে জন্ম নেয়, তাই তার মধ্যেও দ্বন্দ্ব সংঘাত থাকে। এমনকি বৈরিতামূলক দ্বন্দ্বও থাকে। দুই লাইনের লড়াই হলো পার্টির ভেতরে ভুল চিন্তাকে মতাদর্শগতভাবে পরাস্ত করে এবং এই প্রক্রিয়ায় পার্টির নেতা ও কর্মীদের শিক্ষিত করে তুলে সঠিক লাইনকে পার্টি ও জনগণের আরও গভীরে প্রতিষ্ঠিত করার কার্যকরি উপায়। এককথায়, ভুল চিন্তাকে শিকড়শুদ্ধ উপড়ে ফেলার এর চেয়ে ভাল কোন উপায় আজ পর্যন্ত আবিষ্কার হয় নি। মনোলিথিক অর্থাৎ এক পাথুরে পার্টির মতো আমলাতান্ত্রিক কায়দায় উপর থেকে বহিস্কার একেবারেই মাওবাদ সম্মত নয়। কারণ, প্রথমত, এই পদ্ধতি পার্টি নেতৃত্বকে সর্বশক্তিমান (?) আমলা বানায়। দ্বিতীয়ত, এই পদ্ধতি পার্টি কর্মীদের সঠিক ও বেঠিক চিন্তার মধ্যে পার্থক্যকরণের সচেতন উদ্যোগে সামিল করে তাঁদের চেতনার স্তরকে উন্নত করার পথে বাধা সৃষ্টি করে। তৃতীয়ত, এই পদ্ধতি একই ভুলের বারবার পুনরাবৃত্তির বিপদের সামনে পার্টির দরজা খুলে দেয়।

দুই লাইনের লড়াইয়ের মানেই কি ভাঙন ?

এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, দুই লাইনের লড়াই হল মাওবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির বিশেষত্ব। শোধনবাদী পার্টিতে দুই লাইনের লড়াই থাকে না – শোধনবাদী নেতৃত্ব দুই লাইনের লড়াইকে উৎসাহিতও করে না। শাসকশ্রেণির সেবা করার জন্য তারা তাদের শ্রেণি সমঝোতার লাইন কর্মীসাধারণের উপর স্বৈরতান্ত্রিক এবং আমলাতান্ত্রিক কায়দায় চাপিয়ে দেয়। শোধনবাদী পার্টির মধ্যে যারা বিপ্লবী তাঁদের নেতৃত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ধ্বজা তুলে পার্টি ভাঙার কাজে বিকল্প নেতৃত্ব দেবার দায়িত্ব তাই সচেতনভাবেই কাঁধে তুলে নিতে হয়। এ কারণেই কমরেড লেনিনকে মেনশেভিক নেতৃত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে হয়েছে। কমরেড মাওকে বিদ্রোহ করতে হয়েছে লিউ শাও চির বিরুদ্ধে। কমরেড চারু মজুমদারকে ডাঙ্গে–রণদিভেদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে ঘোষণা করতে হয়েছে : "আমাদের জীবনের প্রায় সর্বক্ষেত্রেই শোধনবাদ বাসা বেঁধে বসে আছে। তাকে যতক্ষণ আমরা উৎখাত করতে না পারব ততক্ষণ নতুন বিপ্লবী পার্টি গড়ে উঠবে না, ভারতবর্ষের বিপ্লবী সম্ভাবনা ব্যাহত হবে, ইতিহাস আমাদের ক্ষমা করবে না" (আধুনিক শোধনবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে যান)। বিপ্লবী দৃষ্টিকোণ থেকে এই ধরনের বিদ্রোহ এবং ভাঙন ছাড়া নতুন গড়ার কাজ পৃথিবীর কোন দেশেই অতীতে সফল হয় নি – ভবিষ্যতেও হবে না। মাওবাদী পার্টিতে দুই লাইনের লড়াইয়ের সামনে যে দুটি লক্ষ্য থাকে সেগুলি হল – এক, বেঠিক লাইনকে পরাস্ত করা এবং দুই, পার্টির সঠিক লাইনের পক্ষে পার্টির অভ্যন্তরীণ ঐক্যকে আরও সংহত ও সুদৃঢ় করা। সমগ্র প্রক্রিয়ায় পার্টির প্রয়াস থাকে বেঠিক/ভুল লাইনের প্রতিনিধি কমরেডকেও সংগ্রাম–সমালোচনা–রূপান্তরের মাধ্যমে সঠিক লাইনের পক্ষে জিতে নেবার। সক্ষম এবং যোগ্য বিপ্লবী নেতৃত্ব হলেন তিনিই যিনি এই কাজটি সত্যিকারের বিচক্ষণতা ও মনের প্রসারতা নিয়ে করতে পারেন। সংখ্যাগরিষ্ঠতার যান্ত্রিক চাপ সৃষ্টি করে নয়, শতকরা একশোভাগ ধৈর্য্য এবং নীতিনিষ্ঠতার সাথে বিরোধি মতের কমরেডের সাথে তাঁকে আলোচনা চালাতে হয় – ভুল লাইনের সাথে পরিপূর্ণ বিচ্ছেদ ঘটাতে এবং আত্মসমালোচনা করতে তাঁকে উৎসাহিত করতে হয় – নির্দিষ্ট প্রয়োগ থেকে তাঁকে শিখতে উৎসাহ দিতে হয়। পার্টি যদি এই কাজে সফল হয়, পার্টি ভাঙন এড়িয়ে যেতে পারবে এবং ঐক্যের বনিয়াদ আরও শক্তিশালী হবে। দুই লাইনের লড়াই চালাতে হবে প্রথমত, অবশ্যই নীতিসম্মতভাবে – ষড়যন্ত্রমূলক ঘৃণা অভিযান এবং কুৎসার পথে নয়। দ্বিতীয়ত, সুনির্দিষ্ট তথ্য প্রমাণের উপর দাঁড়িয়ে। পেটি বুর্জোয়া অহংবোধকে কোনমতেই মাথায় চড়তে দিলে চলবে না। মুস্কিলটা হচ্ছে এই যে, এক হাতে তালি বাজে না। বিপ্লবী নেতৃত্বের নীতিসম্মত দুই লাইনের লড়াই পরিচালনার উদ্যোগে বিরোধি মতের প্রতিনিধি কমরেডদেরও যথাযথ সাড়া দিতে হবে। নয় তো গোটা ব্যাপারটা কোন ইতিবাচক শিক্ষণীয় বিষয় উপস্থাপিত করতে পারবে না। আমাদের দেশে সত্তরের দশকের বিপ্লবী সংগ্রামেও আমরা এরকম নেতিবাচক ঘটনা ঘটতে দেখেছি। কমরেড চারু মজুমদার সত্যনারায়ন সিংহদের বিরুদ্ধে দুই লাইনের লড়াই লড়তে চেয়েছিলেন – দলিল পেশ করেছিলেন। সত্যনারায়নরা কিভাবে জবাব দেয় ? পার্টি থেকে বেরিয়ে গিয়ে নতুনভাবে সি পি আই (এম–এল) ও তার কেন্দ্রিয় কমিটি বানিয়ে ঐ তথাকথিত পার্টি থেকে কমরেড চারু মজুমদারকে বহিস্কারের মাধ্যমে ! অসীম–নাগি–সত্যনারায়ন সহ যারাই পার্টির লাইন নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে, তারা কেউই দুই লাইনের লড়াইকে ইতিবাচক অর্থে নিস্পত্তিমূলক করার দায়িত্ব নেয় নি। এমনকি চিনা পার্টির নেতৃত্বর ১১ পয়েন্ট পরামর্শকেও তারা পার্টিকে ভাঙার কাজে ব্যবহার করতে চেয়েছে। "আমাদের বারো রাজপুতের তেরো হাঁড়ি" বলে বিপ্লবী থেকে ভোলবদলানো যে সব নয়া শোধনবাদী সরকারি নকশালরা নিত্যদিন কান্নাকাটি করে – তেলে জলে সার্বিক বিপ্লবী ঐক্যের আকাশকুসুম তত্ত্ব নিত্য প্রচার করে – তারাই যে পার্টি ভাঙার মূল কারিগর – একথা ভুলে যাবার অর্থ আমাদের নিজেদের অতীত ইতিহাসই ভুলে মেরে দেওয়া। ... দুই লাইনের লড়াই হলো কোদালকে কোদাল বলার লড়াই। বিপ্লবী পার্টির পক্ষে বিপ্লবী মতাদর্শের শুদ্ধতা বজায় রাখা ও তাকে বিকশিত করার চেয়ে অন্য কোন বিষয়ই অধিকতর গুরুত্ব দাবি করে না – গাণিতিক ঐক্য নয়, ভারসাম্যয়িত মেকি ঐক্য নয় – বিপ্লবী পার্টির লক্ষ্য হলো সর্বহারার মতাদর্শগত ঐক্য। দুই লাইনের লড়াই হলো এই ঐক্যের একটা ধাপ। সম্ভাব্য এবং অপরিহার্য ভাঙন সম্পর্কে মাও বর্ণিত "অতি সাবধানী ভীরু ভদ্রলোক"সুলভ মনোভাব দুই লাইনের লড়াইয়ের মর্মবস্তুর বিপরীতে দাঁড়িয়ে থাকে।

সঠিক পৃথকীকরণ : দুই লাইনের লড়াইয়ের ভিত্তি

সাংস্কৃতিক বিপ্লবের ১৬ দফা কর্মসূচীর ৫নং দফার শেষের দিকে বলা হয়েছে : "পার্টি বিরোধি ও সমাজতন্ত্র বিরোধি দক্ষিণপন্থী এবং যারা পার্টি ও সমাজতন্ত্রের সমর্থক হলেও এমন কিছু বলেছেন বা করেছেন যা ভুল ... এদের মধ্যে পার্থক্য টানার জন্য সর্বাধিক যত্ন নিতে হবে। অনুরূপভাবে, একদিকে প্রতিক্রিয়াশীল বুর্জোয়া পন্ডিতম্মন্য স্বৈরাচারি কর্তৃপক্ষ এবং অপরদিকে এমন সব মানুষ যারা সাধারণভবে বুর্জোয়া শিক্ষাগত ভাবধারার অনুসারী ... এদের মধ্যে পার্থক্য অনুধাবন করার জন্যও সবিশেষ যত্ন নিতে হবে" (সাংস্কৃতিক বিপ্লবের ১৬ দফা কর্মসূচী, চিনা কমিউনিষ্ট পার্টির অষ্টম কেন্দ্রিয় কমিটির প্রস্তাব, ৮ই আগষ্ট, ১৯৬৬)। কর্মসূচীর ৮নং দফায় বলা হয়েছে : "দলীয় কর্মীদের সাধারণভাবে চারভাগে ভাগ করা যায় : ক) ভাল, খ) তুলনামূলকভাবে ভাল, গ) যারা ভুলভ্রান্তি করেছে কিন্তু তথাপি দলবিরোধি, সমাজতন্ত্র বিরোধি দক্ষিণপন্থী বনে যায় নি, ঘ) স্বল্প সংখ্যক পার্টি বিরোধি, সমাজতন্ত্র বিরোধি দক্ষিণপন্থী ..."। বলা হয়েছে : "লাইনের ভুল যারা করেছেন তাদের মধ্যে রকমফের করা উচিত। যারা ভুল লাইন হাজির করেছে তাদের থেকে যারা ভুল লাইন অনুশীলন করেছে তাদের আলাদা করা উচিত। যারা সচেতনভাবে ভুল লাইন প্রয়োগ করেছে তাদের থেকে ভুল লাইন অনুশীলনকারীদের আলাদা করা উচিত। ... যারা ভুল আঁকড়ে ধরে আছে এবং যারা তা সংশোধন করতে ইচ্ছুক ও ইতিমধ্যেই সংশোধন করার দিকে চলেছেন তাদের মধ্যে তফাত করা উচিত"। এসব উদ্ধৃতি থেকে একটা বিষয় স্পষ্ট : দুই লাইনের লড়াই কখনোই কর্মীদের সম্পর্কে অগভীর সরলরৈখিক মূল্যায়নের ভিত্তিতে করা উচিত নয়। বিপ্লবী মার্কসবাদীরা বস্তুকে বিচার করেন তার গতিশীলতার মধ্যে এবং তার অভিমুখের ভিত্তিতে। দুই লাইনের লড়াইয়ের ক্ষেত্রে সঠিক পৃথকীকরণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সত্তরের দশকের বিপ্লবী সংগ্রাম কমরেড সুশীতল রায়চৌধুরির পার্টি লাইনের বিরোধীতা এবং সত্যনারায়ন-অসিত সেন–নাগি রেড্ডিদের পার্টি বিরোধীতাকে এক আসনে বসায় নি। সি পি আই (এম–এল) কমরেড সুশীতল রায়চৌধুরির বিপ্লবী সত্তাকে বরাবরই সম্মান করে এসেছে। সঠিক লাইন অনুসরণকারির মতো ভুল লাইন অনুসরণকারীরও একটা অতীত থাকে। দুই লাইনের লড়াইয়ের সময় বিপ্লবী পার্টিকে অবশ্যই এমনকি ভুল লাইনের প্রবক্তারও সমগ্র অতীতকে দ্বান্দ্বিকভাবে পর্যালোচনা করা জরুরি। তাতে করে দুটো উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে : এক, ভুল চিন্তার বিকাশপথ সম্পর্কে যথাযথ ধারণা পাওয়া যাবে। দুই, সংশ্লিষ্ট কর্মী-নেতা বর্তমানে ভুল লইন দ্বারা প্রভাবিত হলেও ভবিষ্যতে তিনি

নিজেকে শুধরাতে পারেন কিনা সে সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা করা যাবে। মতাদর্শগত সংগ্রামে বিন্দুমাত্র ঢিলা না দিয়েও একই সংগে কেডার নার্সিং প্রক্রিয়াকে সংশ্লিষ্ট কর্মীর চিন্তার একেবারে গভীরে নিয়ে যাওয়ার প্রয়াস জারি রাখতে হবে। পাশাপাশি দুই লাইনের লড়াইয়ের প্রশ্নে ইতিহাসের অভিজ্ঞতাও ভুলে মেরে দেওয়াটা ঠিক হবে না। আন্তর্জাতিক কমিউনিষ্ট আন্দোলনের বড় বড় দুই লাইনগুলি ছিল রক্তক্ষয়ী লড়াই। দুই লাইনের লড়াইয়ের একটা টার্গেট হল অনুসরণকারিদের জিতে নেওয়া। কিন্তু, তার চেয়েও বড় টার্গেট হল শোধনবাদিদের সমস্ত দিক থেকে পরাস্ত করা। এই টার্গেট পূরণে কি পদ্ধতি নিতে হবে তা নিয়ে বিতর্ক এবং আলোচনা জরুরি।

সাংস্কৃতিক বিপ্লব : দুই লাইনের লড়াইয়ের ব্যাপকতম প্রয়োগ : সর্বহারার একনায়কত্বের মাধ্যমে ব্যাপক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম

"মহান সর্বহারা সাংস্কৃতিক বিপ্লব, সর্বহারার একনায়কত্বাধীন ব্যবস্থায় ব্যাপক গণতন্ত্রের নতুন অভিজ্ঞতার জন্ম দিয়েছে, আর দিয়েছে গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতাকে বহন করে নিয়ে যাবার নতুন অভিজ্ঞতা। ....

যে ব্যাপক গণতন্ত্রকে আমরা চালিয়ে নিয়ে গেছি তার প্রয়োগ ঘটেছে সর্বহারা একনায়কত্বাধীনে। এটা হচ্ছে উচ্চমানের সত্যিকার সর্বহারা গণতন্ত্র, ইতিহাসে যা অন্তর্ভূক্ত এবং এটা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে মাও সে তুঙ-এর গণলাইনের একটি নতুন বিকাশ।...

সর্বহারা একনায়কত্ব হচ্ছে ব্যাপক গণতন্ত্রের গ্যারান্টি। এই ধরনের একনায়কত্ব ছাড়া জনগণের পক্ষে ব্যাপক গণতন্ত্র পাওয়া অসম্ভব। এবং এই একনায়কত্ব নিশ্চিত সুসংহত বলেই আমরা এই ব্যাপক গণতন্ত্রকে সাহসের সাথে গ্রহণ করেছি এবং পালন করেছি।" ("সর্বহারার একনায়কত্ব ও মহান সর্বহারা সাংস্কৃতিক বিপ্লব" : ওয়াং লি, চিয়া ই শুয়ে, লি শিন)।

সর্বহারা সাংস্কৃতিক বিপ্লব হল এক বিপুল আকারের দুই লাইনের লড়াই, যা কমরেড মাও সে তুঙের নেতৃত্বে কার্যত দেশব্যাপী এক সক্রিয় গণ আন্দোলনের চেহারা নিয়েছিল। এই বিপ্লবের অন্তর্বস্তু ছিল সর্বহারা গণতন্ত্র এবং সর্বহারা গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার হাতিয়ার হলো সর্বহারা একনায়কত্ব। "সর্বহারা গণতন্ত্র" এবং "সর্বহারা একনায়কত্ব" – এই দুইয়ের আন্তসম্পর্ক উপলব্ধি করা অত্যন্ড় জরুরি। আমরা দেখেছি যে, বুর্জোয়া তার শ্রেণি শাসন প্রয়োগ করে বুর্জোয়া একনায়কত্বের মাধ্যমে – যদিও তারা তা স্বীকার করে না। উল্টে বুর্জোয়া গণতন্ত্রের প্রতারণাময় মুখোশে তারা তাদের একনায়কত্বের আসল মুখটাকে ঢেকে রাখে। বুর্জোয়া দল এবং বুর্জোয়া গণতন্ত্রের রকমারি প্রতিষ্ঠানগুলি হল জনগণের গভীরে বুর্জোয়াদের সামাজিক প্রভাব ও ভিত্তি তৈরির প্রতিষ্ঠান। বুর্জোয়া একনায়কত্ব ছাড়া বুর্জোয়া শাসন একদিনের জন্যও টিঁকে থাকতে পারে না। একইভাবে সর্বহারার নেতৃত্বে কমিউনিষ্ট পার্টি বিপ্লবের মাধ্যমে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করলেই কমিউনিষ্ট পার্টির কাজ ফুরিয়ে যায় না। কমিউনিষ্ট পার্টিকে আরও অগ্রসর হতে হয় সর্বহারা একনায়কত্ব কায়েম করার জন্য। কারণ সর্বহারা একনায়কত্ব ছাড়া সর্বহারার সর্বাত্মক শাসন কায়েম করা একেবারেই অসম্ভব। আবার সর্বহারার সর্বাত্মক শাসন কায়েম হয় সর্বহারা গণতন্ত্রের ব্যাপক প্রয়োগের পথ ধরেই। সাংস্কৃতিক বিপ্লব এই কাজটাই করতে চেয়েছে। সাংস্কৃতিক বিপ্লব হল এক দ্বিমুখী উদ্দেশ্যসাধক বিপ্লব – একটা উদ্দেশ্য হলো সর্বহারা একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা। অন্য উদ্দেশ্য, বুর্জোয়ারা যাতে কবর থেকে নতুন করে মাথা তুলতে না পারে, জনগণের গভীরে তার মতাদর্শগত জমি তৈরি করা। একারণেই কমরেড মাও সে তুংকে বলতে হয়েছিল, "একটা বা দুটো সাংস্কৃতিক বিপ্লব নয়, দরকার এক ডজন সাংস্কৃতিক বিপ্লব"। আর ঠিক উল্টো কারণে পুঁজিবাদের পথ অনুসারী তেং শিয়াও পিং চক্রকে সাংস্কৃতিক বিপ্লবকে চিনের ইতিহাসে "বৃহত্তম বিপর্যয়" বলে ঘোষণা করে তড়িঘড়ি সমাপ্তি ঘোষণা করতে হয়। আজকের দিনে কমিউনিষ্ট পার্টিকে ব্যতিক্রমহীনভাবে মাওবাদী পার্টিই হতে হবে, কারণ মাওয়ের আগে যে আন্তসম্পর্কটি প্রধানত তত্ত্বগত আলোচনার পরিসরে সীমিত ছিল, কমরেড মাও তাকে নামিয়ে আনেন মূর্ত প্রয়োগের জমিতে : এ হল এক নতুন উচ্চতর উপলব্ধি যা অবশ্যই আজকের বিপ্লবী কমিউনিষ্ট পার্টিকে সুস্পষ্টভাবে এবং দ্বিধাহীনভাবে প্রতিফলিত করতে হবে। সোভিয়েত সমাজতন্ত্র এবং চিনা সমাজতন্ত্রের পতনের পর এই দাবি শতকরা একশ ভাগ প্রাসঙ্গিক হয়ে পড়েছে। কমরেড চারুর সংগে গলা মিলিয়ে আমাদের অবশ্যই বলতে হবে : "চিনের মহান সর্বহারা সাংস্কৃতিক বিপ্লবের পর পৃথিবীর যেকোন বিপ্লবই ঐ বিপ্লবের অংশ হয়ে পড়েছে"।

এত কথার পর যে প্রশ্ন প্রাসঙ্গিক : কমরেড মাও সত্ত্বেও চিনের রঙ বদলে গেল কেন ?

প্রশ্নটিকে আরও পিছিয়ে দেওয়া যেতে পারে। কমরেড মার্কস সত্ত্বেও শোষণমুক্ত পৃথিবী তৈরি হয় নি কেন ? কমরেড লেনিন সত্ত্বেও সোভিয়েত সমাজতন্ত্র সামাজিক সাম্রাজ্যবাদে অধ:পতিত হল কেন ? এসব প্রশ্নের সরল উত্তর হয় না। তবু সংক্ষেপে দু চার কথা বলা যায় : কোন তত্ত্ব বা তাত্ত্বিক সূত্রায়নকে সাফল্য – ব্যর্থতার মানদন্ডে বিচার করা একটি সীমিত দৃষ্টিভঙ্গী। বিচারের মানদন্ড হওয়া উচিত তত্ত্বটির মানবিক ন্যায্যতা এবং সামাজিক প্রাসঙ্গিকতা। "কি হয় বা কি হয়ে এসেছে" তা নয়, আমাদের বিচার্য "কি হওয়া উচিত এবং যা হওয়া উচিত তা কিভাবে রক্তমাংস – বাস্তবে রূপ পাবে"। এই দিক থেকে দেখলে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ–মাওবাদ নিছক "বাদ" নয় – এটি একটি Normative Science। বিজ্ঞানের সত্য বিমূর্ত বিশ্বাসের "সত্য" নয় – বিজ্ঞানের সত্য হলো বাস্তব সত্য। মার্কসবাদ–লেনিনবাদ-মাওবাদের সত্য যেহেতু শ্রেণিবিভক্ত সমাজের মধ্যেই নিহিত এবং শ্রেণিসংগ্রাম যেহেতু মানুষের ইচ্ছা নিরপেক্ষ সত্য, তাই মতবাদ হিসাবে মার্কসবাদ–লেনিনবাদ–মাওবাদ, শেষবিচারে, ব্যর্থ হতে পারে না। "শেষ বিচারে" কথাটা গুরূত্বপূর্ণ, কারণ বিপ্লব একটি নিরন্তর প্রক্রিয়া – যে প্রক্রিয়া সাম্যবাদ–বিশ্বব্যাপী সাম্যবাদ পর্যন্ত মানবসমাজের ধারাবাহিক উত্তরণের সমগ্র পর্যায়জুড়ে বিস্তৃত। রঙ বদলে যাওয়ার বাস্তবতা এবং সম্ভাবনাকে অস্বীকার করা

অবশ্যই মূর্খামি। এই বাস্তবতাকে রূখে দেবার – তাকে কার্যকরিভাবে প্রতিহত করার একটাই পথ – নিরন্তর এবং সর্বাত্মক বিপ্লব – শোষণমূলক সমাজের ভিত্তি এবং উপরিকাঠামো – উভয় ক্ষেত্রেই।

শেষের কথা :

বর্তমান প্রবন্ধে বলতে চাওয়া হয়েছে যে, মনোলিথিক পার্টি ভাবনার বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রশ্নে সর্বহারা সাংস্কৃতিক বিপ্লব একটি ক্লিয়ার ডিভাইড অর্থাৎ স্পষ্ট পার্থক্যরেখা। দুই লাইনের লড়াই এই সংগ্রামেরই একটা কার্যকর হাতিয়ার। এমন ভাবার কোন কারণ নেই যে, মাও তাঁর সঠিক সূত্র এবং কর্মপদ্ধতি জাদুকরের মতো শূন্য থেকে উদ্ভাবন করেন। কমিউনিষ্ট আন্দোলনের গৌরবময় অতীত অভিজ্ঞতাই ছিল তাঁর উৎস কেন্দ্র। এই অতীতেরই তিনি দ্বান্দ্বিকভাবে কাটা-ছেঁড়া করেছেন। অবশ্যই তাঁদের চিন্তা প্রক্রিয়ার মধ্যে ভুল ছিল এবং ভবিষ্যতের - বিশেষত নতুন প্রজন্মের কমিউনিষ্টদের এই ভুলের উর্ধ্বে উঠতেও হবে। কিন্তু, একই সংগে দুনিয়া কাঁপানো সংগ্রামে তাঁদের আকাশছোঁয়া ব্যতিক্রমী আত্মত্যাগকেও আমাদের লালসেলাম জানাতে হবে। ভুলে গেলে চলবে না স্তালিনের কথা “ঈগল কখনো কখনো মুরগির উচ্চতায় নেমে আসতে পারে, কিন্তু মুরগি কখনো ঈগলের উচ্চতায় উঠতে পারে না”।

[চ্যাং চুন চিয়াও মহান সর্বহারা সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সামনের সারির সৈনিকদের একজন ছিলেন। মাও সে তুঙের মৃত্যুর পর চিনে তেং শিয়াও পিঙের নেতৃত্বে সংগঠিত প্রতিবিপ্লবী অভ্যুত্থানের পর তাঁকে বন্দী করা হয়েছিল। তাঁর বিরুদ্ধে ব্যপক কুৎসা প্রচার অভিযান চালানো হয়েছিল। চিনকে পুঁজিবাদের পথে নিয়ে যাবার বিরুদ্ধে জেলের মধ্যেও তিনি আজীবন লড়াই চালিয়ে যান। মহান সর্বহারা সাংস্কৃতিক বিপ্লবের এই গুরুত্বপূর্ণ দলিলটি ১৯৭৫ সালে পিকিং-এর বিদেশী ভাষা প্রকাশনা থেকে পুস্তিকা আকারে প্রকাশিত হয়েছিল। পিকিং রিভিউয়ের ৪ই এপ্রিল ১৯৭৫ সংখ্যায়ও এই লেখাটি প্রকাশিত হয়েছিল। ১৯৭৫ সালে মাও সে তুং "সর্বহারা একনায়কত্বের তত্ত্বের অধ্যয়ণ এবং শোধনবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা ও রূখে দেবার" যে আন্দোলনের সূচনা করেছিলেন তার তত্ত্বগত ভিত্তিকে বুঝতে ইয়াও ওয়েন ইউয়ানের লেখা "লিন পিয়াও পার্টি বিরোধী চক্রের সামাজিক ভিত্তি প্রসঙ্গে" এবং চ্যাং চুন চিয়াওয়ের এই প্রবন্ধটি আমাদের সাহায্য করবে। তাঁর লেখা এই প্রবন্ধটি সমাজতান্ত্রিক সমাজের বিভিন্ন স্তরে চলমান শ্রেণি সংগ্রামের উপর জোর দেবার সাথে সাথে চিনে পুঁজিবাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠাকে বুঝতে সাহায্য করে। এই লেখাটিতে চ্যাং চুন চিয়াও পরিস্কারভাবে ব্যাখা করেছেন যে, মালিকানার রূপের পরিবর্তনের পরও কিভাবে সমাজতান্ত্রিক সমাজে নয়া বুর্জোয়া উপাদানদের জন্ম হয়। তিনি নয়া বুর্জোয়া শ্রেণির উদ্ভবের বস্তুগত ভিত্তিকে চিহ্নিত করেছিলেন।]

বুর্জোয়াদের উপর সর্বাত্মক একনায়কত্ব প্রয়োগ করা প্রসঙ্গে

চ্যাং চুন চিয়াও

চেয়ারম্যান মাওয়ের উদ্ধৃতি

" বুর্জোয়া শ্রেণির উপর একনায়কত্ব প্রয়োগ করার কথা লেনিন কেন বলেছিলেন ? এই প্রশ্নটিতে স্পষ্টতা অর্জন করাটা আবশ্যিক। এই প্রশ্নে স্পষ্টতার অভাব সংশোধনবাদের দিকে নিয়ে যাবে। গোটা দেশকে এই বিষয়টা জানিয়ে দেওয়া উচিত।

বর্তমানে আমাদের দেশে পণ্য ব্যবস্থা চালু আছে, মজুরি প্রণালীও অসমান, যেমন আট স্তরীয় মজুরি প্রথা এবং এই ধরনের কিছু বিষয়। সর্বহারা একনায়কত্বের অধীনে এই বিষয়গুলিকে কেবলমাত্র সীমিত করা যেতে পারে। এইজন্য যদি লিন পিয়াওয়ের মত লোকেরা ক্ষমতায় এসে যায় তাহলে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা কায়েম করা তাদের পক্ষে খুবই সহজ হবে। এই কারণেই আমাদের মার্কসবাদী লেনিনবাদী রচনাগুলিকে আরও অধ্যয়ণ করা উচিত।

লেনিন বলেছিলেন যে, "ক্ষুদ্র উৎপাদন লাগাতার, প্রতিদিন, প্রতিঘন্টায়, স্বতঃস্ফূর্তভাবে, আরো বড় আকারে পুঁজিবাদ এবং বুর্জোয়া শ্রেণির জন্ম দিতে থাকে"। তারা শ্রমিকশ্রেণি এবং পার্টি সদস্যদের একটা অংশের ভিতর থেকেও জন্ম নেয়। সর্বহারার ব্যপক অংশ এবং রাষ্ট্র ও অন্যান্য সংস্থার কর্মকর্তাদের মধ্যে এমন লোক আছে যারা বুর্জোয়া জীবনধারণের পদ্ধতি গ্রহণ করেছে।"

সর্বহারা একনায়কত্বের প্রশ্নটা এক দীর্ঘ সময় ধরে মার্কসবাদ এবং শোধনবাদের মধ্যে সংঘর্ষের কেন্দ্র হিসাবে রয়েছে। লেনিন বলেছিলেন, "কেবলমাত্র তিনিই একজন মার্কসবাদী যিনি শ্রেণি সংগ্রামের স্বীকৃতিকে সর্বহারা একনায়কত্বের স্বীকৃতি অব্দি প্রসারিত করেন"। এছাড়াও তত্ত্ব ও প্রয়োগের উভয়ক্ষেত্রেই মার্কসবাদ অনুসারে চলার ও সংশোধনবাদ অনুসারে না চলার জন্য আমাদের সক্ষম করে তোলার উদ্দেশ্যে চেয়ারম্যান মাও সর্বহারা একনায়কত্বের প্রশ্নে স্পষ্টতা অর্জনের জন্য সমগ্র দেশের কাছে আহ্বান করেছেন।

আমদের দেশ ঐতিহাসিক বিকাশের এক গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ের মধ্যে রয়েছে। দুই দশকেরও বেশি সময় যাবৎ চলা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব এবং সমাজতান্ত্রিক গঠনকার্য ও বিশেষ করে মহান সর্বহারা সাংস্কৃতিক বিপ্লবে লিউ শাও চি এবং লিন পিয়াওয়ের বুর্জোয়া সদর দপ্তর ধ্বংস করে দেবার পরিণামস্বরূপ আমাদের সর্বহারা একনায়কত্ব যে কোন সময়ের তুলনায় অনেক বেশি সুদৃঢ় হয়েছে এবং আমাদের সমাজতান্ত্রিক উদ্দেশ্য সমৃদ্ধি লাভ করছে। প্রাণশক্তিতে ভরপুর হয়ে আমাদের সমগ্র জনগণ এই শতাব্দী শেষ হবার আগেই চিনকে একটা শক্তিশালী সমাজতান্ত্রিক দেশ হিসাবে গড়ে তুলতে বদ্ধপরিকর। এই প্রচেষ্টার সময়কালে এবং সমাজতন্ত্রের গোটা ঐতিহাসিক পর্যায়ে চিনের ভবিষ্যত বিকাশের জন্য মূল প্রশ্ন এই যে, আমরা এই পুরো সময়কালজুড়ে সর্বহারা একনায়কত্বকে দৃঢ়ভাবে চালিয়ে যাব কি যাব না। বর্তমানে শ্রেণিসংগ্রামের চাহিদা এই যে, সর্বহারা একনায়কত্বের প্রশ্নটিতে আমরা স্পষ্টতা অর্জন করি। চেয়ারম্যান মাও বলেছেন, "এই প্রশ্নে স্পষ্টতার অভাব আমাদের শোধনবাদের দিকে নিয়ে যাবে"। শুধুমাত্র কিছু লোকই এই বিষয়টাকে উপলব্ধি করলে চলবে না, "গোটা দেশকে এই বিষয়টা অবশ্যই জানিয়ে দেওয়া উচিত"। এই অধ্যয়ণের ক্ষেত্রে সফলতার বর্তমান ও দীর্ঘকালীন গুরুত্বকে খাটো করে দেখলে চলবে না।

অনেকদিন আগেই, ১৯২০ সালে, মহান অক্টোবর বিপ্লবের নেতৃত্ব দেবার এবং সর্বহারার একনায়কত্বের অধীনে প্রথম রাষ্ট্রকে পরিচালনা করার বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে লেনিন তীক্ষ্নভাবে চিহ্নিত করেছিলেন যে, "সর্বহারার একনায়কত্ব হচ্ছে অপেক্ষাকৃত বেশি শক্তিশালী বুর্জোয়া শ্রেণির বিরুদ্ধে নতুন শ্রেণির সবচেয়ে দৃঢ়সংকল্প ও সবচেয়ে নির্মম যুদ্ধ। (এমনকি একটিমাত্র দেশেও) ক্ষমতা থেকে উচ্ছেদ হলে বুর্জোয়াদের প্রতিরোধ দশগুণ বেড়ে যায় এবং শুধু যে আন্তর্জাতিক পুঁজিই তার শক্তি তা নয়, শুধু যে বুর্জোয়া শ্রেণির আন্তর্জাতিক সম্পর্কগুলির শক্তি ও দীর্ঘস্থায়িত্বের মধ্যেই যে তার শক্তি তা নয়, অভ্যাসের শক্তি ও ছোটো উৎপাদনের শক্তির মধ্যেও তার শক্তি নিহিত থাকে। কারণ, দুর্ভাগ্যক্রমে ছোটো উৎপাদন দুনিয়ায় এখনো খুব বেশি ব্যাপক এবং ছোট উৎপাদন প্রতিদিন, প্রতি ঘন্টায় আপনা থেকেই পুঁজিবাদের জন্ম দেয় এবং ব্যপক হারে জন্ম দেয়। এই সমস্ত কারণে সর্বহারা একনায়কত্ব অপরিহার্য।" লেনিন বলেছেন যে সর্বহারা শ্রেণির একনায়কত্ব হচ্ছে পুরোনো সমাজের শক্তি ও ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে – রক্তক্ষয়ী এবং রক্তপাতহীন, হিংস্র এবং শান্তিপূর্ণ, সামাজিক এবং আর্থিক, শিক্ষামূলক এবং প্রশাসনিক – নিরন্তর সংগ্রাম, যার অর্থ বুর্জোয়া শ্রেণির উপর সর্বাত্মক একনায়কত্ব। লেনিন বার বার জোর দিয়েছেন যে, এক দীর্ঘকালীন, সর্বাত্মক একনায়কত্ব প্রয়োগ না করে বুর্জোয়া শ্রেণির উপর বিজয় অর্জন করা অসম্ভব। লেনিনের এই কথাগুলির, বিশেষ করে যেগুলির উপর তিনি বিশেষ জোর দিয়েছেন, সেগুলি পরবর্তী বছরগুলির প্রয়োগের মধ্যে প্রমাণিত হয়েছে। নিশ্চিতভাবেই, একের পর এক দল নয়া বুর্জোয়া উপাদান জন্ম নিয়েছে এবং বিশেষ করে ক্রুশ্চেভ – ব্রেজনেভ বেইমান চক্র তাদের প্রতিনিধিত্ব করে। সাধারণভাবে, এরা খেটেখাওয়া শ্রেণি ভিত্তি থেকে এসেছে, লালঝান্ডার তলায় লালিত পালিত হয়েছে ; তারা সাংগঠনিকভাবে কমিউনিষ্ট পার্টিতে যোগ দিয়েছে ; কলেজে প্রশিক্ষণ নিয়েছে ও তথাকথিত লাল বিশেষজ্ঞ হিসাবে তৈরি হয়েছে। যদিও এরা পুঁজিবাদের পুরানো মাটিতে গজানো নতুন বিষাক্ত আগাছা। এরা নিজেদের শ্রেণির সাথে বেইমানি করেছে, পার্টি ও রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করেছে, পুঁজিবাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছে, সর্বহারার উপর বুর্জোয়া শ্রেণির একনায়কত্বের সর্দার হয়ে বসেছে এবং সেই কাজটাই করেছে যেটা করার চেষ্টা করে হিটলার ব্যর্থ হয়েছিল। ইতিহাসের এই অভিজ্ঞতাকে কখনোই ভুললে

চলবে না যে, "মহাকাশযান আকাশে উড়ে গেল, কিন্তু লালঝান্ডা মাটিতে লুটিয়ে পড়ল"। বিশেষ করে আজকে যখন আমরা একটা শক্তিশালী দেশ গড়ে তোলার জন্য দৃঢ়সংকল্প হয়েছি তখন এই শিক্ষাকে কোনমতেই ভোলা চলবে না।

আমাদের অবশ্যই পরিস্কার ধারণা থাকতে হবে যে, এখনো চিনের শোধনবাদী হয়ে যাবার বিপদ রয়েছে। এটা শুধুমাত্র এই কারণেই নয় যে, সাম্রাজ্যবাদ ও সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ আমাদের বিরুদ্ধে হামলা ও অন্তর্ঘাত কখনো বন্ধ করবে না, শুধুমাত্র এই কারণে নয় যে চিনের পুরানো জমিদার ও পুজিঁপতিরা এখনও চারপাশে রয়েছে এবং তারা নিজেদের পরাজয় মেনে নেয় নি, বরং এই কারণেও যে নয়া বুর্জোয়া উপাদান প্রতিদিন, প্রতিঘন্টায় জন্ম নিচ্ছে – যেমনভাবে লেনিন বলেছিলেন। কিছু কমরেড এই যুক্তি দেন যে, লেনিন এটা যৌথকরণের আগের পরিস্থিতির জন্য বলেছিলেন। এই যুক্তি স্পষ্টতই ভুল। লেনিনের বক্তব্য মোটেই সেকেলে হয়ে যায়নি। এই কমরেডরা ১৯৫৭ সালে প্রকাশিত চেয়ারম্যান মাওয়ের "জনগণের মধ্যেকার দ্বন্দ্বগুলির সঠিক মোকাবিলা সম্পর্কে" লেখাটি পড়ে দেখতে পারেন। এই লেখাটিতে চেয়ারম্যান মাও নির্দিষ্ট বিশ্লেষণের মাধ্যমে এটা দেখিয়েছিলেন যে, মালিকানা ব্যবস্থার সমাজতান্ত্রিক রূপান্তরের ক্ষেত্রে, যার মধ্যে পড়ে কৃষি সমবায়ীকরণের ক্ষেত্রে সাফল্য, মৌলিক বিজয় অর্জনের পরেও চিনে এখনও শ্রেণি, শ্রেণিদ্বন্দ্ব এবং শ্রেণি সংগ্রামের অস্তিত্ব আছে এবং এখনও উৎপাদন সম্পর্ক ও উৎপাদন শক্তির ভিতর এবং অর্থনৈতিক ভিত্তি ও উপরিকাঠামোর মধ্যে সামঞ্জস্য ও দ্বন্দ্ব দুটোই মজুত আছে। লেনিনের পর সর্বহারা একনায়কত্বের নতুন অভিজ্ঞতাকে সারসংকলন করার পরই চেয়ারম্যান মাও মালিকানা ব্যবস্থায় পরিবর্তনের পর উঠে আসা বিভিন্ন প্রশ্নগুলির সুব্যবস্থিত উত্তর দিয়েছিলেন, সর্বহারা একনায়কত্বের কর্তব্য এবং কর্মনীতিগুলি নির্ধারণ করেছিলেন এবং পার্টির মৌলিক লাইন তথা সর্বহারা একনায়কত্বের অধীনে বিপ্লব চালিয়ে যাবার তত্ত্বগত ভিত্তি তৈরি করেছিলেন। গত আঠারো বছরের প্রয়োগ, বিশেষ করে মহান সর্বহারা সাংস্কৃতিক বিপ্লব প্রমাণ করে দিয়েছে যে, চেয়ারম্যান মাওয়ের বিকশিত তত্ত্ব, লাইন এবং কর্মনীতিগুলি সম্পূর্ণরূপে সঠিক।

চেয়ারম্যান মাও সাম্প্রতিককালে বলেছেন যে, "এককথায় চিন একটি সমাজতান্ত্রিক দেশ। মুক্ত হবার আগে চিন ছিল অনেকটা একটা পুঁজিবাদী দেশের মতোই। এমনকি এখনও আটস্তরীয় মজুরি প্রথা, কাজ অনুযায়ী বন্টনের প্রথা এবং মুদ্রার মাধ্যমে বিনিময় ব্যবস্থা চালু আছে এবং এসব বিষয়ে বর্তমান চিনা ব্যবস্থা পুরোনো ব্যবস্থার থেকে খুব সামান্যই আলাদা। পার্থক্য এখানেই যে, মালিকানা ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে"। চেয়ারম্যান মাওয়ের নির্দেশের গভীরতর উপলব্ধির জন্য, আসুন, আমরা চিনা মালিকানা ব্যবস্থার পরিবর্তনগুলি ও ১৯৭৩ সালে চিনের শিল্প, কৃষি ও বাণিজ্যের মধ্যেকার বিভিন্ন অর্থনৈতিক ক্ষেত্রগুলির অনুপাতের উপর নজর দিই।

প্রথমে শিল্পকে নেওয়া যাক। সমগ্র শিল্পের স্থায়ী সম্পদের মধ্যে ৯৭ ভাগ সমগ্র জনগণের মালিকানাধীন শিল্পের অধীনে রয়েছে। শিল্পে কর্মরত জনগণের ৬৩ ভাগ সমগ্র জনগণের মালিকানাধীন শিল্পে যুক্ত এবং এই শিল্পগুলির উৎপাদনের মূল্য মোট শিল্প উৎপাদনের মূল্যের ৮৬ ভাগ। সমগ্র শিল্পের স্থায়ী সম্পদের মধ্যে ৩ ভাগ অংশ যৌথ মালিকানাধীন শিল্পের আওতায় রয়েছে। শিল্পে কর্মরত জনগণের জনগণের ৩৬.২ ভাগ যৌথ মালিকানাধীন শিল্পে যুক্ত এবং এই শিল্পগুলির উৎপাদনের মূল্য মোট শিল্প উৎপাদনের মূল্যের ১৪ ভাগ। এছাড়াও, শিল্পে কর্মরত জনগণের ০.৮ ভাগ ব্যক্তিগত হস্তশিল্পী।

এবার কৃষিকে দেখা যাক। কৃষিতে ব্যবহৃত উৎপাদনের উপকরণের মধ্যে কৃষিযোগ্য জমি ও সেচ-জলনিকাশী যন্ত্রপাতির প্রায় ৯০ ভাগ এবং ট্রাকটার ও ভারবাহী পশুর প্রায় ৮০ ভাগ যৌথ মালিকানার অধীনে রয়েছে। এখানে সমগ্র জনগণের মালিকানার অংশ খুবই কম। এই জন্য দেশের শস্য ও বিভিন্ন বাণিজ্যিক ফসলের প্রায় ৯০ ভাগ যৌথ অর্থব্যবস্থা থেকে আসে। রাষ্ট্রীয় খামারগুলির ভাগ কেবলমাত্র একটা খুবই ছোট অংশ। এছাড়াও, নিজেদের ব্যক্তিগত প্রয়োজনগুলি মেটানোর জন্য কমিউন সদস্যদের নিজেদের ছোট ছোট ক্ষেত এবং ঘরোয়া গৌণ উৎপাদনের একটা সীমিত পরিমাণ এখনো টিঁকে আছে।

এবারে বাণিজ্যকে নেওয়া যাক। মোট খুচরো বিক্রির ৯২.৫ ভাগ রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যের অন্তর্গত, ৭.৩ শতাংশ যৌথ মালিকানাধীন বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানগুলির অন্তর্গত এবং ০.২ শতাংশ ব্যক্তিগত ছোট দোকানদানদের অন্তর্গত। এছাড়াও ক্রয়-বিক্রয়ের একটা ভালো পরিমাণ এখনও গ্রামীণ মেলার মাধ্যমে হয়ে থাকে।

উপরের পরিসংখ্যানগুলি দেখিয়ে দিচ্ছে যে, সমগ্র জনগণের সমাজতান্ত্রিক মালিকানা এবং মেহনতী জনগণের যৌথ মালিকানা নিশ্চিতভাবেই চিনে এক মহান বিজয় অর্জন করেছে। সমগ্র জনগণের মালিকানার আধিপত্যকারী অবস্থানের বেশ ভালোরকম বৃদ্ধি হয়েছে এবং গণ কমিউনের অর্থব্যবস্থাতেও কমিউন, উৎপাদন ব্রিগেড এবং উৎপাদন টিম -- এই তিন স্তরের মালিকানার অনুপাতের বিষয়ে কিছু পরিবর্তন হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, সাংহাইয়ের আশেপাশের এলাকাতে ১৯৭৩ সালে কমিউন স্তরের আয় মোট আয়ের ২৮.১ শতাংশ ছিল, যেটা ১৯৭৪ সালে বেড়ে মোট আয়ের ৩০.৫ শতাংশ হয়েছে, এই সময় ব্রিগেড স্তরের আয় মোট আয়ের ১৫.২ শতাংশ থেকে বেড়ে ১৭.২ শতাংশ হয়েছে এবং উৎপাদন টিমের আয়ের অংশ ৫৬.৭ শতাংশ থেকে কমে ৫২.৩ শতাংশ হয়েছে। বৃহত্তর আকার এবং সার্বজনীন মালিকানার উচ্চতর স্তরের কারণে গণ কমিউন অপেক্ষাকৃত অধিক স্পষ্টভাবে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছে। যেভাবে আমরা গত পঁচিশ বছরে ধাপে ধাপে সাম্রাজ্যবাদ, আমলাতান্ত্রিক পুঁজিবাদ এবং সামন্ততান্ত্রিক মালিকানাকে উচ্ছেদ করেছি, জাতীয় বুর্জোয়াদের মালিকানা ও ব্যাক্তিগত শ্রমিজীবীদের মালিকানাকে রূপান্তরিত করেছি এবং ব্যক্তি মালিকানার এই পাঁচটি ধরনের জায়গায় সমাজতান্ত্রিক সার্বজনীন মালিকানার দুটি ধরনকে (সমগ্র জনগণের মালিকানা ও যৌথ মালিকানা) কায়েম করেছি -- সেজন্য আমরা গর্বভরে ঘোষণা করতে পারি যে, চিনের মালিকানা ব্যবস্থা বদলে গেছে, চিনের সর্বহারা ও মেহনতী জনগণ ব্যক্তি মালিকানার শেকল থেকে নিজেদের প্রধানত মুক্ত করে নিয়েছেন এবং চিনের সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ভিত্তি ক্রমশ মজবুত হয়েছে ও বিকশিত হয়েছে। চতুর্থ জাতীয় গণ কংগ্রেসে গৃহীত সংবিধান আমাদের এই মহান বিজয়কে বিশেষভাবে চিহ্নিত করেছে।

যদিও আমাদের অবশ্যই নজরে রাখতে হবে যে, মালিকানা ব্যবস্থার প্রশ্নটির এখনও পুরোপুরি সমাধান হয়ে যায় নি। আমরা প্রায়ই বলে থাকি যে, মালিকানার প্রশ্নটা "প্রধানত সমাধান হয়ে গেছে"। এর অর্থ এই যে, এই প্রশ্নটির এখনও পুরোপুরি সমাধান হয় নি এবং মালিকানার ক্ষেত্রে বুর্জোয়া অধিকারের পুরোপুরি উচ্ছেদ এখনও হয় নি। উপরে উল্লিখিত পরিসংখ্যানগুলি স্পষ্টভাবে দেখিয়ে দিচ্ছে যে, শিল্প, কৃষি ও বাণিজ্য ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত মালিকানা এখনও অংশত টিঁকে আছে। ঐ পরিসংখ্যানগুলি আরও দেখিয়ে দিচ্ছে যে, সমাজতান্ত্রিক সার্বজনীন মালিকানার মধ্যে কেবলমাত্র সমগ্র জনগণের মালিকানাই রয়েছে এমনটা নয়, বরং দুই ধরনের মালিকানা প্রথা এর অন্তর্ভুক্ত এবং কৃষিক্ষেত্র, যা জাতীয় অর্থনীতির ভিত্তি, সেখানে সমগ্র জনগণের মালিকানা এখনও নিশ্চিতভাবেই দুর্বল। যেভাবে মার্কস ও লেনিন ভেবেছিলেন, সমাজতান্ত্রিক সমাজে মালিকানা ব্যবস্থার ক্ষেত্রে বুর্জোয়া অধিকার বিলোপের অর্থ এই যে, উৎপাদনের উপকরণ সমগ্র সমাজের

সাধারণ সম্পত্তিতে পরিবর্তিত হয়ে গেছে। স্পষ্টতই আমরা এখনও ঐ স্তরে পৌঁছই নি। মালিকানা ব্যবস্থা সম্পর্কে সর্বহারা একনায়কত্বের সামনে যে কষ্টকর কর্তব্য আছে তাকে তত্ত্ব ও প্রয়োগের উভয় ক্ষেত্রেই উপেক্ষা করাটা আমাদের উচিত নয়।

এছাড়াও, আমাদের অবশ্যই এটাও ভেবে দেখতে হবে যে, সমগ্র জনগণের মালিকানা এবং যৌথ মালিকানা -- উভয়ের সাথেই নেতৃত্বের প্রশ্নটা জড়িয়ে আছে। অর্থাৎ এই প্রশ্নটা জড়িয়ে আছে যে, নামে মাত্র নয় বরং বাস্তবে মালিকানা কোন শ্রেণির হাতে আছে।

২৪ শে এপ্রিল ১৯৬৯ সালে পার্টির নবম কেন্দ্রীয় কমিটির প্রথম বর্ধিত অধিবেশনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে চেয়ারম্যান মাও বলেছিলেন, "স্পষ্টতই, সর্বহারা সাংস্কৃতিক বিপ্লব ছাড়া আমরা কিছুই করতে পারতাম না। কারণ আমাদের ভিত্তি শক্তিশালী ছিল না। আমার নিজের পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে আমি আশঙ্কিত যে, সমস্ত অথবা ব্যপক সংখ্যাগরিষ্ঠ কারখানাতে না হলেও, বেশ ভালো সংখ্যক কারখানাতে নেতৃত্ব প্রকৃত মার্কসবাদী ও শ্রমিক জনগণের হাতে ছিল না। এরকমটা নয় যে, কারখানার নেতৃত্বে ভালো লোক ছিল না। নিশ্চয়ই ছিল। পার্টি কমিটিগুলির সদস্য, সম্পাদক, সহ সম্পাদকদের মধ্যে এবং পার্টি শাখা সম্পাদকদের মধ্যে ভালো লোক ছিল। কিন্তু, তারা লিউ শাও চির লাইনকে অনুসরণ করেছে, কেবলমাত্র বস্তুগত উৎসাহ দেওয়ার উপায় অবলম্বন করেছে, মুনাফাকে অগ্রাধিকারে রেখেছে এবং সর্বহারা রাজনীতিকে সামনে নিয়ে আসার বদলে বোনাস বিলি করেছে, ইত্যাদি"। "কিন্তু, নিশ্চিতভাবেই কারখানাগুলিতে খারাপ লোকও আছে"। " এটা দেখিয়ে দিচ্ছে যে, বিপ্লব এখনও শেষ হয় নি"। চেয়ারম্যান মাওয়ের মন্তব্য কেবলমাত্র মহান সর্বহারা সাংস্কৃতিক বিপ্লবের প্রয়োজনীয়তাকে দেখিয়ে দেয় তাইই নয়, বরং এই বিষয়টা সম্পর্কেও সচেতন হতে আমাদের সাহায্য করে যে, অন্যান্য সমস্ত সমস্যার মতই মালিকানা ব্যবস্থার সমস্যাতেও শুধুমাত্র এর রূপই নয় বরং এর বাস্তব অন্তর্বস্তুর দিকেও নজর দিতে হবে। উৎপাদন সম্পর্কের ক্ষেত্রে মালিকানা ব্যবস্থার নির্ধারক ভূমিকার বিষয়টাকে গুরুত্ব দেওয়াটা পুরোপুরি সঠিক। কিন্তু, মালিকানার বিষয়টা কেবলমাত্র বাহ্যিক রূপের দিক থেকে সমাধিত হয়েছে নাকি প্রকৃত বাস্তবে সমাধিত হয়েছে -- এই ব্যাপারটাকে কোন গুরুত্ব না দেওয়াটা ভুল। তাছাড়াও, মানুষে মানুষে সম্পর্ক ও বন্টনের রূপ – উৎপাদন সম্পর্কের অন্য এই দুটি দিক মালিকানা ব্যবস্থার উপর যে প্রভাব ফেলে তাকে গুরুত্ব না দেওয়াটা ভুল এবং অর্থনৈতিক ভিত্তির উপর উপরিকাঠামোর প্রভাবকে কোন গুরুত্ব না দেওয়াটাও ভুল। কোন কোন পরিস্থিতিতে উৎপাদন সম্পর্কের এই দুটি দিক (মানুষে মানুষে সম্পর্ক ও বন্টনের রূপ) এবং উপরিকাঠামো নির্ধারক ভূমিকা পালন করতে পারে। রাজনীতি অর্থনীতির ঘনীভূত রূপ। মতাদর্শগত ও রাজনৈতিক লাইন সঠিক না বেঠিক এবং কোন শ্রেণির হাতে নেতৃত্ব আছে -- সেটাই নির্ধারণ করে দেয় কোন্ কারখানার মালিক কোন্ শ্রেণি। কমরেডরা মনে করে দেখুন যে, আমরা কিভাবে আমলাতান্ত্রিক পুঁজি বা জাতীয় পুঁজির মালিকানার কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানকে সমাজতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেছিলাম। পার্টির লাইন ও কর্মনীতি অনুযায়ী ঐ প্রতিষ্ঠানগুলিকে রূপান্তরিত করার কাজটা আমরা কি সামরিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিনিধি বা রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধি পাঠিয়ে করি নি ? দাস প্রথার জায়গায় সামন্ততন্ত্রের অথবা সামন্ততন্ত্রের জায়গায় পুঁজিবাদের উদ্ভবই হোক, ইতিহাসে মালিকানা ব্যবস্থার প্রতিটি বড় আকারে পরিবর্তন নিশ্চিতভাবেই রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের পরই হয়েছে এবং তারপর এই রাজনৈতিক ক্ষমতাকে ব্যবহার করা হয়েছে মালিকানা ব্যবস্থায় বড় আকারে পরিবর্তন ঘটানোর জন্য ও নতুন মালিকানা ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় ও বিকশিত করার জন্য। সমাজতান্ত্রিক সার্বজনীন মালিকানার বিষয়ে এটা আরো বেশি প্রযোজ্য কারণ বুর্জোয়া একনায়কত্বের অধীনে সমাজতান্ত্রিক মালিকানা ব্যবস্থার জন্ম হতে পারে না। আমলাতান্ত্রিক পুঁজি, যারা পুরোনো চিনের আশি ভাগ শিল্পকে নিয়ন্ত্রণ করতো তাদের তখনই রূপান্তরিত করা গেছে এবং সমগ্র জনগণের মালিকানার অধীনে আনা সম্ভব হয়েছে যখন গণ মুক্তি ফৌজ চিয়াং কাই শেককে পরাজিত করেছিল। একইভাবে, পুঁজিবাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠা সব সময়ই পার্টির নেতৃত্ব দখল করা এবং পার্টির লাইন ও কর্মনীতিকে পরিবর্তনের পরই শুরু হয়। এভাবেই কি ক্রুশ্চেভ ও ব্রেজনেভ সোভিয়েত ইউনিয়নে মালিকানা ব্যবস্থার পরিবর্তন করে নি ? এভাবেই কি লিউ শাও চি ও লিন পিয়াও বিভিন্ন মাত্রায় আমাদের বেশ কিছু কারখানা ও অন্য প্রতিষ্ঠানের চরিত্রের বদল ঘটায় নি ?

এছাড়াও, আমাদের এই বিষয়টার উপরও অবশ্যই নজর দিতে হবে যে, এখনও আমরা পণ্য ব্যবস্থা চালু রেখেছি। চেয়ারম্যান মাও বলেছেন "বর্তমানে আমাদের দেশে পণ্য ব্যবস্থা চালু আছে, মজুরি প্রণালীও অসম, যেমন আটস্তরীয় মজুরি প্রথা এবং এই ধরনের কিছু বিষয়। সর্বহারা একনায়কত্বের অধীনে এই বিষয়গুলিকে কেবলমাত্র সীমিত করাই যেতে পারে। এই জন্য যদি লিন পিয়াওয়ের মত লোকেরা ক্ষমতায় এসে যায় তাহলে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা কায়েম করা তাদের পক্ষে খুবই সহজ হবে"। যে সমস্ত অবস্থার দিকে চেয়ারম্যান মাও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, সেগুলিকে খুব তাড়াতাড়ি বদলানো যাবে না। যেমন, সাংহাইয়ের পাশের এলাকার গণ কমিউনে, যেখানে তিন স্তরের মালিকানার মোট স্থায়ী সম্পদের ৩৪.২ শতাংশ কমিউনের মালিকানায়, ১৫.১ শতাংশ উৎপাদন ব্রিগেডের মালিকানায় থাকলেও এখনও মোট স্থায়ী সম্পদের ৫০.৭ ভাগ উৎপাদন টিমের মালিকানায় রয়েছে। সুতরাং আমরা যদি কেবলমাত্র কমিউনগুলির অর্থনৈতিক অবস্থাকে বিচার করি তাহলেও বুনিয়াদী হিসাব নিকাশের একক হিসাবে উৎপাদন টিমের থেকে ব্রিগেড এবং তারপর ব্রিগেড থেকে কমিউনে উত্তরণ ঘটানোর জন্য বেশ লম্বা সময়ের দরকার হবে। এছাড়াও, এমনকি যখন কমিউন বুনিয়াদী হিসাব নিকাশের একক হয়ে উঠবে তখনও মালিকানা যৌথই থেকে যাবে। এই ভাবে, যেখানে সমগ্র জনগণের মালিকানা এবং যৌথ মালিকানা পাশাপাশি রয়েছে সেখানে খুব তাড়াতাড়ি এই পরিস্থিতিতে কোন রকম মৌলিক পরিবর্তন আসবে না। যত দিন অব্দি এই দুই ধরনের মালিকানা পাশাপাশি থাকবে ততদিন পণ্য উৎপাদন, মুদ্রার মাধ্যমে বিনিময় এবং কাজ অনুসারে বন্টনের প্রথাও কায়েম থাকবে। এবং যেহেতু "সর্বহারার একনায়কত্বের অধীনে এই সমস্ত বিষয়গুলিকে কেবলমাত্র সীমিত করাই যেতে পারে" সেজন্য শহর ও গ্রামে পুঁজিবাদী উপাদানের বিকাশ ঘটতে বাধ্য এবং নয়া বুর্জোয়া উপাদান অবশ্যই গজিয়ে উঠবে। যদি এই সমস্ত বিষয়গুলিকে সীমিত না করা হয় তবে পুঁজিবাদ ও বুর্জোয়া শ্রেণির বিকাশ আরও দ্রুত গতিতে হবে। সুতরাং আমরা মালিকানা ব্যবস্থার রূপান্তরের ক্ষেত্রে একটা মহান বিজয় অর্জন করেছি এবং একটা মহান সর্বহারা সাংস্কৃতিক বিপ্লব করেছি – শুধুমাত্র এই কারণে আমাদের সতর্কতায় কোন মূল্যেই ঢিলে দেওয়া উচিত নয়। আমাদের এই ব্যাপারটিকে উপলব্ধি করতে হবে যে, আমাদের অর্থনৈতিক ভিত্তি এখনও মজবুত নয়, মালিকানা ব্যবস্থায় বুর্জোয়া অধিকারের এখনও পুরোপুরি বিলোপ হয় নি এবং মানুষে মানুষে সম্পর্কের ক্ষেত্রেও বুর্জোয়া অধিকার এখনও গুরুতর মাত্রায় রয়েছে এবং বন্টনের ক্ষেত্রে বুর্জোয়া অধিকার আধিপত্যকারী অবস্থানে রয়েছে। উপরিকাঠামোর বিভিন্ন ক্ষেত্রের মধ্যে কিছু কিছু ক্ষেত্রে এখনও বুর্জোয়ারই প্রভাবশালী অবস্থায় রয়েছে ও নিয়ন্ত্রণ করছে, কিছু কিছু ক্ষেত্রকে রূপান্তরিত করা হলেও ফলাফলগুলিকে এখনও সংহত করা হয় নি এবং পুরানো ধ্যানধারণা ও পুরানো অভ্যাসের শক্তি এখনও সমাজতান্ত্রিক নতুন বিষয়গুলির বিকাশে নাছোড়বান্দাভাবে বাধা দিচ্ছে। শহর ও গ্রামে পুঁজিবাদী উপাদানগুলির বিকাশের ফলে একের পর এক দল নয়া বুর্জোয়া উপাদানের জন্ম হয়েছে। সর্বহারা ও বুর্জোয়া শ্রেণির মধ্যে শ্রেণি সংগ্রাম, বিভিন্ন রাজনৈতিক শক্তিগুলির মধ্যে শ্রেণি সংগ্রাম, মতাদর্শগত ক্ষেত্রে সর্বহারা ও বুর্জোয়া শ্রেণির মধ্যে কঠিন শ্রেণি সংগ্রাম দীর্ঘ সময় ধরে চলতে থাকবে এবং কখনও কখনও খুবই তীব্র হয়ে উঠবে। এমনকি যখন পুরানো প্রজন্মের সমস্ত জমিদার ও পুঁজিপতিরা মরে যাবে, তখনও এরকম শ্রেণি সংগ্রাম কোনভাবেই থামবে না এবং পুঁজিবাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠা তখনও সম্ভব যদি লিন পিয়াওয়ের মত লোকেরা ক্ষমতায় আসতে পারে। "জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ যুদ্ধের বিজয়ের পরবর্তী পরিস্থিতি ও আমাদের কর্মনীতি" শীর্ষক ভাষণে চেয়ারম্যান মাও বর্ণনা করেছেন যে, ১৯৩৬

সালে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদর দপ্তরের কাছাকাছি পাও আনে একটি গ্রামে হাতেগোনা কিছু সশস্ত্র প্রতিবিপ্লবী শক্ত ঘাঁটি বানিয়ে বসে ছিল এবং গোঁয়ারের মত আত্মসমর্পণ করতে অস্বীকার করছিল। অবশেষে তাদের সোজা করার জন্য লালফৌজকে ঝড়ের মত আক্রমণ চালিয়ে ঐ গ্রামে ঢুকে পড়তে হয়েছিল। এই ঘটনার সার্বজনীন তাৎপর্য আছে, কারণ এটা আমাদের শিক্ষা দেয় যে, "সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীলরা একই রকম, যদি তোমরা তাদের উপর আঘাত না করো তবে তাদের পতন হবে না। এটা মেঝে ঝাঁট দেবার মত, যেখানে ঝাঁটা পৌঁছবে না সেখানকার ধুলো নিজে থেকেই উড়ে যাবে না"। এখনও অনেক 'সুরক্ষিত গ্রাম' টিঁকে আছে যেগুলি বুর্জোয়া শ্রেণির দখলে রয়েছে ; যখন একটা ধ্বংস হয় আরেকটা গজিয়ে ওঠে এবং যদি একটা বাদে সবকটি ধ্বংস করে দেওয়া হয় তাহলেও ঐ বাকি একটা নিজে থেকেই ধ্বংস হয়ে যাবে না, যতক্ষণ না সর্বহারা একনায়কত্বের লোহার ঝাঁটা ঐ অব্দি পৌঁছায়। লেনিনের পুরোপুরি সঠিকভাবেই বলেছিলেন "এই সব কারণে সর্বহারা শ্রেণির একনায়কত্ব জরুরি"।

ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা এটা দেখিয়ে দেয় যে, সর্বহারা শ্রেণি বুর্জোয়া শ্রেণির উপরে বিজয়ী হতে পারবে কিনা এবং চিন সংশোধনবাদী হয়ে যাবে কিনা সেটা এই বিষয়ের উপর নির্ভর করে যে, আমরা সমস্ত ক্ষেত্রে ও বিপ্লবের বিকাশের সকল স্তরে বুর্জোয়া শ্রেণির উপর সর্বাত্মক একনায়কত্ব প্রয়োগ করার কাজে অটল থাকতে পারব কিনা। বুর্জোয়া শ্রেণির উপর সর্বাত্মক একনায়কত্ব কি ? এই বিষয়টা সম্পর্কে সবচেয়ে গভীর সাধারণীকরণ ১৮৫২ সালে জে. ওয়াইডেমেয়ারকে লেখা মার্কসের একটা চিঠির একটা অংশে পাওয়া যায়। যেটাকে আমরা সকলে অধ্যয়ণ করছি। মার্কস বলেছিলেন, " আধুনিক সমাজে শ্রেণির অস্তিত্ব ও তাদের মধ্যে সংগ্রামকে আবিস্কার করার কোন কৃতিত্বই আমার প্রাপ্য নয়। বহুকাল আগেই বুর্জোয়া ঐতিহাসিকরা শ্রেণি সংগ্রামের ঐতিহাসিক বিকাশের কথা বর্ণনা করেছেন এবং বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদরা শ্রেণিগুলির গঠনসংস্থান বর্ণনা করেছেন। আমি যা নতুন করেছি তা হলো এই কথা প্রমাণ করা : (১) শ্রেণিগুলোর অস্তিত্ব শুধু উৎপাদনের বিকাশের ঐতিহাসিক স্তরের সাথে যুক্ত (২) শ্রেণি সংগ্রামকে সর্বহারা একনায়কত্বে গিয়ে পৌঁছতেই হবে (৩) সমস্ত শ্রেণির বিলোপ ও একটি শ্রেণিহীন সমাজের আবির্ভাবের উত্তরণকালে কেবলমাত্র এই একনায়কত্ব থাকবে।" লেনিন বলেছিলেন মার্কস তাঁর এই চমৎকার পর্যবেক্ষণে রাষ্ট্র সম্পর্কে বুর্জোয়াদের তত্ত্বের সাথে তাঁর নিজের তত্ত্বের প্রধান ও গুণগত পার্থক্যকে এবং রাষ্ট্র সম্পর্কে নিজের শিক্ষার সারবস্তুকে অসাধারণ স্পষ্টতার সাথে প্রকাশ করতে সফল হয়েছেন। এখানে মাথায় রাখতে হবে যে, সর্বহারা একনায়কত্ব বিষয়ে বক্তব্যকে মার্কস তিনটি বিষয়ে ভাগ করেছেন, যেগুলি অন্তর্সম্পর্কিত ও যেগুলিকে একে অপরের থেকে আলাদা করা যায় না। তিনটি বিষয়ের মধ্যে থেকে দুটিকে বাদ দিয়ে কেবলমাত্র একটাকে স্বীকার করাটা মেনে নেওয়া যায় না। কারণ তিনটি বিষয় মিলিতভাবে সর্বহারা একনায়কত্বের উৎপত্তি, বিকাশ ও বিলোপের পুরো প্রক্রিয়াটিকে প্রকাশ করে এবং সর্বহারা একনায়কত্বের সমগ্র কর্তব্য ও তার বাস্তব অন্তর্বস্তুকে সামনে আনে। "ফ্রান্সে শ্রেণি সংগ্রাম ১৮৪৮ – ১৮৫০" লেখায় মার্কস সাধারণভাবে সমস্ত শ্রেণি বিভেদকে নির্মূল করা, শ্রেণি বিভেদ যে সমস্ত উৎপাদন সম্পর্কের ভিতের উপর দাঁড়িয়ে আছে সেগুলিকে খতম করা, এই সমস্ত উৎপাদন সম্পর্কের উপর গড়ে ওঠা সমস্ত সামাজিক সম্পর্ককে নির্মূল করা এবং এই সমস্ত সামাজিক সম্পর্ক থেকে তৈরি হওয়া সমস্ত ধ্যানধারণার বিপ্লবী রূপান্তর ঘটানোর কাজের জন্য একটা উত্তরণের পর্যায় হিসাবে সর্বহারার একনায়কত্বের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আরও নির্দিষ্ট ভাবে আলোচনা করেছেন। চারটি বিষয়েই মার্কস বোঝাতে চেয়েছেন ' সমস্ত '। একটা অংশ, বড় অংশ বা এমনকি বৃহত্তম অংশও নয়, বরং সমস্তটাই। এর মধ্যে অবাক হওয়ার কিছুই নেই কারণ গোটা মানবজাতিকে মুক্ত করার মধ্যে দিয়েই সর্বহারা শ্রেণি নিজের মুক্তি অর্জন করতে পারে। এই লক্ষ্য হাসিল করার একমাত্র রাস্তা হল বুর্জোয়া শ্রেণির উপর সর্বাত্মক একনায়কত্ব প্রয়োগ করা এবং সর্বহারা একনায়কত্বের অধীনে বিপ্লবকে শেষ অব্দি চালানো, যত দিন না উপরে উল্লিখিত চার সমস্তকে পৃথিবীর বুক থেকে মুছে দেওয়া যায়, যাতে বুর্জোয়া ও অন্যান্য শোষক শ্রেণির পক্ষে টিঁকে থাকা এবং নতুন করে উদ্ভব হওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ে। সেই লক্ষ্যে পৌছানোর আগেই উত্তরণের মাঝপথে আমাদের কিছুতেই থেমে যাওয়া চলবে না। আমাদের মতে, যাঁরা এই বিষয়টাকে এইভাবে উপলব্ধি করবেন কেবলমাত্র তাঁরাই রাষ্ট্র সম্পর্কে মার্কসের শিক্ষার মর্মবস্তুকে আঁকড়ে ধরেছেন বলে ধরা যায়। কমরেডগণ, দয়া করে এই বিষয়টাকে ভাবুন ঃ যদি এই বিষয়টাকে এইভাবে উপলব্ধি না করা হয়, যদি মার্কসবাদকে তত্ত্ব ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে সীমিত, খন্ডিত ও বিকৃত করা হয়, যদি সর্বহারা একনায়কত্বকে ফাঁকা বুলিতে পরিণত করা হয়, অথবা যদি বুর্জোয়াদের উপর সর্বাত্মক একনায়কত্বকে কাঁটাছেড়া করে পঙ্গু করে দেওয়া হয় এবং যদি সমস্ত ক্ষেত্রে নয় বরং শুধুমাত্র কয়েকটি ক্ষেত্রে বা সমস্ত স্তরে নয় বরং শুধুমাত্র একটা নির্দিষ্ট স্তরে (উদাহরণস্বরূপ, মালিকানা ব্যবস্থায় রূপান্তরের আগে) সর্বাত্মক একনায়কত্বকে প্রয়োগ করা হয়, অথবা অন্যভাবে বললে যদি বুর্জোয়াদের সমস্ত 'শক্ত ঘাঁটিগুলিকে' ধ্বংস করার বদলে কয়েকটিকে ছেড়ে দিয়ে বুর্জোয়াদের পুনরায় বিস্তার ঘটানোর সুযোগ দেওয়া হয় তবে তার অর্থ বুর্জোয়া পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য জমি তৈরি করা নয় কি ? এর অর্থ কি সর্বহারা একনায়কত্ব কে এমন কিছুতে বদলে দেওয়া নয় যা বুর্জোয়াদের, বিশেষ করে নতুন করে গজিয়ে ওঠা বুর্জোয়াদের রক্ষা করবে ? সমস্ত শ্রমিক, গরিব ও নিম্ন মধ্য কৃষক ও অন্যান্য শ্রমজীবী জনগণ যাঁরা আবার নতুন করে যন্ত্রণা ও দূর্দশায় ডুবতে অস্বীকার করেন, সমস্ত কমিউনিষ্টরা যাঁরা নিজেদের জীবন সাম্যবাদের জন্য সংগ্রামে উৎসর্গ করেছেন এবং সমস্ত কমরেডরা যাঁরা চান না যে চিন শোধনবাদীতে পরিণত হোক তাঁরা মার্কসবাদের এই মৌলিক নীতিটাকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরুন : বুর্জোয়াদের উপর সর্বাত্মক একনায়কত্ব প্রয়োগ করা অপরিহার্য, একে মাঝপথে ছেড়ে দেওয়াটা কোনমতেই মেনে নেওয়া যায় না। এটা অস্বীকার করা যায় না যে, আমাদের মধ্যে এমন কিছু কমরেড আছেন যাঁরা সাংগঠনিকভাবে কমিউনিষ্ট পার্টিতে যোগদান করেছেন, কিন্তু মতাদর্শগতভাবে নয়। তাঁদের বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গী এখনও ক্ষুদ্র উৎপাদন এবং বুর্জোয়া চিন্তার গন্ডি পেরিয়ে বেরোয় নি। একটা নির্দিষ্ট স্তর পর্যন্ত ও একটা নির্দিষ্ট ক্ষেত্রের মধ্যে তাঁরা সর্বহারা একনায়কত্বকে স্বীকার করেন এবং সর্বহারা শ্রেণির কিছু কিছু বিজয়ে খুশি হন, কারণ এর থেকে তাঁদের কিছু লাভ হয় ; যখনই তাঁরা এই লাভকে গুছিয়ে নিতে পারেন তখনই তাঁরা অনুভব করেন যে এখন থিতু হবার ও নিজেদের সুখের ঘরটাকে পালক দিয়ে সাজানোর সময় এসে গেছে। বুর্জোয়াদের উপর সর্বাত্মক একনায়কত্ব কায়েম করার ব্যাপারে, দশ হাজার লী দীর্ঘ অভিযানের প্রথম পদক্ষেপের পর আরও এগোনোর ব্যাপারে তাঁরা মাফ চান, তাঁরা বলেন এসব কাজগুলো অন্যরা করুক, আমার গন্তব্যস্থল এসে গেছে, আমাকে গাড়ি থেকে নেমে যেতে হবে। আমরা এই কমরেডদের একটা ছোট পরামর্শ দিতে চাই : মাঝ রাস্তায় থেমে যাওয়াটা বিপজ্জনক। বুর্জোয়ারা আপনাদের ইশারায় ডাকছে। সময় থাকতে থাকতে মূল বাহিনীকে ধরে ফেলুন এবং এগিয়ে চলুন।

ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা আমাদের শিক্ষা দেয় যে, যখন সর্বহারা একনায়কত্ব একের পর এক বিজয় অর্জন করতে থাকে, বুর্জোয়ারা তখন উপর উপর এই একনায়কত্বকে স্বীকার করে নেবার ভান করে অথচ বাস্তবে তারা বুর্জোয়া একনায়কত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যায়। ক্রুশ্চেভ ও ব্রেজনেভ ঠিক এটাই করেছিল। তারা সোভিয়েতের নাম বদলায় নি, এমনকি লেনিনের পার্টির নাম বা "সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের" নামও বদলায়নি। কিন্তু, এই নামগুলিকে গ্রহণ করে ও খোলস হিসাবে ব্যবহার করে তারা সর্বহারা একনায়কত্ব থেকে এর বাস্তব অন্তর্বস্তুকে বের করে ফেলে দিয়ে একে একচেটিয়া পুঁজিপতি শ্রেণির একনায়কত্বে বদলে দিয়েছে যা সোভিয়েত বিরোধি, লেনিনের পার্টির বিরুদ্ধে ও সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের বিরোধি। তারা "সমগ্র জনগণের রাষ্ট্র" এবং "সমগ্র জনগণের পার্টির" শোধনবাদী কার্যক্রম তৈরি করেছে যা মার্কসবাদের প্রতি খোলাখুলি বেইমানি। কিন্তু, যখন সোভিয়েত জনগণ তাদের ফ্যাসিস্ত একনায়কত্বের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায় তখন তারা জনগণকে দমন করার জন্য সর্বহারা একনায়কত্বের পতাকা ওড়ায়। একই রকম ঘটনা চিনেও ঘটেছে। লিউ শাও চি এবং লিন পিয়াও নিজেদের শ্রেণি

সংগ্রামের বিলোপের তত্ত্ব প্রচারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখে নি, তারাও বিপ্লব দমন করার জন্য সর্বহারা একনায়কত্বের পতাকা উড়িয়েছিল। লিন পিয়াও কি তার চার "কখনো ভুলো না" উপদেশ প্রচার করেনি ? এর মধ্যে একটা উপদেশ ছিল "সর্বহারা একনায়কত্বকে কখনো ভুলো না"। সত্যিসত্যিই সে এটা "কখনো ভোলে নি", কেবলমাত্র "উচ্ছেদ করতে" শব্দটাকে জুড়ে দেবার দরকার আছে যাতে এটা হয়ে দাঁড়ায় "সর্বহারা একনায়কত্বকে উচ্ছেদ করতে কখনো ভুলো না"। অথবা, যেমনটা তার গোষ্ঠীর লোকেরা স্বীকার করেছিল "চেয়ারম্যান মাওয়ের বাহিনীর উপর আক্রমণ করার জন্য চেয়ারম্যান মাওয়ের পতাকা ওড়াও"। কখনো কখনো তারা ঢাকঢোল পিটিয়ে সর্বহারা শ্রেণির মুখোশ পরত এবং বিভ্রান্তি ছড়াতে ও অন্তর্ঘাত চালানোর জন্য "বামপন্থী" শ্লোগান তুলে অন্য সবার চেয়ে বেশি বিপ্লবী হওয়ার ভান করত। কিন্তু তারা সাধারণত সর্বহারার বিরুদ্ধে প্রতক্ষ্য প্রতিবিপ্লবী সংঘর্ষ চালাত। আপনারা কি সমাজতান্ত্রিক রূপান্তরের কাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চান ? তারা বলত নয়া গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে সুদৃঢ়করণ করতে হবে। আপনারা কি সমবায় ও কমিউন সংগঠিত করতে চান ? তারা বলত এর জন্য এখনও সময় আসে নি। যখন আপনি বলবেন যে, সাহিত্য ও শিল্পকলার বিপ্লবী রূপান্তর করা উচিত, তারা বলবে ভূত প্রেতের বিষয়ে কিছু নাটক মঞ্চস্থ করাতে কোন ক্ষতি নেই। আপনি বুর্জোয়া অধিকারকে সীমিত করতে চান ? তারা বলবে বুর্জোয়া অধিকার খুবই ভালো জিনিষ এবং এর বিস্তার ঘটানো উচিত। তারা পুরানো জিনিষগুলিকে রক্ষা করার কাজে হাত পাকানো একটা চক্র, তারা এক ঝাঁক মাছির মতো মার্কস উল্লিখিত পুরোনো সমাজের "জন্মচিহ্ন" এবং "ত্রুটি বিচ্যুতির" উপর সারা দিন ধরে ভন ভন করতে থাকে। এরা বিশেষ করে আমাদের যুবক-যুবতীদের অনভিজ্ঞতার সুযোগ নিতে ব্যস্ত থাকে, তাদের মধ্যে বস্তুগত উৎসাহের গুণগান করে এই বলে যে, এটা সয়াবীনের দুধের ভালো পনীরের মতো, যা দুর্গন্ধযুক্ত হলেও সুস্বাদু। এবং এই নোংরা কৌশলগুলি চালাবার সময় তারা লাগাতার সমাজতন্ত্রের পতাকা ওড়াতে থাকে। এরকম কিছু বদমাশ কি নেই যারা কালোবাজারি, ঘুষখোরি ও চুরি করার কাজে লেগে থাকে এবং বলে যে তারা সমাজতান্ত্রিক সহযোগিতাকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে ? অপরাধমূলক কাজে উস্কানিদাতা একরম কিছু লোক কি নেই যারা "সাম্যবাদের লক্ষ্যের জন্য উত্তরাধিকারীদের প্রতি ভালোবাসা ও যত্নশীল হবার" পতাকা উড়িয়ে যুবক-যুবতীদের মন বিষিয়ে দেবার কাজ করছে ? আমাদের অবশ্যই তাদের কৌশলগুলিকে উপলব্ধি করতে হবে এবং আমাদের অভিজ্ঞতাকে সারসংকলন করতে হবে যাতে আরও কার্যকরীভাবে বুর্জোয়াদের উপর সর্বাত্মক একনায়কত্ব প্রয়োগ করা যায়।

"আপনারা কি 'কমিউনিকরণের' (কেমিউনিকরণ বলতে জোর করে সময়ের আগেই কমিউন বানাবার কথা বলা হচ্ছে – অনুবাদক) হাওয়া তুলতে চান?"–এই রকম প্রশ্ন তুলে গুজব ছড়ানোর কৌশল আজকাল কিছু লোক নিচ্ছে। আমরা একটা পরিস্কার উত্তর দিতে পারি : কমিউনিকরণের ঐ রকম হাওয়া কখনই বইতে দেওয়া হবে না, যেরকম হাওয়া লিউ শাও চি ও চেন পো তা তুলেছিল। আমরা সব সময় এই মতামত তুলে ধরেছি যে, পণ্য উৎপাদনের লক্ষ্যে ভালো অগ্রগতির পরেও এখনও আমাদের দেশে জিনিসপত্রের পর্যাপ্ত প্রাচুর্য নেই। যতদিন না কমিউন এবং তার সাথে উৎপাদন ব্রিগেড ও উৎপাদন টিম যারা উৎপাদন করে –সমস্তটা মিলিয়ে কমিউনিকরণের জন্য ভালো পরিমাণ সামগ্রী সরবরাহ করতে পারে এবং যতদিন না সমগ্র জনগণের মালিকানার প্রতিষ্ঠানগুলি ৮০ কোটি জনগণের প্রত্যেককে তার প্রয়োজন অনুসারে বন্টনের উপযুক্ত সামগ্রী প্রচুর পরিমাণে সরবরাহ করতে না পারছে ততদিন অব্দি আমাদের পণ্য উৎপাদন, মুদ্রার মাধ্যমে বিনিময় ও কাজ অনুসারে বন্টন জারি রাখতে হবে। এই সমস্ত বিষয়গুলি থেকে তৈরি হওয়া ক্ষতিকর ব্যাপারগুলিকে আটকানোর জন্য আমরা উপযুক্ত ব্যবস্থা নিয়েছি ও আগামী দিনেও এই কাজ চালিয়ে যেতে হবে। সর্বহারা একনায়কত্ব হচ্ছে জনগণের দ্বারা একনায়কত্ব। আমরা বিশ্বাস করি যে, বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে লড়ার ও তাদের চূড়ান্তভাবে পরাজিত করার ক্ষমতা ও দক্ষতা পার্টির নেতৃত্বে ব্যাপক জনগণের আছে। পুরোনো চিন ছিল ক্ষুদ্র উৎপাদনের এক মহাসাগর। কোটি কোটি কৃষকদের মধ্যে সমাজতান্ত্রিক শিক্ষা সংগঠিত করাটা সকল সময়ই একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এবং এই কাজে কয়েক প্রজন্মের প্রচেষ্টার প্রয়োজন। কিন্তু, এই কোটি কোটি কৃষকদের মধ্যে গরিব ও নিম্ন মধ্য কৃষকরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং তাঁরা নিজেদের প্রয়োগ থেকে জানেন যে তাঁদের জন্য উজ্জল ভবিষ্যতের দিকে যাবার একমাত্র রাস্তা কমিউনিষ্ট পার্টিকে অনুসরণ করা এবং সমাজতন্ত্রের পথে অটল থাকা। পারস্পরিক সাহায্যকারী দল থেকে প্রাথমিক ও উন্নত কৃষি উৎপাদকদের সমবায় এবং তারপর গণ কমিউনের দিশায় এগিয়ে যাবার কাজে মধ্য কৃষকদের সাথে ঐক্যবদ্ধ হবার জন্য আমাদের পার্টি গরিব ও নিম্ন মধ্য কৃষকদের উপর নির্ভর করেছে এবং আমরা নিশ্চিত যে আরও এগিয়ে যাবার কাজে আমরা তাঁদের নেতৃত্ব করতে পারবো।

আমরা এই ঘটনাটার দিকে কমরেডদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই যে, এখন যে বাতাস বইছে সেটা "বুর্জোয়া হাওয়া"। যেমনটা চেয়ারম্যান মাও চিহ্নিত করেছেন যে, এটা হচ্ছে বুর্জোয়া জীবনশৈলী, এটা একটা দূষিত হাওয়া যেটা সেই 'অংশের' লোকেরা তুলছে যারা অধঃপতিত হয়ে বুর্জোয়া উপাদানে পরিণত হয়েছে। বিশেষ করে কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বস্থানীয় কর্মকর্তাদের মধ্যে থেকেই এই 'বুর্জোয়া হাওয়া' তোলা হচ্ছে এবং এটাই আমাদের পক্ষে সবচেয়ে ক্ষতিকারক। এই দূষিত বাতাসের বিষাক্ত প্রভাবে কিছু লোকের মাথায় বুর্জোয়া ধ্যান ধারণা ভরে গেছে, তারা লাভ ও পদের জন্য কামড়াকামড়ি করছে এবং এই কাজে লজ্জা পাবার বদলে গর্ব অনুভব করছে। কেউ কেউ এত দূর নিচে নেমে গেছে যে তারা সমস্ত কিছুকে, এমনকি নিজেদেরকেও, পণ্য হিসাবে দেখে। তারা কমিউনিষ্ট পার্টিতে যোগ দেয় এবং সর্বহারা শ্রেণির জন্য কাজ করে কেবলমাত্র পণ্য হিসাবে নিজেদের দাম বাড়ানোর জন্য ও সর্বহারা শ্রেণির কছে উচ্চতর মূল্য দাবি করার জন্য। এই সব লোক নামে কমিউনিষ্ট হলেও আসলে এরা নয়া বুর্জোয়া উপাদান। এদের মধ্যে অধঃপতিত এবং মুমূর্ষ বুর্জোয়া শ্রেণির সমস্ত বৈশিষ্ট্যগুলি দেখা যায়। ঐতিহাসিকভাবে, দাস মালিক, জমিদার ও পুঁজিপতি শ্রেণির যখন উত্থান হচ্ছিল তখন তারা মানবজাতির ভালোর জন্য কিছু করেছিল। কিন্তু, আজকের নয়া বুর্জোয়া উপাদানরা নিজেদের পূর্বসূরীদের উল্টো দিকে হাঁটছে। এরা "নয়া" জঞ্জালের স্তূপ ছাড়া আর কিছুই নয়, যারা মানবজাতির ক্ষতি ছাড়া আর কিছুই করতে পারে না। "কমিউনিকরণের" হাওয়া তৈরি করার ব্যাপারে যারা গুজব ছড়িয়েছিল তাদের মধ্যে ঐ নয়া বুর্জোয়া উপাদানরাও ছিল, যারা জনগণের সম্পত্তি নিজেরা দখল করেছিল এবং ভয় পাচ্ছিল যে জনগণ পুনরায় ঐ দখল করা সম্পত্তিকে তাদের থেকে কেড়ে নিয়ে কমিউনের হাতে তুলে দেবে। এছাড়াও, আরও কিছু লোক ছিল যারা এই সুযোগ ব্যবহার করে নিজেদের জন্য খনিকটা সম্পদ হাতিয়ে নিতে চাইছে। আমাদের বহু কমরেডদের তুলনায় এদের ঘ্রাণ শক্তি অনেক বেশি। আমাদের কিছু কমরেড বলেন যে, বর্তমান সর্বহারা একনায়কত্বের তত্ত্বের অধ্যয়ণ একটা "স্থিতিস্থাপক" কাজ যেটা অন্য কাজগুলির তুলনায় অগ্রাধিকার পেতে পারে, অথচ এই সমস্ত নয়া বুর্জোয়া উপাদানেরা নিজেদের সহজাত প্রবৃত্তি থেকে উপলব্ধি করেছে যে, বর্তমান অধ্যয়ণ একটা "অস্থিতিস্থাপক" বিষয় যা বুর্জোয়া ও সর্বহারা উভয় শ্রেণির সামনে একটা গুরুতর চ্যালেঞ্জ হিসাবে দাঁড়িয়ে আছে। প্রকৃতপক্ষে, তারা নিজেরাই ইচ্ছাকৃতভাবে "কমিউনিকরণের" হাওয়া তুলতে পারে অথবা দুই ধরনের দ্বন্দ্বকে গুলিয়ে দেবার জন্য আমাদের কিছু কিছু শ্লোগান ধার নিতে পারে এবং কিছু অপ্রত্যাশিত চাল চালতে পারে। এই সমস্ত কিছুর উপর নজর রাখতে হবে।

চেয়ারম্যান মাও পরিচালিত পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির নেতৃত্বে চিনের কোটি কোটি জনগণকে নিয়ে গঠিত সর্বহারা বিপ্লবের শক্তিশালী বাহিনী বলিষ্ঠভাবে বিরাট পদক্ষেপে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। সর্বহারা একনায়কত্ব প্রয়োগ করার পঁচিশ বছরের ব্যবহারিক অভিজ্ঞতার সাথে সাথে, প্যারিস কমিউনের সময় থেকে আজ অব্দি সমস্ত আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা আমাদের আছে এবং যতদিন অব্দি মনোযোগীভাবে পড়া ও অধ্যয়ণ করার কাজে, তদন্ত ও বিশ্লেষণ করার তথা অভিজ্ঞতার

সারসংকলন করার ক্ষেত্রে আমাদের পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির কয়েকশো সদস্য এবং কয়েক হাজার পুরানো ক্যাডার নেতৃত্ব দেবেন ও ব্যাপক সংখ্যক অন্যান্য কর্মী ও জনগণকে এই কাজের সাথে যুক্ত করবেন, আমরা অব্যশই চেয়ারম্যান মাওয়ের আহ্বানকে বাস্তবে রূপ দিতে পারব, সর্বহারা একনায়কত্বের প্রশ্নে স্পষ্টতা অর্জন করতে পারব এবং মার্কসবাদ–লেনিনবাদ–মাও সে তুং চিন্তাধারার নির্দেশিত পথে আমাদের দেশের বিজয় যাত্রাকে সুনিশ্চিত করতে পারব। "শেকল ছাড়া সর্বহারার হারানোর কিছুই নেই। জিতে নেবার জন্য আছে একটা গোটা দুনিয়া"। এই অসীম উজ্জল ভবিষ্যত সম্ভবনা অবশ্যই বেশি বেশি করে সচেতন হয়ে ওঠা কোটি কোটি শ্রমিক ও অন্যান্য শ্রমজীবী জনগণকে ও তাঁদের অগ্রণী কমিউনিষ্টদের প্রেরণা জোগাবে পার্টির মৌলিক লাইনকে আঁকড়ে ধরতে, প্রেরণা যোগাবে বুর্জোয়াদের উপর সর্বাত্মক একনায়কত্ব প্রয়োগ করার কাজে দৃঢ় হতে এবং সর্বহারার একনায়কত্বে বিপ্লবকে শেষ অব্দি চালিয়ে যেতে। বুর্জোয়া এবং অন্যান্য শোষক শ্রেণির বিলোপ এবং সাম্যবাদের বিজয় অনিবার্য, সুনিশ্চিত এবং এটা মানুষের ইচ্ছা নিরপেক্ষ।

চিনা বিকাশ : আজ – কাল – পরশু

বিশ্বজোড়া অর্থনৈতিক মন্দার মধ্যেও চিনের অর্থনীতি যত এগিয়েছে তার চেয়েও এগিয়েছে (?) চিনকে ঘিরে "মিডিয়া হাইপ্"। মহা সোরগোল শুরু হয়ে গেছে এই বলে যে, বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দাকে চিন এমনভাবে এড়িয়ে গেছে যে যেকোন দিন চিন আমেরিকাকে ছাপিয়ে যাবে। সময়টা ২০১৪ হতে পারে, ২০২০ – ২০৩০ – ২০৪০ বা ২০৫০ সালও হতে পারে। ওয়াল স্ট্রীট জার্নাল কিন্তু চিনের প্রায় অলৌকিক উন্নতির তলায় লুকিয়ে থাকা দ্বন্দ্বগুলির দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছে : তারা দেখছে অসংখ্য গণবিক্ষোভ (২০১০ সালে চিনে গণবিক্ষোভের সংখ্যা ২ লক্ষ ৮০ হাজার), অতি বিনিয়োগ, অব্যবহৃত উৎপাদন ক্ষমতা, দুর্বল ভোগের মাত্রা, আর্থিক বুদ্বুদ / ফানুস, কাঁচামালের অত্যধিক দাম, খাদ্যদ্রব্যের ক্রমবর্ধমান দাম, অত্যধিক কম মজুরির বিরুদ্ধে শ্রমিকদের লড়াই, চিনের জনসংখ্যার মধ্যে শোষণ করার মত কম বয়সী নারী-পুরুষের সংখ্যা কমে গিয়ে বয়স্ক লোকদের সংখ্যাবৃদ্ধি এবং বিপুল মাত্রায় পরিবেশ বিনাশ। দেখানো যায় যে, চিনের পক্ষে বিশ্ব পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে ঠেলে তোলা তো সম্ভবই নয় – উল্টে চিনের অর্থনীতি যে দিকে এগোচ্ছে তাতে বিশ্ব অর্থনীতি আরও বড় বিপদে পড়তে পারে। তার কারণ চিনের নিজস্ব দ্বন্দ্বগুলির তীব্রতা বৃদ্ধি এবং বিশ্বমন্দার প্রভাব থেকে বাঁচার জন্য চিন উন্নয়নের যে কৌশল নেয় সেটি।

চিনা অর্থনীতির হাল হকিকত

বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দার কারণে যখন চিনের রপ্তানি বাণিজ্য ধাক্কার মুখে পড়ে তখন মন্দা থেকে মুক্ত থাকতে চিন সরকার ২০০৮ সালের নভেম্বর মাসে প্রায় পঁচিশ লক্ষ কোটি টাকার এক বিশাল ঋণদানের প্যাকেজ নেয় এবং রাষ্ট্রীয় ব্যাংকগুলিকে নতুন ঋণ দেবার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ার নির্দেশ দেয়। স্থানিয়স্তরের সরকারগুলিও আবাসন নির্মাণের জন্য প্রচুর ঋণ দেয়। আন্ডারগ্রাউন্ড ছায়া ঋণদাতা সংস্থাগুলি বিপুল পরিমাণ ঋণ দিতে শুরু করে। (এই সংস্থাগুলি অনেকটা আমাদের দেশের সাহারা বা রোজভ্যালি কোম্পানির মত চিটফান্ড সংস্থা। এদের কাছে টাকা জমা রাখলে ভালো সুদ দেয় বলে চিনা জনগণ তাঁদের সঞ্চয়ের একটা বড় অংশই সরকারি ব্যাংকে না রেখে এদের কাছে জমা রাখেন। এমনকি চিনের সরকারি ব্যাংকগুলির একটা বড় ব্যবসা হলো এই সব সংস্থাকে ঋণ দেওয়া। এর ফলে এই সব ছায়া সংস্থার হাতে বিপুল পরিমাণ পুঁজি জমা হয়েছে। ২০০৮ সালের অর্থনৈতিক সংকটের সময় এরা বিভিন্ন নির্মাণ সংস্থাকে বিপুল পরিমাণ ঋণ দিতে শুরু করে।) এই বিপুল পরিমাণ ঋণের বন্যা বইয়ে দেবার ফলে ঘরবাড়ি, ফ্ল্যাট প্রভৃতি নির্মাণের জোয়ার আসে, নির্মাণ শিল্পের চাহিদা মেটাতে ইস্পাত শিল্পেও উৎপাদন ব্যাপকভাবে বেড়ে যায়। বিনিয়োগের এই বিপুল বৃদ্ধির তাৎক্ষণিক ফল হয় ২০০৯ সালের প্রথম অর্দ্ধে ৭.১ শতাংশ হারে বৃদ্ধি। জি ডি পি বৃদ্ধির হার একরকম শূন্যতেই নেমে আসতে পারতো – যদি না ঋণের বন্যা বইয়ে দিয়ে এই ধরনের বিনিয়োগ বাড়ানোর আকস্মিক বিপুল উদ্যোগ নেওয়া হত। চিনে সরকারি বিনিয়োগের বড় অংশ হলো সরকারি ব্যাংক ঋণ ও স্থানীয় স্তরে দেওয়া ঋণ। এরই পরিণতিতে শহুরে আবাসন, ফ্ল্যাটবাড়ির ব্যবসাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে আমেরিকার মতই ফাটকা সমৃদ্ধি, "চিনা ফানুস"। মাও নির্দেশিত স্বনির্ভর, গণমুখী ও ভিতরের দিকে আরও গভীরে তাকানোর উন্নয়নের পথে এগিয়ে যাবার পথ ছেড়ে বর্তমান চিন যেভাবে বিশ্ব পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে নিজেকে ঢুকিয়ে নিয়েছে তাতে গভীরতর সংকট শুধুই সময়ের অপেক্ষা। ২০১১ সালের আগষ্ট মাসে চিনের ১০টি বড় বড় নির্মাণ সংস্থা জানাচ্ছে যে, তাদের হাতে অবিক্রিত সম্পত্তির মূল্য দু লক্ষ কোটি টাকা। আগের বছরের থেকে ৪৬ শতাংশ বেশি। এই সব নির্মাণ সংস্থাগুলি যেসব আন্ডারগ্রাউন্ড ছায়া ঋণদাতা সংস্থার থেকে ঋণ নিয়েছিল তারা এখন তাদের দেওয়া ধার ফেরত চাইতে শুরু করেছে। ফলে ঐ সব নির্মাণ সংস্থাগুলি তাদের অবিক্রিত ফ্ল্যাটের দাম ২৫ শতাংশ বা তারও বেশি কমাতে শুরু করেছে। অথচ ২০০০ সালে ঐ সব সম্পত্তির দাম বেড়েছিল ৭০ শতাংশের মতো। সেজন্য চিন দেশে যে কেউ গেলেই এখন দেখতে পাবেন ছোট ছোট শূন্য বিমান বন্দর, যাত্রীশূন্য বুলেট ট্রেন, হাজার হাজার বিশাল সরকারি ভবন, ভুতুড়ে শহর ইত্যাদি। ব্যাংক ঋণের বহর ও জাতীয় আয়ের মধ্যেও লক্ষ্য করা যাচ্ছে দুস্তর ব্যবধান। ২০১০ সালে মাথাপিছু বার্ষিক ঋণের পরিমাণ যেখানে তিন লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা, সেখানে মাথাপিছু বার্ষিক জাতীয় আয় দু লক্ষ কুড়ি হাজার টাকা। আয়ের চেয়ে ঋণ বেশি হবার ফলে যারা ঋণ নিয়েছিল তারা ঋণ শোধ দিতে ব্যর্থ হতে বাধ্য। যদিও চিন সরকারের হাতে প্রচুর পরিমাণ ইউয়ান (চিনের টাকা) আছে যা দিয়ে তারা শেষ পর্যায়ের দাতার ভূমিকা নিয়ে ব্যাংকগুলিকে উদ্ধার করতে নামতে পারে। তবুও ঘর-বাড়ি, ফ্ল্যাটের দামের তীব্র হ্রাস, নির্মাণ শিল্পের সংকোচন ও ফলত জাতীয় আয়ের হ্রাস শেষ পর্যন্ত অর্থনীতির প্রতি আস্থাকে তলানিতে নামিয়ে আনতে বাধ্য। যা অর্থনীতিকে আরও গভীর সংকটের দিকে ঠেলে দেবে। অর্থনীতির বিশেষজ্ঞরা বলতে শুরু করেছেন ২০১৩ সালের পর চিনেও ঘটতে চলেছে একই ধরনের আর্থিক সংকট, ফাটতে চলেছে "চিনা ফানুস"।

চিনা অর্থনীতিতে অস্থিতির আর একটা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো জাতীয় ব্যয়ের (সাধারণভাবে বললে, যেকোন দেশের জাতীয় উৎপাদন যতটা হয় সেটাই সে দেশের জাতীয় আয় এবং সেটাই আবার জাতীয় ব্যয়। সেজন্য জাতীয় উৎপাদন, জাতীয় আয়, জাতীয় ব্যয় – এই তিনটি সমান। অর্থনীতির সূক্ষ্ম হিসাব নিকাশ বাদ দিলে এটাকেই জি ডি পি বলে।) মধ্যে পারিবারিক ভোগব্যয়ের অংশ দ্রুত কমে যাওয়া। ২০০১ সালে জাতীয় ব্যয়ে পারিবারিক ভোগের অংশ ছিল ৪৫.৩ শতাংশ, যা ২০১০ সালে ৩৩.৮ শতাংশে নেমে এসেছে। অর্থনীতিকে ভারসাম্যে পৌঁছাতে হলে জাতীয় বায়ে ভোগব্যয়ের অবদান অবশ্যই বাড়াতে হবে। ভোগব্যয় না বাড়লে বাজার তৈরি হবে না, আর বাজার তৈরি না হলে শিল্পপতিরা বিনিয়োগ করে শিল্প গড়বে না, শিল্প না হলে নতুন কাজ তৈরি হবে না, কাজ তৈরি না হলে ভোগব্যয় আরও কমবে, ফলে অর্থনীতি আরও বড় সংকটে পড়বে। ২০০৫ সাল থেকে ভোগব্যয় বাড়ানোর এই লক্ষ্য সামনে রাখলেও সরকারের অগ্রগতি আদৌ আশানুরূপ নয়। আমরা জানি যে, মাও পরবর্তি চিন অনুসরণ করে এসেছে এক অতিমাত্রায় রপ্তানি নির্ভর উন্নয়ন মডেল। রপ্তানি ক্ষেত্রের শ্রমিকরা অতি শোষণের শিকার। নতুন প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে উৎপাদন বেড়েছে খুবই দ্রুত হারে – কিন্তু মজুরি বাড়ছে খুবই ধীরগতিতে। এর কারণ জাতীয় আয়ে ভোগের অবদান বাড়ানোর লক্ষ্যে যদি মজুরি দ্রুত হারে বাড়ানো হয়, সরকারের ভয় বড় বড় বিদেশি মালিকানার শিল্পগুলি অপেক্ষাকৃত কম মজুরির দেশে সরে যাবে। সেক্ষেত্রে এই সমস্ত বিদেশি কারখানাগুলিকে ঘিরে চিনা মুৎসুদ্দি পুঁজিপতিরা যেসব ছোট ও মাঝারি শিল্প গড়ে তুলেছে সেগুলিও ধ্বসে যাবে।

জাতীয় আয়ে ভোগের অবদান ক্রমশ কমে যাবার আর একটা গুরুত্বপূর্ণ কারণ হলো জনগণের জন্য সরকারি সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থার অভাব। যার ফলে জনগণ তাঁদের ভোগের খরচ বাঁচিয়ে খুব বেশি বেশি করে সঞ্চয়ের দিকে ঝুঁকতে বাধ্য হচ্ছেন। ১৯৯৩ থেকে ২০০৮ – এই পর্বে রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে কাজ খুইয়েছেন

৬ কোটি মানুষ এবং এর বেশিরভাগটাই ঘটেছে নব্বইয়ের দশকে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন সংস্থাগুলির পুনর্গঠনের লক্ষ্যে ব্যাপক হারে ছাঁটাইয়ের সুবাদে। রাষ্ট্রীয় কারখানাগুলিকে লোহার তৈরি ভাতের থালা হিসাবে দেখার যে সমাজতান্ত্রিক নীতি মাও সে তুং চালু করেছিলেন তা কার্যত ধ্বংস করা হয়েছে। বেকারদের ভাতা, সামাজিক বীমা, পেনসন, স্বাস্থ্য পরিষেবা এবং শিক্ষা খাতে খরচ উল্লেখযোগ্যভাবে ছাঁটাই করা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে কিছু তথ্যের উল্লেখ জরুরি। ১৯৮৬ সালে সরকার জনগণের মোট স্বাস্থ্যখাতে ব্যয়ের ৩৯ শতাংশ বহন করতো। ২০০৫ সালে তা ১৮ শতাংশে নেমে এসেছে। চিকিৎসার খরচ বইতে না পেরে অসুস্থ মানুষদের অর্দ্ধেক আর ডাক্তার দেখাতেই যাচ্ছেন না। সমাজতান্ত্রিক পর্বে জনসাধারণের ৯০ শতাংশ সরকারি চিকিৎসা ব্যবস্থার আওতায় ছিলেন – এখন তা মাত্র ৪ শতাংশে নেমে এসেছে। ১৯৯১ সালে সরকার মোট শিক্ষাব্যয়ের ৮৪.৫ শতাংশ দায় বহন করতো, যা ২০০৪ সালে ৬১.৭ শতাংশে নেমে এসেছে। ১৯৮০ সালে চিনের গ্রামাঞ্চলে মাধ্যমিক স্কুল থেকে পাশ করা ছাত্র-ছাত্রীদের প্রায় ২৫ শতাংশ হাইস্কুলে যেত। ২০০৩ সালে এই অনুপাত ৯ শতাংশে নেমে এসেছে।

জাতীয় আয়ে ভোগব্যায়ের অংশ অতিদ্রুত কমে যাবার আরও একটা গুরুত্বপূর্ণ কারণ হলো ক্রমবর্ধমান বৈষম্য – যা প্রতিফলিত হচ্ছে মজুরি তহবিল কমে যাওয়াতে এবং বিপুল সংখ্যক সংখ্যাগরিষ্ঠ পরিবারের আয় কমে যাওয়াতে। জাতীয় আয়ের প্রতি ১০০ টাকার মধ্যে মজুররা তাঁদের মজুরি হিসাবে ১৯৯৮ সালে পেতেন ৫৩ টাকা। ২০০৫ সালে তা ৪১ টাকায় কমে এসেছে। মজুরদের আয় কমলে তাঁরা ব্যয় করবেন কোথা থেকে ? উল্টোদিকে বর্তমানে উপরের দিকের ১০ লক্ষ্য পরগাছার ব্যক্তিগত সম্পদের মূল্য ১.১৯ লক্ষ ডলার বা টাকার অঙ্কে ৬০ লক্ষ টাকারও বেশি। কিন্তু, শুধু এই বড়লোকদের বিলাসদ্রব্যের চাহিদা মেটানোর জন্য কারখানা খুলে অর্থনীতিকে চাঙ্গা করা সম্ভব নয়। আবার ইউরোপ, আমেরিকায় অর্থনৈতিক মন্দার কারণে রপ্তানি ভিত্তিক শিল্পের অবস্থাও ভালো নয়। এরকম অবস্থায় চিন সরকার ফ্ল্যাট বাড়ির ফাটকা ব্যবসার ফানুস তৈরি করে অর্থনীতিকে ঠেলে তোলার যে পরিকল্পনা নিয়েছে তার ভবিষ্যতও যে অন্ধকার তা আমরা আগেই আলোচনা করেছি।

চিনদেশে দ্বন্দ্ব - শ্রেণি সংগ্রামের যে ছবি ক্রমশই স্পষ্ট হচ্ছে সেটা অনেকটা এই রকম।একদিকে, শ্রেণি বিভাজন ভিত্তিক বর্তমান উৎপাদন ব্যবস্থা থেকে জন্ম নেওয়া শোষণের চূড়ান্ত রূপ এবং তার ফল বৈষম্যের আগ্রাসী থাবা। এই চিনের সাথে ৪৯ সালে আগের চিনের প্রায় কোন ফারাক নেই। এই চিন আসলে নতুন রূপে “পুরোনো চিন”। অন্যদিকে, ৪৯ সাল থেকে ৭৬ সালে মাওয়ের সময়কার সবচেয়ে বৈষম্যহীন সমাজতান্ত্রিক “নতুন চিন”। এককথায়, মাওয়ের “নতুন চিনের” সাথে দেং শিয়াও পিংদের “পুরোনো চিনের” দ্বন্দ্ব। সরকারি তথ্যই স্বীকার করছে যে, শহুরে চিনাদের উপরতলার ১০ শতাংশ বড়লোক নিচের তলার ১০ শতাংশ গরিবদের ২৩ গুণ উপার্জন করে। এর সাথে যদি ৭০ লক্ষ কোটি কালো টাকা জুড়ে দেওয়া যায় তাহলে উপর তলার ১০ ভাগ উপার্জন করছে নিচের তলার ১০ ভাগ গরিবদের ৬৫ গুণ। এশিয়ান ডেভলপমেন্ট ব্যাংকের তথ্য অনুসারে বৈষম্যের মাত্রার বিচারে পূর্ব এশিয়ার ২২টি দেশের মধ্যে চিনের স্থান দ্বিতীয়। নেপালের পরেই চিনের স্থান। বস্টন কনসাল্টিং গ্রুপের তথ্য দেখাচ্ছে যে, চিনে ২০০৫ সালে পাঁচ কোটি টাকার বেশি সম্পদ আছে এমন পরিবারের সংখ্যা আড়াই লক্ষ এবং এদের হাতে আছে গোটা দেশের মোট সম্পদের ৭০ ভাগ। সাদা বিড়াল – কালো বিড়াল তত্ত্বের প্রবক্তা বজ্জাত দেং শিয়াও পিং ও তার উত্তরসূরীরা মহান স্বপ্নদ্রষ্টা মাওয়ের মহান চিনকে কোথায় টেনে নামিয়েছে একবার ভেবে দেখুন !

অতীতের “নতুন চিন” বনাম আজকের “পুরোনো চিন”

আজকের চিনের অর্থনীতি হলো কমরেড মাও সে তুংয়ের নেতৃত্বে ১৯৪৯ সালের সফল বিপ্লব এবং সমাজতান্ত্রিক গঠনকার্যকে উল্টে দিয়ে ১৯৭৬ সালে দেং শিয়াও পিং-এর নেতৃত্বে “বিরাট বিপরীত যাত্রার” (উইলিয়াম হিন্টনের ভাষায়) ফল। কি করেছিলেন মাও ? সংক্ষেপে সেটা না বলতে পারলে আজকের চিনকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে তা কিছুতেই বোঝা যাবে না।

মাও সে তুং মানুষের সার্বিক বিকাশকে প্রধান গুরুত্ব দিয়েছিলেন। জোর দিয়েছিলেন সমাজতন্ত্রের ফসল মেহনতী মানুষের ঘরে ঘরে পৌঁছে দেওয়ার উপর। ভূমিসংস্কারের মধ্যে দিয়ে কোটি কোটি বঞ্চিত চাষির হাতে জমি তুলে দেওয়া হয়েছিল। গড়ে উঠেছিল সমবায়ের ভিত্তিতে চাষাবাদ, যেগুলি “কমিউন” গঠনের মধ্যে দিয়ে পরবর্তীতে আরও উন্নত রূপ পায়। কমিউনগুলি কেবল চাষাবাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না, কমিউনের মধ্যে বহু শিল্প-কারখানা গড়ে তোলা হয়েছিল। রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক দিক থেকেও এক একটি এককে পরিণত হয়েছিল কমিউন। দেশজোড়া এক রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্য পরিষেবা তৈরি করা হয়। অনেক রোগ বিরাটভাবে কমে যায়। বরাবরের জন্য নির্মূলও হয়ে যায় অনেক রোগ। এমন একটি প্রাণঘাতী রোগের নাম সিস্টোসোমিয়াসিস। গ্রামাঞ্চলে শিশুমৃত্যুর হার ১৯৪৯ সালে প্রতি হাজারে ২০৫ থেকে ১৯৮০ সালে হাজারে মাত্র ২২-এ নেমে আসে। একই সময়ে মৃত্যুহার হাজারে ২৮ থেকে মাত্র ৬.২-এ নেমে আসে। ১৯৪৭ সালে গড় আয়ু ছিল মাত্র ৩৫ বছর। ১৯৭৩-৭৫ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় মেয়েদের ক্ষেত্রে ৬৬.৩১ বছর এবং পুরুষদের ক্ষেত্রে ৬৩.৬২ বছর। চিনা সমাজে সামন্ততন্ত্রের শিকলে বাঁধা নির্যাতিতা মেয়েদের আয়ু এই প্রথম ছেলেদের আয়ুকে ছাড়িয়ে যায়। মাও মেয়েদের বলেছিলেন “পৃথিবীর অর্ধেক আকাশ”। মাও তাঁর বিপ্লবী প্রয়োগের জমিতে প্রমাণ করলেন তাঁরা “চিনের অর্ধেক আকাশ” হওয়ার ক্ষমতা ধরেন। ১৯৫৮ সালের “সামনের দিকে লম্বা লাফ” পর্বে ডাক্তাররা গ্রামে যেতে থাকেন – কমিউনের সদস্যদের অল্প সময়ের মধ্যে সাধারণ রোগ চিকিৎসার শিক্ষা দিতে থাকেন। ১৯৬০ সালে শুধু সাংহাইতে এমন তালিমপ্রাপ্ত স্বাস্থ্যকর্মী ছিলেন ৩৯০০, যাঁরা সাংহাই পুরসভার ২৫০০টা উৎপাদন ব্রিগেডের সাথে যুক্ত ছিলেন। ১৯৭৫ সালে চিনদেশে খালি পা ডাক্তারের সংখ্যা ছিল ১৮ লক্ষ। এঁরা ৩০ লক্ষ কৃষককে সহায়ক হিসাবে গড়ে তোলেন। পাশাপাশি শিক্ষার সুযোগ ব্যাপকভাবে বাড়ানো হয়। “লোহার তৈরি ভাতের থালা” প্রকল্প বিস্তৃত হল। এই প্রকল্পে সরকারি কলে কারখানায় স্থায়ি চাকরি, পেনসন ও অন্যান্য অধিকার নিশ্চিত করা হল। সাময়িক কিছু ওঠানামা উপেক্ষা করা গেলে মাও পর্বে চিনের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ছিল চোখে পড়ার মত। ওঠানামার কারণ পার্টির ভিতরে শোধনবাদীদের সাথে দুই লাইনের লড়াই, শোধনবাদীদের বিভ্রান্তি ছড়ানো ও অন্তর্ঘাতমূলক কার্যকলাপ, ক্রুশ্চেভ-ব্রেজনেভের

শোধনবাদী রাশিয়ার সাহায্য বন্ধ হয়ে যাওয়া এবং মাঝের কয়েক বছরে ব্যাপক বন্যা ও খরা। ১৯৬৬–১৯৭৬ পর্বে বার্ষিক গড় উন্নয়নের হার ছিল ৬ শতাংশ। শিল্প উৎপাদন বাড়ছিল বার্ষিক গড় ১০ শতাংশ হারে। একেবারে ধ্বংসস্তূপ থেকে ভারি, মাঝারি ও হাল্কা শিল্পের এক বিশাল কাঠামো গড়ে তোলা হয় এই সব বছরে। এমন এক বিপুল পরিবহন ও বিদুৎ উৎপাদন, ইস্পাত উৎপাদন কাঠামো গড়ে তোলা হয় যেখানে কাজ পায় ১০ কোটি মানুষ। সাংস্কৃতিক বিপ্লব পর্বে কৃষি উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা (একর পিছু ও শ্রমিক পিছু উৎপাদনশীলতা) পৌঁছয় উল্লেখযোগ্য উচ্চতায়। ১৯৭৭ সালে চিনে ভারতের থেকে ১৪ শতাংশ কম কৃষি জমি থাকলেও তারা আমাদের তুলনায় বার্ষিক ৩০ থেকে ৪০ শতাংশ বেশি খাদ্য উৎপাদন করে। এবং ভারতের তুলনায় ৫০ শতাংশ বেশি জনসংখ্যার মধ্যে তা সমতাভিত্তিকভাবে বন্টনও করে।

১৯৭৬–৭৭ সালে কৃষি – শিল্প – বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে দেং শিয়াও পিংয়ের চার আধুনিকীকরণের নীতি চালু করা হল। মাওকে বারবার তাঁর বিরাট বিরাট ভুলের জন্য সমালোচনা করা শুরু হল দেং শিয়াও পিংদের তরফ থেকে। সমালোচনা করা হল সামনের দিকে লাফ দিয়ে এগিয়ে চলার পর্বটিকে। সর্বহারার মহান সাংস্কৃতিক বিপ্লবকে বলা হলো “বিপুল বিশৃঙ্খলা”। বলা হল “সামনের দিকে বড় লাফ” আর সাংস্কৃতিক বিপ্লব মিলে দেশের ১৪টা মূল্যবান বছর মাঠে মারা গেছে। গণ কমিউনগুলি (যেগুলির এক একটার সদস্যসংখ্যা ছিল দশ থেকে ষাট হাজার) এবং সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন ব্রিগেডগুলি ভেঙে দেওয়া হল। ১৯৭৮ সালে দেং বলে “সত্যের একমাত্র নির্ধারক হচ্ছে অনুশীলন” – শুনতে চমৎকার হলেও আসলে ঘুরিয়ে বলা হল “নীতির দরকার নেই, যাই ফল দেবে তাইই ঠিক”। অসংখ্য মাওপন্থীকে পার্টি থেকে তাড়ানো হল বা গুমখুন করা হল। সেনাবাহিনীতে ফিরিয়ে আনা হল পদমর্যাদা অনুসারে ব্যাপক বেতন বৈষম্য। মানুষের উপর জোর না দিয়ে অস্ত্রের উপর জোরের নীতি, পাশ্চাত্য প্রযুক্তি ও অস্ত্রে সেনাবাহিনীর আধুনিকীকরণকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হল। কেন্দ্রিয় পরিকল্পনার বদলে উৎপাদন ব্যবস্থাকে অসংখ্য ভাগে টুকরো টুকরো করে ফেলা শুরু হলো। আর্থিক বৈষম্যকে উৎসাহ দেওয়া হল। ৩০০০ শিল্পের পরিচালন ব্যবস্থা স্বাধীন হয়ে গেল। বলে দেওয়া হল অর্থ উপার্জনের একমাত্র লক্ষ্য অনুসরণে তারা “স্বাধীন” ! বকলমে কারখানাগুলির মালিক হয়ে বসলো স্থানিয় পার্টি কমিটির শোধনবাদী মাথারা। মাওযুগের স্বনির্ভরতার নীতির জায়গা নিল বিদেশী প্রযুক্তি – ঋণ – বাজার ও পুঁজির সাহায্যে বড় বড় ভারি শিল্প গড়ার নীতি। ঠাট্টা করা হল মাওয়ের “বাড়ির উঠোনে ইস্পাত উৎপাদনের” স্বনির্ভরতার নীতিকে। গ্রামের উপর জোর দেবার নীতির জায়গায় এল শহর–বন্দর ভিত্তিক ও সেজ ভিত্তিক সাম্রাজ্যবাদের চাপিয়ে দেবার নীতি। গড়ে উঠতে শুরু করল গুয়াংডং–এর মত বড় বড় শহর যেখানে চাবুক মেরে শ্রমিকদের বাধ্য করা হল সামান্য মজুরিতে কাজ করে বিদেশি সাম্রাজ্যবাদী প্রভুদের জন্য অতি মুনাফার ব্যবস্থা করতে। চিনের বাজার খুলে দেওয়া হল সাম্রাজ্যবাদী হাঙর–কুমিরদের সামনে। সমাজতন্ত্রের পর্যায়ে নিরন্তর বিপ্লব চালিয়ে যাবার মাওয়ের তত্ত্বের জায়গায় এল যেকোন উপায়ে উৎপাদন বাড়ানোর নীতি। রাজনীতিকে অগ্রাধিকার দেবার বদলে বিশেষজ্ঞ হওয়াকে গুরুত্ব দেওয়া হল। আদর্শবোধের জায়গায় এল আর্থিক অনুদানের নীতি। সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পিত অর্থনীতির জায়গা নিল সাম্রাজ্যবাদ নির্দেশিত বাজার অর্থনীতি। বিদেশি পুঁজি বেনো জলের মত ঢুকতে থাকল। বিদেশিদের সাথে মিলে অসংখ্য যৌথ উদ্যোগ গড়ে তোলা হল। সরকারি কারখানার মাথায় বসানো হল পেশাদার ম্যানেজারদের যাদের আর “লাল” হওয়ার দরকার নেই। তাচাই কমিউনের মূল্যবান শিক্ষাগুলিকে “বাড়িয়ে বলা ও মিথ্যা কথা” বলে সমালোচনা করা হল। ১৯৮০ সালে কমিউনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি “পারিবারিক চুক্তি” প্রথা চালু করল। যৌথ খামারের জমি টুকরো টুকরো করে ভাগ করে দেওয়া হল বিভিন্ন পরিবারের মধ্যে। এটাই ছিল ধাপে ধাপে পুরো বেসরকারিকরণের প্রথম ধাপ। জমির খন্ডিকরণ এমন জায়গায় পৌঁছল যে তৈরি হল “নুডলের মতো ফালি ফালি জমি” (হিন্টনের ভাষায়)। কমিউনের সমস্ত যৌথ সম্পদ ভেঙে চুরে ভাগ করে দেওয়া হল। এমনকি কমিউনের স্কুল–অফিসঘর থেকে জানলা দরজা পর্যন্ত খুলে বাড়ি নিয়ে যেতে উৎসাহ দেওয়া হল। বড় বড় বিদেশি কোম্পানির বড় বড় কারখানা গড়ার ব্যবস্থা করার জন্য শুরু হল পরিবেশ ধ্বংস। আসবাবপত্রের বাজারের জন্য বহু গাছ কেটে ফেলা হল। পাহাড়ের ঢাল কাটা শুরু হল। তৃণভূমি ধ্বংসের জন্য শুরু হল পশুখাদ্যের সংকট। বেসরকারিকরণ, ব্যক্তি মালিকানা, বিদেশি বিনিয়োগের সাম্রাজ্যবাদ নির্দেশিত আমলাতান্ত্রিক পুঁজিবাদী উন্নয়নের পথে জি ডি পি ভিত্তিক কাগুজে প্রসার জমি থেকে অসংখ্য কৃষককে উচ্ছেদ করলো। শিল্পে কিন্তু তাদের ঠাঁই হলো না। নব্বইয়ের দশকের মধ্যে তৈরি হল ১০ কোটি ভবঘুরে কৃষক। উত্তর ও দক্ষিণ চিনের মধ্যে ব্যাপক বৈষম্য তৈরি হলো। দেশের ভিতর যাতায়াতের জন্যও তৈরি হল কড়াকড়ি – চালু করা হলো পরিচয় পত্র। ১৯৮৯ সালের জুন মাসে ঘটল তিয়েন আন মেন স্কোয়ারের বর্বর গণহত্যা।

সাম্রাজ্যবাদ ও তার দালাল চিনা আমলাতান্ত্রিক মুৎসুদ্দি পুঁজিপতিদের দ্বারা চিনা জনগণকে আবার নিঃস্ব সর্বহারায় পরিণত করার প্রক্রিয়া এগোয় মূলত তিনটি আলাদা আলাদা খাতে – (১) গ্রামের কমিউনগুলি ভেঙে দেওয়ার ফলে সৃষ্টি হওয়া ভবঘুরে কৃষক। (২) শহরের সরকারি কারখানাগুলিতে ব্যাপক ছাঁটাই চালানোর ফলে সৃষ্টি হওয়া কর্মহীন শ্রমিক। (৩) কমিউনের মালিকানাধীন কারখানাগুলি বন্ধ করে দেওয়ার ফলে সৃষ্টি হওয়া গ্রামীণ কর্মহীন জনগণ। প্রথমত, ১৯৮০ সালের পর ১২ কোটি মানুষ গ্রাম থেকে কাজ হারিয়ে শহরে ভিড় জমায়। শহরে তাদের বাসস্থানের অধিকারও জোটে নি। শহরে তারা রয়ে যায় দীর্ঘমেয়াদি ভবঘুরের মত। দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন সংস্থাগুলি থেকেও অসংখ্য মানুষ ছাঁটাই হয়ে মজুরি দাস সর্বহারা শ্রেণিতে যোগ দেয়। এসব সংস্থায় শোধনবাদী নেতৃত্ব চালু করে হায়ার এন্ড ফায়ার নীতি। সবচেয়ে নির্ধারক খারাপ ভূমিকা নেয় ১৯৯০–এর দশকের বিপুল শ্রমিক ছাঁটাই কর্মসূচী। ২০০০ সালের পরপর রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন কারখানাগুলিতে নতুন নিয়োগ হয়ে যায় অর্ধেকেরও কম। তৃতীয়ত, মজুরি শ্রমিকের সংখ্যা আরও বিপুলভাবে বেড়ে যায় গ্রাম ও ছোট শহরগুলিতে কমিউন মালিকানাধীন ছোট ও মাঝারি কারখানাগুলি ভেঙে দেওয়ার ফলে।

সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থে “খোলা দরজা” নীতির ছাপ্পা দিয়ে দেং ও তার উত্তরসূরীরা যে অর্থনৈতিক সংস্কার চালু করে তাকে বহুজাতিক সংস্থাগুলি দুহাত তুলে সমর্থন জানায়। ইউরোপ, আমেরিকা, জাপানের বহুজাতিক কোম্পানিগুলির পুঁজি বিনিয়োগের জন্য দরজা হাট করে খুলে দেওয়া হয়। সাম্রাজ্যবাদী পুঁজিপতিরা চিনের সস্তা শ্রমিক শোষণ করার জন্য অন্য দেশ থেকে তাদের ম্যানুফ্যাকচারিং পণ্য উৎপাদন কারখানাগুলি চিনে তুলে নিয়ে আসে। বিদেশি পুঁজির স্বার্থে চিনের

গোটা উৎপাদন কাঠামোটাকেই ক্রমশ বেশি বেশি করে ঢেলে সাজানো হতে থাকে। ২০০৯ সালে প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ প্রাপ্তির দিক থেকে পৃথিবীতে চিনের স্থান ছিল দ্বিতীয় – খোদ আমেরিকার পরেই। চিনের উন্নয়ন গবেষণা কেন্দ্রের রাষ্ট্রীয় কাউন্সিলের রিপোর্ট মোতাবেক বিদেশি পুঁজি ২০০৬ সালে চিনের যোগাযোগ ও ইলেকট্রনিক শিল্পের বাজারের ৮২ শতাংশ, যন্ত্রপাতির বাজারের ৭২ শতাংশ, কাপড় তৈরির শিল্পের ৪৮ শতাংশ, চর্মশিল্পের ৪৯ শতাংশ, আসবাবপত্রের বাজারের ৫১ শতাংশ, শিক্ষা ও খেলাধূলার সামগ্রী তৈরির বাজারের ৬০ শতাংশ, প্লাস্টিক সামগ্রীর বাজারের ৪১ শতাংশ এবং পরিবহন সামগ্রীর বাজারের ৪২ শতাংশ দখল করে নিয়েছিল। বহুজাতিক সংস্থাগুলির জটিল বিশ্বব্যাপী উৎপাদন শৃঙ্খলে চিনের প্রধান ভূমিকা হল অন্য দেশে তৈরি যন্ত্রাংশ জুড়ে (assemble) আবার অন্য দেশে বিক্রির জন্য চালান করা। সাম্রাজ্যবাদী বহুজাতিকদের কাজ হলো অন্য দেশে (বিশেষত দক্ষিণ পূর্ব ও পূর্ব এশিয়া, জাপান) তৈরি যন্ত্রাংশ চিনে আমদানি করা – তারপর সেগুলি জুড়ে জাহাজে করে অন্য দেশে বিক্রির জন্য পাঠানো। এই দিক থেকে দেখলে আমরা বাজারে যে, অসংখ্য "মেড ইন চায়না" ছাপ মারা জিনিষ পাই তার একটা বড় অংশ আসলে "চিনে জোড়া" বা Assembled in China সামগ্রী। ২০০৯ সালে চিনে একটা আই-ফোন তৈরির খরচ ১৭৯ ডলার – যা আমেরিকায় ও অন্যান্য দেশে বিক্রি হতো ৫০০ ডলারে। আই ফোনের বিভিন্ন যন্ত্রাংশ জুড়তে খরচ পড়ে ৬.৫০ ডলার। যেহেতু এর যন্ত্রাংশ জোড়ার খরচ মাত্র ৬.৫০ ডলার, ফলে অবশিষ্ট ১৭২.৫০ ডলার আসলে চিনের তৈরি করা মূল্য নয়। যে সব দেশ থেকে অ্যাপল কোম্পানি এর যন্ত্রাংশ চিনে আমদানি করেছে তাদের দেশে তৈরি যন্ত্রাংশের মিলিত মূল্য। বর্তমান চিনের অর্থনৈতিক কাঠামোটাকেই গড়ে তোলা হয়েছে চিনের সস্তা শ্রমকে কাজে লাগিয়ে বহুজাতিক সংস্থাগুলির জন্য অতি মুনাফা তৈরি করার জন্য। চিন কোন অর্থেই পৃথিবীর ফ্যাক্টরি নয় – চিন হলো পৃথিবীর অ্যাসেম্বলি হাব।

এই ব্যবস্থায় চিনের শ্রমিকরা কিভাবে শোষিত হচ্ছেন তার একটা জ্যান্ত উদাহরণ বার্বি ডল। ১৯৯৬ সালে আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়াতে একটা বার্বি পুতুলের বিক্রয় মূল্য ছিল ৯.৯৯ অর্থাৎ ১০ ডলারের কাছাকাছি। যদিও ঐ পুতুলের গায় মেড ইন চায়না ছাপ দেওয়া হয়, আসলে তার সমস্ত উপাদানই চিনে আমদানি করা হয় অন্যান্য দেশ থেকে। প্লাস্টিক রেসিন আসে তাইওয়ান থেকে। নাইলনের চুল আমদানি করা হয় জাপান থেকে। কার্ডবোর্ড প্যাকেজিং ও পুতুলকে চকচকে করার জন্য রঙ ও তেল আমদানি করা হয় আমেরিকা থেকে। শুধুমাত্র পোশাকের কটনের কাপড় যোগান দেয় চিন। চিনের দুটি বার্বি কারখানায় ১১ হাজার শ্রমিক অ্যাসেম্বলি করার ও পোশাক সেলাই করার কাজ করেন প্লাস্টিক মোল্ড ইঞ্জেকশান মেশিনের সাহায্যে এবং পুতুলে নিখুঁতভাবে রঙ করার দায়িত্বও ছিল তাঁদেরই। এক একজন শ্রমিককে মাসে দেওয়া হয় মাত্র ৪০ ডলার। এক একটা বার্বি তৈরি করতে মজুরি বাবদ খরচা পড়ে মাত্র ৩৫ সেন্ট (১০০ সেন্ট = ১ ডলার)। অর্থাৎ এক একটা বার্বি পুতুলের চূড়ান্ত খুচরো দামের অর্থাৎ ১০ ডলারের মাত্র ৩.৫ শতাংশ ! সহজ কথায় বললে, ১০০ টাকার মধ্যে সাড়ে তিন টাকা পাচ্ছে চিনের শ্রমিক। শ্রমিকদের নিংড়ে অতি মুনাফা শোষণের এর চেয়ে খারাপ দৃষ্টান্ত আর কিছু হতে পারে ? আরও একটা উদাহরণ আই ফোন। অ্যাপল্ কোম্পানি বিভিন্ন দেশ থেকে যন্ত্রাংশ এনে চিনে সেগুলিকে জুড়ে আই ফোন তৈরি করার ঠিকাদারি ফক্সকন কোম্পানিকে দেয়। শ্রমিকরা পায় ১০০ টাকার মধ্যে তিন টাকা ষাট পয়সা, আর অ্যাপল্ কোম্পানির মুনাফা দাঁড়ায় ৬৪ টাকা। এই পর্যবেক্ষণ হলো এশিয়ান ডেভলপমেন্ট ব্যাংকের। মুনাফা এত বেশি হবার কারণ স্পষ্টতই শ্রমিকদের অতি শোষণ। ২০১০ সালে ১৮ থেকে ২৫ বছর বয়সী ১৮ জন শ্রমিক ফক্সকন কারখানার মধ্যেই আত্মহত্যা করার চেষ্টা করে – তাদের মধ্যে ১৪ জন সারা জীবনের জন্য পঙ্গু হয়ে যায়। অসহনীয় কাজের পরিবেশই, কোন সন্দেহ নেই, এজন্য দায়ী।

চিনের কাই কোম্পানি আমেরিকার মাইক্রোসফ্ট কোম্পানির জন্য মালপত্র তৈরি করে। চিনে কাই কোম্পানির কারখানায় শ্রমিকদের সপ্তাহে ৮৩ ঘন্টা খাটানো হয়, যার মধ্যে সরাসরি উৎপাদনের জায়গায় থাকতে হয় ৬০ ঘন্টা। এক একটা শিফটে মাইক্রোসফ্ট কোম্পানির ২০০০ মাউস তৈরি করার জন্য শ্রমিকদের রীতিমতো যুদ্ধ করতে হতো। এক একটা শিফট শুরু হতো সকাল ৭টা ৪৫মিনিটে, শেষ রাত ১০টা ৫৫মিনিটে। ১০৫ ফুট বাই ১০৫ ফুট একটা ওয়ার্কশপে ঠাসাঠাসি করে কাজ করেন ১০০০ জন শ্রমিক। তাঁদের দেওয়া হয় ঘন্টায় ৩২.৫০ টাকা – যা থেকে কর্তৃপক্ষের দেওয়া অখাদ্য বাবদ ৬.৫০ টাকা কেটে নিয়ে হাতে দেওয়া হত ২৬ টাকা। ১৪ জন শ্রমিককে দেওয়া হত একটা করে খুপরি ঘর। অনেকটা আমাদের দেশের দুরপাল্লার ট্রেনের স্লিপার ক্লাসের থ্রি টায়ার কামরায় শোয়ার জায়গার মত বিছানায় তাঁদের গাদাগাদি করে শুতে হতো, একজন পাশ ঘুরলেই অন্যরা পড়ে যেতো। স্নান করার জন্য প্রত্যেকের জুটত এক প্লাস্টিক মগ গরম জল - যাতে এমনকি তোয়ালে ভিজিয়ে গা মোছাও যায় না।

গুয়াংডং-এর ডংগুয়ান শহরে মেইতেই প্লাস্টিকস্ এন্ড ইলেকট্রনিক্স কারখানায় কাজ করেন ২০০০ শ্রমিক, যাঁদের বেশির ভাগই মহিলা। সপ্তাহে কারখানায় থাকতে হয় ৮১ ঘন্টা। এক একটা শিফটের দৈর্ঘ্য ১২ ঘন্টা। মাসে মাত্র দুদিন ছুটি। ঘন্টায় মজুরি ৩২ টাকা – যা থেকে খাওয়া ও থাকা বাবদ মজুরি কেটে হাতে দেওয়া হয় ২৬ টাকা। অন্য শ্রমিকদের সাথে কাজ করতে করতে গল্প করলে কেটে নেওয়া হয় দেড় দিনের মজুরি। প্রতি সপ্তাহে চার দিন শ্রমিকদের কারখানায় বন্দি রেখে দেওয়া হয় এবং এমনকি হাঁটতেও দেওয়া হয় না। খাবার বলতে প্রতিদিন সকালে জলের মত পাতলা ভাতের মাড়। শুক্রবারে জোটে একটুকরো মুরগীর মাংস। শোওয়া ও স্নানের ব্যবস্থা কাই কারখানার মতোই। প্রত্যেককে ওভারটাইম বিনা মজুরিতে কারখানা ও নিজেদের শোয়ার জায়গা পরিস্কার করার কাজ বাধ্যতামূলকভাবে করতে হতো। কাজের শেষে শুতে যাবার পথে ঘাসে পা পড়লেই ফাইন করা হত। এবং এই মিথ্যা অজুহাতে প্রত্যেক শ্রমিকের কাছ থেকে তাঁদের মজুরির ১৪ থেকে ১৯ শতাংশ ঠকিয়ে কেটে নেওয়া হত।

সবচেয়ে খারাপ অবস্থা 'সেজ' অঞ্চলগুলিতে। এসব এলাকায় গড়ে দিনে ১৪ ঘন্টা করে খাটতে হয়। মাসে এক দিন ছুটি দেওয়া হয়। মাসিক গড় বেতন ৬০ ডলার অর্থাৎ ৩০০০ টাকারও কম। উপরিপাওনা হল উঠতে বসতে গালি গালাজ আর বাধ্যতামূলক শরীর তল্লাশ। শ্রমিকদের জন্য সামাজিক সুরক্ষার কোন আইন নেই। আক্ষরিক অর্থে শ্রমিকদের প্যাকিং বাক্সের মতো ঘরে থাকতে হয়। ইন্টারন্যাশানল টেক্সটাইল, গারমেন্টস অ্যান্ড লেদার ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সাধারণ

সম্পাদক নিল কেয়ারমি বলেছেন যে, এসব ঘরগুলির সাথে নাৎসি জমানার কনসেনট্রেশন ক্যাম্পের কোন তফাত নেই। এমনকি শ্রমিকদের জন্য শৌচাগারের মতো ন্যূনতম সুযোগ পর্যন্ত নেই। ১৯৮২ সালের নতুন সংবিধানে ধর্মঘট করার অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়। দেশজোড়া প্রতিবাদের মুখে পড়ে অবশ্য সরকার কিছুটা পিছিয়ে যায়। ঘোষণা হয় যে, ১৯৮৪-র অক্টোবরের পর থেকে চুক্তিতে শ্রমিক নিয়োগ করা হবে। ১৯৮৪ সালে ইতিপূর্বে তৈরি চারটি সেজের ভৌগলিক সীমানা বাড়ানো হয় এবং আরও ১৪টি সেজ তৈরি হয়। চিনের সমস্ত উপকূল এলাকাতে এক সমান্তরাল অর্থনৈতিক ব্যবস্থা চালু করা হয় এবং মডেল হিসাবে তুলে ধলা হয় শেনজেন সেজের তথাকথিত সাফল্যকে।

ডংগুয়ান শহরের ইউওয়েই প্লাস্টিক এন্ড হার্ডওয়্যার প্রোডাক্ট কোম্পানি তার শ্রমিকদের দেয় ঘন্টায় ৪০ টাকা। খাটায় ১৪ ঘন্টা। ব্যস্ত মরশুমে তাঁদের মাসে তিরিশ দিনই খাটতে হয়। কাজ করতে করতে ২০০৯ সালের মার্চ মাসে একজন শ্রমিকের তিনটি আঙুল কাটা পড়ে। আঙুল প্রতি ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয় আড়াই হাজার ডলারের কিছু কম !

চিনের পৌ ইউয়েন শহরে তাইওয়ানের পৌ চেন কোম্পানির মালিকানাধীন প্ল্যান্ট এফ কারখানায় জার্মানির খেলাধূলার জিনিস তৈরির কোম্পানি পুমার জন্য জুতো ও অন্যান্য খেলাধূলার জিনিস তৈরি হয়। সমীক্ষায় প্রাপ্ত কিছু তথ্য :

(১) একজোড়া পুমা স্নিকার জুতো তৈরি করতে মজুরি বাবদ ব্যয় মাত্র ৫৮ টাকা, অথচ বাজারে একজোড়া স্নিকারের দাম ৩৫০০ টাকা। অর্থাৎ মজুরি বাবদ ব্যায় স্নিকারের খুচরো দামের ১.৬৬ শতাংশ।

(২) ৩৫০০ টাকা দামের মধ্যে পুমা কোম্পানির মুনাফা ১৭০০ টাকা। অর্থাৎ বিক্রয়মূল্যের প্রায় ৫০ ভাগ।

(৩) পুমার ঘন্টা প্রতি মুনাফা শ্রমিকদের প্রাপ্ত মজুরির ২৩ গুণেরও বেশি।

(৪) সারা বছর পুমার জুতো তৈরির শ্রমিকরা যা মজুরি পায় তার সমান মূল্য তারা তৈরি করে ফেলেন বছরের প্রথম সপ্তাহের ৫ দিন ২ ঘন্টার মধ্যেই ! কল্পনা করা যায় শ্রমিকরা কি বিপুল মাত্রার অতি মুনাফা তৈরি করছেন রক্তশোষক বহুজাতিক সংস্থার মালিকদের জন্য ?

(৫) প্ল্যান্ট এফ-এ দিনে সাড়ে তের থেকে সাড়ে ষোল ঘন্টা শ্রমিকদের খাটতে হয়। মাসে খুব বেশি হলে ৪ দিন ছুটি। যদি ধরে নিই শ্রমিকরা দিনে সাড়ে তের এবং সাড়ে ষোল ঘন্টার গড় অর্থাৎ ১৫ ঘন্টা খাটছেন, তাহলে মাসে ৪ দিন অর্থাৎ বছরে ৪৮ দিন বাদ দিয়ে শ্রমিকরা বাকি ৩১৭ দিন খাটছেন। তাহলে বছরে তাঁরা মোট ৩১৭ × ১৫ = ৪৭৫৫ ঘন্টা খাটছেন। প্রাপ্ত মজুরির জন্য তাঁদের খাটনির সময় = ১৫ ঘন্টা × (৫ দিন + ২ ঘন্টা) = ৭৭ ঘন্টা। অর্থাৎ প্রয়োজনীয় শ্রম সময় ৭৭ ঘন্টা, উদ্বৃত্ত শ্রম সময় ৪৭৫৫ − ৭৭ = ৪৬৭৮ ঘন্টা। সোজা হিসাবটা হল তাঁরা সাম্রাজ্যবাদী প্রভুদের জন্য বছরে ৪৬৭৮ ঘন্টা খাটছেন। শতকরা হিসেবে মোট শ্রম সময়ের মাত্র ১.৬৫ শতাংশ শ্রমিকরা খাটছেন নিজেদের ও তাঁদের পরিবারকে কোন রকমে বাঁচিয়ে রাখার জন্য। বাকি ৯৮.৩৫ শতাংশ মালিকদের জন্য। এই শ্রমিকদের পূর্বসূরীরা একদিন রক্ত দিয়ে মাও সে তুংয়ের নেতৃত্বে বিপ্লব করে চিনকে মুক্ত করেছিলেন ও গোটা দুনিয়াকে নতুন রাস্তা দেখিয়েছিলেন। আর আজ সাম্রাজ্যবাদীরা আবার ১৯৪৯ সালের আগের মত শ্রমিকদের রক্ত শুষে নিচ্ছে। এটা হতে পারছে কারণ রাষ্ট্র ক্ষমতায় আর শ্রমিকশ্রেণি নেই। ১৯৭৬ সালে মাওপন্থীদের হত্যা করে, জেলে পুরে শোধনবাদী দেং ও তার আমচা চামচারা পার্টি ও রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করেছিল। শ্রমিকদের এই ভয়ানক শোষণের জন্য গদ্দার দেং ও তার বংশধরদের একশ ফুট মাটির নিচে কবর দিলেও উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া হয় না !

উদাহরণ বাড়িয়ে লাভ নেই : সরলীকরণের বিন্দুমাত্র ঝুঁকি না নিয়েই বলা যায় যে, শ্রমশক্তির এই ধরনের অতি শোষণ হল সাম্রাজ্যবাদী অতি মুনাফা নিংড়ানোর পদ্ধতি। চিনা মুৎসুদ্দি আমলাতান্ত্রিক পুঁজিবাদীরা এই বিপুল অতি মুনাফার ভাগ পেলেও এর অধিকাংশটাই চলে যাচ্ছে সাম্রাজ্যবাদী বহুজাতিক কোম্পানির হাঁ মুখে। সেজন্য চিনের অস্বাভাবিক বিকাশ হলো সাম্রাজ্যবাদের গড়ে তোলা বিশ্বজোড়া শোষণ কাঠামোর পরিণতি।

চিনদেশে শ্রমিকদের অতি শোষণের বাস্তবতাকে বুঝতে হলে "ভাসমান জনসংখ্যা" সম্পর্কে যথাযথ ধারণা জরুরি। চিন দেশে প্রত্যেক নাগরিককে তাঁদের জন্মস্থানের ভিত্তিতে একটি রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট (চিনা ভাষায় হুকৌউ) দেওয়া হয়। বহিরাগত শ্রমিক বলা হয় তাঁদের যাঁরা দেশের ভিতরেই তাঁদের জন্মস্থানের বাইরে বাস করেন। চিনে বর্তমানে এরকম বহিরাগত শ্রমিকের সংখ্যা ১৬ কোটি। ম্যানুফ্যাকচারিং এবং নির্মাণ ক্ষেত্রে গ্রামীন বহিরাগতের অনুপাত যথাক্রমে ৭০ এবং ৮০ ভাগ। এঁরা সাধারণ শ্রমিকের থেকে ৫০ ভাগ বেশি সময় ধরে কাজ করেন অথচ মজুরি পান জাতীয় শহুরে গড় মজুরির চেয়ে অনেক কম। এঁদের অবস্থা খুবই খারাপ। শহুরে শ্রমিকদের অন্যান্য সুযোগসুবিধা কোন কিছুই এঁরা পান না। এঁদের শ্রমসময় এতই অস্বাভাবিক দীর্ঘ যে খুব সহজেই এঁরা শিল্প দুর্ঘটনার শিকার হন। সরকারি তথ্য অনুসারে ২০১০ সালে ৩,৬৩,৩৮৩ টি দুর্ঘটনা ঘটেছে, যাতে মারা গেছেন ৭৯,৫৫২ জন শ্রমিক। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দুর্ঘটনায় মৃতরা হলেন বহিরাগত শ্রমিক। শ্রমিকশ্রেণির মজুত বাহিনী সম্পর্কে মার্কসের বিশ্লেষণের অনুসরণে এই বহিরাগত শ্রমিকদের মজুত বাহিন হিসাবে দেখা যেতে পারে, কিন্তু এঁদের একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে। সেটি হল এঁদের গ্রামে জমির সাথে স্থায়ী সংযোগ – যা তাঁদের মধ্যে দরিদ্র ও ভূমিহীন কৃষকের চরিত্রকেও দেখিয়ে দেয়। এখনও গ্রামাঞ্চলে নাম-কা-ওয়াস্তে কিছু সমবায় টিঁকে থাকার কারণে তাঁরা গ্রামে সামান্য কিছু জমি চাষ করার অধিকার পেয়ে থাকেন। পার্টির নেতা ও সমবায়ের মাথা – চিনের গ্রামের এই নয়া শাসকরা এই সমস্ত দরিদ্র কৃষকদের এতটাই ভীষণ শোষণ করে যে জমির আয়ে তাঁদের সংসার চালানো সম্ভব হয় না। ফলে তাঁরা বাধ্য হন শহরে

এসে সস্তা শ্রমিক হিসাবে কাজ করতে। তাই এঁরা দুদিক থেকেই শোষিত হন – একদিকে, গরিব কৃষক হিসাবে। গ্রামের নয়া শাসকরা তাদের রাজনৈতিক ক্ষমতার জোরে এই সব গরিব কৃষকদের থেকে উদ্বৃত্ত নিংড়ে নেয়। (চিনের গ্রামের এই নয়া শাসকদের চরিত্র অনেকটা আমাদের পশ্চিমবাংলার সি পি এম আমলে তৈরি হওয়া নয়া জোতদারদের মত। আমাদের নয়া জোতদাররা যেমন পার্টির নেতা ও পঞ্চায়েতের মাথা হবার সুবাদে এলাকার উপর কর্তৃত্ব চালায়, এলাকার অধিকাংশ জমি, ফসলের পাইকারি ব্যবসা, সুদের কারবার প্রভৃতির উপর নিয়ন্ত্রণের জোরে কৃষকদের থেকে উদ্বৃত্ত নিংড়ে নেয়, চিনের গ্রামের নয়া শাসকরা অনেকটা একই পদ্ধতি অনুসরণ করে। আমাদের জোতদাররা যেমন গ্রামে সাম্রাজ্যবাদী ও আমলাতান্ত্রিক পুঁজির অনুপ্রবেশের হাতিয়ার হিসাবে কাজ করে, ঠিক একই ভূমিকা চিনের গ্রামের নয়া শাসকরা পালন করে। চিনের গ্রামের এই নয়া শাসকদের চরিত্র নিয়ে পরবর্তী কোন লেখায় বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।) অন্যদিকে, শহরের শিল্পে সস্তা শ্রমিক হিসাবে। সাম্রাজ্যবাদ নির্দেশিত অর্থনৈতিক সংস্কারের পর্বে রাষ্ট্রীয় সহায়তা যত উঠে গেছে, ততই গ্রামীণ ভাসমান শ্রমিক একটি স্পষ্টতর অর্থনৈতিক বাস্তবতা হিসাবে উঠে এসেছে। যেহেতু শহরে তাঁরা স্থায়ী বাসিন্দার স্বীকৃতি এবং তার সাথে সম্পর্কিত সুযোগ সুবিধা পান না, ফলে তাঁদের মাঝে মাঝেই গ্রামে ফিরে আসার শক্তিশালী প্রবণতা থাকে। ২০০৭ – ২০০৯ সালের বিশ্ব পুঁজিবাদী সংকটের সময় গ্রাম থেকে শহরে শ্রমিক চলাচল উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যায়। কারণ এই সময় চিনের রপ্তানি মার খাওয়ায় শহরে কাজের সুযোগ কমে যায়।

বহিরাগত শ্রমিক নিয়োগের ব্যয় কম এবং বাইরের লোক হওয়ায় সংগঠিত শক্তি কম থাকার জন্যে যথেচ্ছ শোষণ করার সুবিধার কারণে উৎপাদনে নিযুক্ত হন এঁদের মধ্যেকার প্রধানত যুবকরা, যাঁদের শ্রমশক্তিকে নিবিড়ভাবে কাজে লাগিয়ে অতি মুনাফার পরিমাণ বাড়ানো যায়। এঁদের মধ্যে গ্রামের প্রতি গভীর নাড়ির টান থাকায় তাঁদের সহজেই সরিয়ে দিয়ে নতুন উদ্যমী বহিরাগত যুবকদের তাদের জায়গায় ঢোকানো যায়। বস্তুত আশি ঘন্টার বেশি শ্রমসপ্তাহ, উৎপাদনের অস্বাভাবিক দ্রুতগতি, খুবই নিম্নমানের খাবার ও থাকার জায়গা ইত্যাদি হল এমন সমস্যা যা দীর্ঘদিন ধরে চললে শ্রমিকের দৈহিক শক্তি ক্ষয়ে যেতে বাধ্য। এক্ষেত্রে অল্পবয়সী যুবক শ্রমিকরাই হল নিয়োগকারী পুঁজিপতির স্বাভাবিক পছন্দ, যারা এসব কঠোর শোষণের বোঝা বয়স্কদের তুলনায় বেশি বহন করতে সক্ষম। তা সত্ত্বেও শহর ও গ্রামের আয়ের বিপুল পার্থক্য, জমির উপর নির্ভর করে বেঁচে থাকার অক্ষমতা এবং গ্রামাঞ্চলে কাজের সুযোগের অভাব গ্রাম থেকে শহরে শ্রমিক চলাচলের ধারাবাহিক প্রবাহ বজায় রেখেছে। একই সাথে, বহিরাগত শ্রমিক নিয়োগ করে আঞ্চলিক শ্রমিকদের মজুরিও কমিয়ে রাখা সম্ভব হয়েছে। আঞ্চলিক শ্রমিকরাও সকল সময়েই কাজ চলে যাবার নিরাপত্তাহীনতায় ভোগেন। শ্রমিকশ্রেণির সামগ্রিক অবস্থার সংশ্লেষণ করে সিদ্ধান্ত টানা যায় যে, চিনের শ্রমিকরা তাঁদের শ্রমশক্তির দামের চেয়ে অনেক কম মজুরি নিয়ে কাজ করছেন। এবং এটাই হল সেই উৎস যেখান থেকে সাম্রাজ্যবাদী হাঙরদের অতি মুনাফা তৈরি হচ্ছে। আমরা যেন না ভুলি যে, আমরা বাজারে গিয়ে বিদেশি কোম্পানির তৈরি মোবাইল ফোন থেকে শুরু করে খেলনা থেকে দূর্গা পুজোর যে টুনি লাইট সস্তায় কিনি তার প্রত্যেকটির গায় লেগে রয়েছে চিনা শ্রমিক–কৃষকের রক্ত।

সংঘর্ষ ও প্রতিরোধ

সমাজতন্ত্রকে উচ্ছেদ করে সাম্রাজ্যবাদ ও তার দালালদের শাসন প্রতিষ্ঠিত হবে, কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃত্ব থেকে বিপ্লবীদের উচ্ছেদ করে সংশোধনবাদী বেইমানদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে অথচ সমাজের সমস্ত সম্পত্তির উপর শ্রমিক–কৃষকের মালিকানার উচ্ছেদ করে সাম্রাজ্যবাদী ও তার দালালদের মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হবে না, সমস্ত উৎপাদনের উপকরণের উপর জনগণের অধিকারকে হরণ করা হবে না, কমিউনগুলি ভেঙে দিয়ে জমি থেকে কৃষকদের উচ্ছেদ করা হবে না, কল–কারখানাগুলির মালিকানা থেকে শ্রমিকশ্রেণিকে উচ্ছেদ করা হবে না, জনগণের বৃহত্তর স্বার্থে যে পরিবেশকে রক্ষা করা হয়েছিল তাকে আবার পুঁজিপতি শ্রেণির মুনাফার স্বার্থে যথেচ্ছভাবে ধ্বংস করা হবে না – এমন হতেই পারে না। পাশাপাশি সংঘর্ষ ও প্রতিরোধের ক্ষেত্রও প্রসারিত হতে বাধ্য। সংঘর্ষ – প্রতিরোধ – প্রতিবাদের জায়গা মূলত তিনটি – জমি, শ্রম ও পরিবেশ। হিন্টনের মতে চিনের শাসকরা কৃষককে জমি থেকে উৎখাত করে মাটির ভাতের থালা এবং অবিরাম বেসরকারিকণের সূত্রে ব্যাপকভাবে শ্রমিক ছাঁটাই করে লোহার ভাতের থালা – এই দুটিকেই পরিকল্পিতভাবে ধ্বংস করে দিয়েছে। শাসকশ্রেণির এই আক্রমণের বিরুদ্ধে চিনের জনগণও প্রতি–আক্রমণের রাস্তায় নেমে পড়েছেন। ২০০৫ থেকে ২০১০ এর মধ্যে বড় আকারে শ্রমিক বিক্ষোভের ঘটনা ৮৭ হাজার থেকে বেড়ে ২ লক্ষ ৮০ হাজার হয়েছে। ২০০২–০৫ পর্বে গুয়াংডং–এর ডংঝাউ গ্রামে বিদ্যুত উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপনের জন্য জমি অধিগ্রহণ করতে গিয়ে সরকার কৃষক প্রতিরোধের মুখে পড়ে। কৃষকদের অভিযোগ ছিল এই যে, কৃষকদের ন্যায্য ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয় নি। কৃষকরা কারখানার বাইরে ছাউনি তৈরি করে নির্মানের কাজে বাধা দিতে থাকেন – এক সময় প্ল্যান্টের একটি বড় অংশ বিস্ফোরক দিয়ে উড়িয়ে দেওয়া হয়। পুলিশ গুলি চালায়। কয়েকজন মারাও যান। ২০১১ সালে সমুদ্র উপকুলের গ্রাম উ কান–এ একটি অভ্যুত্থান হয়। প্রায় বিনা ক্ষতিপূরণে জমি অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে। গ্রামবাসীরা পথ অবরোধ করেন, সরকারি প্রতিনিধিদের তাড়া করেন এবং ঘরোয়া অস্ত্রে সশস্ত্র হন। টানা দশদিন বিক্ষোভের পর কিছু কিছু দাবি পূরণ হওয়ায় গ্রামবাসীরা জমি ছাড়তে রাজি হন। গণ বিক্ষোভের ঘটনাগুলির ৪৫ ভাগ শ্রম বিরোধ বিষয়ক। ২০১০ সালে চিনের মোটরগাড়ি তৈরি, ইলেকট্রনিক্স এবং বস্ত্র শিল্প প্রায় ডজনখানেক ধর্মঘটে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। রাষ্ট্রীয় মালিকানায় পরিচালিত সংস্থাগুলিতে মাওয়ের আমলে শ্রমিকরা এমন শ্রেণি ক্ষমতা – কর্তৃত্ব ও মর্যাদা পেতেন পুঁজিবাদী ব্যবস্থাতে যা কল্পনার অতীত। পরবর্তীতে সাম্রাজ্যবাদ নির্দেশিত অর্থনৈতিক সংস্কারের যুগে তাঁদের সেই সুদিন আর নেই। আজ তাঁরা শুধুই আমলাতান্ত্রিক বুর্জোয়ার মালিকানাধীন কারখানায় শোষিত হবার জন্য সর্বহারা। এ থেকেই জন্ম নিচ্ছে তীব্র শ্রেণি সংগ্রাম। ২০০৯ সালে টংহুয়া আয়রণ এন্ড স্টীল কোম্পানির শ্রমিকরা বেসরকারিকরণ ও ছাঁটাইয়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। জেনারেল ম্যানেজার সমস্ত শ্রমিককে ছাঁটাই করার হুমকি দিলে ক্ষিপ্ত শ্রমিকরা তাকে পিটিয়ে মেরে ফেলে। সরকার শ্রমিকদের মারমুখি মেজাজ দেখে পিছিয়ে যায়। বেসরকারিকরণের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়।

জমি অধিগ্রহণ ও শ্রমিক ছাঁটাই বিরোধি বিক্ষোভের পরেই পরিবেশ ধ্বংস করার বিরুদ্ধে গণবিক্ষোভের স্থান। চিনে দূষণ সমস্যা মারাত্মক। পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি দূষণ আক্রান্ত ২০টি শহরের মধ্যে ১৬টিই চিনে। দুই-তৃতীয়াংশ শহরের মানুষ নিঃশ্বাসের সাথে দূষিত বাতাস ভিতরে নিচ্ছেন। গত এক দশকে ৬০ ভাগ ফুসফুসের ক্যান্সার বেড়েছে। প্রতিবছর ৬০০০ বর্গমাইল জমি পরিণত হচ্ছে মরুভূমিতে। ফলে কথায় কথায় মরুঝড় হচ্ছে। জলের অভাব এবং জলের দূষণ দুটোই বাড়ছে সমান তালে। গ্রামাঞ্চলে ৩০ কোটি মানুষ দূষিত পানীয় জল খাচ্ছেন। গ্রীন হাউস প্রভাবের বিচারে চিন ইদানীং আমেরিকাকেও ছাড়িয়ে গেছে। পরিবেশ রক্ষার জন্য গণ প্রতিবাদ হু হু করে বাড়ছে। বছরে ৬ লক্ষ অভিযোগ জমা পড়ছে পরিবেশ ধ্বংস করার বিরুদ্ধে।

২০05 সালে প্রকাশিত চিনের নিরাপত্তা মন্ত্রীর রিপোর্ট বলছে : "১৯৯৪ সালে প্রতিবাদ আন্দোলনে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা ছিল ৭লক্ষ ৩০হাজার। কিন্তু, ২০০৪ সালে সংখ্যাটা হয়েছে ৩৭লক্ষ ৬০হাজার অর্থাৎ পাঁচ গুণ"। "তারা বিভিন্ন চরমপন্থা গ্রহণ করেছে। এর মধ্যে রয়েছে পার্টি ও সরকারি অফিসে হামলা, অবরোধ, রেল ও রাস্তা রোকো প্রভৃতি"। ১৯৯৯-২০০২ এই পর্বে ধর্মঘট, উৎপাদন ধীরে করে দেওয়া প্রভৃতি ধরনের বিক্ষোভ ৯ গুণ বেড়েছে। কৃষকরাও সংঘবদ্ধ হচ্ছেন ব্যাপকভাবে।

চিনে জমি থেকে কৃষক উচ্ছেদ, কারখানা থেকে ছাঁটাই এবং পরিবেশ ধ্বংস করে জনগণকে শারীরিকভাবে অকেজো করে দেওয়া – অর্থনৈতিক সংস্কারের গোটা পর্যায়ে এই তিনটি দিক ভালরকম হাত ধরাধরি করে চলছে। আর এর সাথে হাত ধরাধরি করে বাড়ছে জনগণের প্রতিরোধ-প্রতিবাদ-সংঘর্ষ .... শ্রেণি সংগ্রাম।

চিনের ভবিষ্যত

অনেকেই আশা করেছিলেন যে, বিশ্ব অর্থনৈতিক সংকট থেকে বিশ্ব অর্থনীতিকে টেনে তুলবে চিনের রকেটের গতিতে বিকাশ। কিন্তু, এখন এমনকি গোঁড়া অর্থনীতিবিদরাও আশার কথা শোনাচ্ছে না। প্রত্যেকেই বলছে চিন যে কোন সময় নিজেই মুখ থুবড়ে পড়তে পারে। কারণ হিসাবে যেগুলি উঠে আসছে : (১) চিনা সমাজের ভিতরে ক্রমবর্ধমান দ্বন্দ্ব, শ্রেণি সংগ্রাম। (২) অতি রপ্তানি নির্ভরতা এবং সংকট থেকে বাঁচার জন্য অর্থনীতিকে জনগণের প্রকৃত চাহিদা ভিত্তিক উৎপাদনের দিকে ঘুরিয়ে দেওয়ার বদলে ফ্ল্যাট-আবাসন নির্মাণ ব্যবসাকে কেন্দ্র করে বিপুল ঋণ দিয়ে আমেরিকার ধাঁচে আর্থিক ফানুস তৈরি করা। (৩) জনগণের অতি শোষণের কারণে জাতীয় আয়ে ভোগের অংশ ক্রমাগত কমে যাওয়া। (৪) অর্থনীতিতে ভারসাম্য আনতে সরকারের অনীহা ও ব্যর্থতা। আশংকার কথা শোনা যাচ্ছে যে, চিনা জাদু যে কোন দিনই শূন্যে উবে যাবে। কেনই বা যাবে না ? যে পথে চলে জনগণের পয়লা নম্বরের শত্রু মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ গভীর সংকটের কাদায় হাবুডুবু খাচ্ছে, মাও পরবর্তী চিনও তো তাদের নির্দেশে তাদের দেখানো পথকেই আরও মোক্ষমভাবে আঁকড়ে ধরেছে ! আয়ের চেয়ে বেশি ঋণ দিয়ে আর্থিক ফানুস তৈরির পথ ! ছায়া ব্যাংকিং এর পথ ! আবাসন ক্ষেত্রকে ফুলিয়ে ফঁাপিয়ে তুলে অর্থনীতিকে চাঙ্গা করার প্রয়াস ! আর্থিকীকরণের মরীচিকা ! একপেশে সর্বাত্মক রপ্তানি নির্ভরতা ! গণভোগের জিনিষ বাদ দিয়ে বিলাস দ্রব্য উৎপাদনে জোর ! এসব করতে গিয়ে চিনা শাসকরা সাম্রাজ্যবাদের অতি মুনাফা নিংড়ে নেবার হাতিয়ার হিসাবে কাজ করতে গিয়ে তারা বর্বরতায় ১৯৪৯-এর আগেকার চিয়াং কাই শেকের বর্বরতাকেও ছাপিয়ে গেছে ! প্রতি উত্তরও দিচ্ছেন জনগণ – যাঁরা মাওয়ের শিক্ষা ভুলে মেরে দেন নি। প্রতি উত্তর চিন্তার ভাঁজ ফেলেছে গণশত্রুদের কপালে। নিউ ইয়র্ক টাইমস্ - এর মতো সাম্রাজ্যবাদের মুখপত্র কাগজ বলছে, চিনের বর্তমান অভিযাত্রাকে রুখে দিতে পারে হয় "মাওয়ের পুনরুত্থান" অথবা "পারমাণবিক বিপর্যয়"। বাস্তব ঘটনাবলী দেখাচ্ছে মাও সে তুংকে বাঁচিয়ে তোলার দরকার নেই – মাও সে তুং চিনের জনগণ এবং এমনকি শোধনবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির নিচুতলার কর্মী – সমর্থকদের একাংশের মনেও বেঁচে আছেন। সপ্তদশ পার্টি কংগ্রেসের কিছু আগে পার্টির বিভিন্ন স্তরের ১৭০ জন সদস্য পার্টি সম্পাদকের উদ্দেশ্যে এক খোলা চিঠি লেখেন। চিঠিতে তাঁরা পার্টিকে "মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-মাও সে তুং চিন্তাধারাকে দিশা হিসাবে গ্রহণ করার ক্ষেত্রে" দৃঢ় থাকতে বলেন। দাবি জানান "দিশা হিসাবে দেং শিয়াও পিংয়ের তত্ত্বকে বাতিল করতে হবে"। স্পষ্টভাবে বলেন : "সাম্যবাদ ও সমাজতন্ত্র সম্পর্কে স্বচ্ছ ও সরল ব্যাখ্যাকে পার্টি কর্মসূচীতে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে হবে। দুইটি শ্রেণি, দুই লাইনের সংগ্রাম যে সমাজতান্ত্রিক সমাজে রয়েছে এবং পুঁজিবাদকে প্রতিরোধ করতে নিরবচ্ছিন্ন বিপ্লবের প্রয়োজনীতাকে জোরের সাথে ঘোষণা করতে হবে। সাম্যবাদ অসম্ভব এবং শ্রেণি সংগ্রাম শেষ হয়ে গেছে – এই ধরনের বক্তব্যকে সমালোচনা করতে দিতে হবে ... "।

মাওয়ের ছবি ছেঁড়া হচ্ছে মুদ্রার একটা পিঠ। অন্য পিঠ বলছে, যারা এসব করছে অন্যান্য মাওবাদীরা তাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদও করছেন। জনগণও মুখ বুজে সব কিছু মেনে নিচ্ছেন না। তফাত শুধু একটাই : এরাজ্যে একটা লালগড়–নন্দীগ্রাম চৌত্রিশ বছরের জগদ্দল পাথর সরিয়ে দেয়। কিন্তু চিন দেশের শোধনবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির কঠোর নিয়ন্ত্রণ এড়িয়ে সে দেশের হাজারটা নন্দীগ্রাম ধরনের প্রতিরোধ মিডিয়া বাহিত হয়ে দুনিয়ার সামনে আসে না। কিন্তু প্রতিরোধ থেমে নেই। সবচেয়ে খুশির খবর যে, সেদেশের মাওপন্থীরা নতুন করে বিপ্লবী কমিউনিষ্ট পার্টি গড়ে তোলার উদ্যোগ হাতে তুলে নিয়েছেন। সে দিন আর বেশি দুরে নেই যখন চিনের শ্রমিক-কৃষকরা উঠে দাঁড়াবেন এবং তাঁদের মহান ঐতিহ্যকে আবার আঁকড়ে ধরে দ্বিতীয় সর্বহারা বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে সাম্রাজ্যবাদ ও তার দালাল শাসকদের উচ্ছেদ করবেন, আবার বিশ্ব সর্বহারা বিপ্লবের সামনের সারিতে এসে দাঁড়াবেন। সর্বহারা নেতৃত্বে সাম্যবাদে পৌঁছানোর যে লক্ষ্য অর্জনের জন্য মাও সে তুং আমৃত্যু লড়াই করে গেছেন তা কি জলের আখরে লেখা যে এত সহজে ওরা মুছে দিতে পারবে ?

ব্রাহ্মণ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম প্রসঙ্গে

সি পি আই (এম–এল) নকশালবাড়ি, জানুয়ারী ২০১০

ব্রাহ্মণ্যবাদ হলো মর্যাদার অসাম্য ও দমনের মতাদর্শ। এর উৎপত্তি কয়েক হাজার বছর আগে বৈদিক যুগে। কিন্তু, তার পর থেকে যে সমস্ত শাসকশ্রেণি উঠে এসেছে ও শাসন প্রতিষ্ঠা করেছে তাদের প্রয়োজনের সাথে খাপ খাইয়ে ব্রাহ্মণ্যবাদকে নতুন রূপে ঘষে মেজে টিঁকিয়ে রাখা হয়েছে। আজকে ভারতের শাসকশ্রেণির (সামন্তবাদী ও দালাল আমলাতান্ত্রিক বুর্জোয়া) সব অংশের বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গী ও মূল্যবোধের কাঠামোর একেবারে মর্মবস্তুতে রয়েছে ব্রাহ্মণ্যবাদ। উচ্চ মর্যাদা থেকে মর্যাদাহীন স্তরে ক্রমবিন্যাসের ব্রাহ্মণ্যবাদী দৃষ্টিকোণ কম বেশি মাত্রায় সব জাত ও ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে। ভারতের সমাজের প্রতিক্রিয়াশীল মূল্যবোধ এবং সম্পর্কগুলিকে খাড়া করে রেখেছে ও এসবের একেবারে ভিত্তিতে রয়েছে ব্রাহ্মণ্যবাদ।

ব্রাহ্মণ্যবাদ শ্রমকে ঘৃণা করে। এর জাতপাতের কাঠামো দলিতদের উপর এক অমানবিক অবস্থাকে চাপিয়ে দিয়েছে এবং শ্রমজীবীদের মধ্যে বিভেদ তৈরি করেছে। ব্রাহ্মণ্যবাদী মতাদর্শের একটা অবিচ্ছেদ্য দিক হলো এর নারী বিরোধি দৃষ্টিভঙ্গী, মহিলাদের উপর দমনমূলক সম্পর্ক ও আচার ব্যবহারকে চাপিয়ে দেওয়া। ব্রাহ্মণ্যবাদ জাতিবিদ্বেষ, আদিবাসী জনগণকে ঘৃণা করা এবং সাম্প্রদায়িক বিরোধিতার প্রচার করে। ভারতের রাষ্ট্রের প্রতিক্রিয়াশীল " জাতীয় ঐক্যের " মতাদর্শগত আঠা হিসাবে কাজ করে ব্রাহ্মণ্যবাদ, যে জাতীয় ঐক্যের নামে ভারতের বহু জাতিসত্তার আত্ম নিয়ন্ত্রণের ন্যায্য অধিকারকে অস্বীকার করা হয়। ব্রাহ্মণ্যবাদী ধারণা সবচেয়ে জঘন্য ধরনের কুসংস্কার ও যুক্তিহীন চিন্তার জন্ম দেয়।

নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব থেকে শুরু করে একেবারে সাম্যবাদ অব্দি শ্রমিকশ্রেণির নেতৃত্বে পরিচালিত বিপ্লবের একটা শক্তিশালী উপাদান হল এই বিষাক্ত মতাদর্শের চরিত্রকে খুলে ধরা, আক্রমণ করা এবং উচ্ছেদ করা। ব্রাহ্মণ্যবাদ বিরোধি সংগ্রামের কর্তব্য হাতে তুলে না নিলে শ্রমিকশ্রেণি কখনই নিজের শ্রেণি সচেতনার বিকাশ ঘটাতে ও নিজের নেতৃত্বকারী ভূমিকা পালন করতে পারবে না।

ব্রাহ্মণ্যবাদ বিরোধি সংগ্রামের বিভিন্ন ধারার মধ্যে জাতপাত বিলোপ করার লড়াইটা হলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণ জাতপাতের কাঠামো এখনও ভারতের সমাজের বেশির ভাগ অংশের সাথে পাকে পাকে জড়িয়ে আছে। ব্রাহ্মণ্যবাদ উৎপাদন সম্পর্কের অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং উপরিকাঠামোতে আধিপত্যকারী ভূমিকা পালন করছে। জাতপাত বিলোপের সংগ্রামের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো দলিতদের মুক্তির জন্য সংগ্রাম -- অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম, দলিতদের জন্য সমান অধিকার ও সম্মানজনক মানবিক অস্তিত্বের জন্য সংগ্রাম। মাওবাদী পার্টি দলিতদের এই সংগ্রামগুলিকে কেবলমাত্র সমর্থন করবে তাইই নয়, বরং মাওবাদী পার্টিকে উদ্যোগ নিতে হবে যাতে উপযুক্ত পদ্ধতি ও সাংগঠনিক রূপকে ব্যবহার দলিতদের সংগঠিত করা যায়। এছাড়াও, পার্টিকে চেষ্টা করতে হবে যাতে জাতপাত বিলোপের সংগ্রামের জন্য একটা ব্যাপক মঞ্চ গড়ে তোলা যায়। ব্রাহ্মণ্যবাদ বিরোধি সংগ্রাম এবং জাতপাত প্রথা, পুরুষতন্ত্র, জাতিবিদ্বেষ ও সাম্প্রদায়িকতাবাদের মধ্যে ব্রাহ্মণ্যবাদের নির্দিষ্ট প্রকাশগুলির বিরুদ্ধে সংগ্রামের কর্তব্যকে মাওবাদী পার্টি পরিচালিত সমস্ত গণ সংগঠনকে নিজের কাঁধে তুলে নিতে হবে।

ভারতের গণতান্ত্রিক সংগ্রামের মধ্যে সব সময়ই নারী, দলিত, আদিবাসী, জাতিসত্তা, ধর্মীয় সংখ্যালঘু ও পিছিয়ে পড়া এলাকার জনগণের সংগ্রামগুলির শক্তিশালী উপস্থিতি ছিল। এছাড়াও সংগ্রামের নতুন নতুন ফ্রন্ট তৈরি হচ্ছে, যেমন, পরিবেশ ধ্বংস করা ও জোর করে উচ্ছেদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম। যেখানেই সম্ভব সেখানেই মাওবাদী পার্টির উচিত এই ধরনের সংগ্রামগুলিকে সংগঠিত করা ও নেতৃত্ব দেবার কাজটাকে নিজের কাঁধে তুলে নেওয়া। কিন্তু, মাওবাদী পার্টির আওতার বাইরেও এরকম অনেক সংগ্রাম আছে ও থাকবে। তাসত্ত্বেও, এমনকি দৃঢ় শাসক শ্রেণি বিরোধি দিশা না থাকলেও বস্তুগতভাবে সংগ্রামের এই সমস্ত স্রোতগুলি নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে শক্তিশালী করছে ও এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। বিশেষ করে, বিপ্লবের সামাজিক ভিত্তির সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশই হলো দলিত, নারী, আদিবাসী ও সমাজের অন্যান্য নিপীড়িত ও বঞ্চিত অংশের মানুষ। মূল শ্রেণিগুলি এবং বিপ্লবের প্রধান শক্তির একটা বিরাট অংশ এসেছে এই সমস্ত নিপীড়িত অংশগুলি থেকে। নয়া গণতান্ত্রিক যুক্তফ্রন্টে এবং নয়া বিপ্লবী রাজনৈতিক ক্ষমতার কাঠামোয় তাঁদের নির্দিষ্ট প্রতিনিধিত্ব থাকতেই হবে।

সমাজের নিপীড়িত অংশগুলিকে যে শিকল দিয়ে হাজার হাজার বছর ধরে বেঁধে রাখা হয়েছে সেটাকে ছিঁড়ে ফেলার তীব্র আকাঙ্ক্ষা নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রচন্ড শক্তির উৎস। শেষ বিচারে, দমনের এই সমস্ত রূপগুলির প্রত্যেকটাই অন্তর্বস্তুর দিক থেকে শ্রেণি প্রশ্ন। ভারতের শাসকশ্রেণি ও সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থে দমনের এই রূপগুলিকে গড়ে তোলা হয়েছে ও চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। ভারতের রাষ্ট্র এগুলিকে চাপিয়ে দিয়েছে ও রক্ষা করছে। সেজন্য, দমনের এই রূপগুলিকে উচ্ছেদ করার রাস্তা হলো বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে ভারতের রাষ্ট্রকে ধ্বংস করা এবং এই সব দমনের ভিত হিসাবে কাজ করছে যে উৎপাদন সম্পর্ক ও মূল্যবোধ তাকে উচ্ছেদ করা। এই রাস্তায় সমাজতন্ত্র থেকে সাম্যবাদের দিকে এগিয়ে যাবার পথটাই হলো সমস্ত নিপীড়িত ও শোষিত অংশের পূর্ণ মুক্তির একমাত্র পথ। মার্কস এই এগিয়ে যাওয়াটাকে একটা প্রক্রিয়া হিসাবে বর্ণনা করেছিলেন যার মধ্যে থাকবে "সাধারণভাবে সমস্ত শ্রেণি ও শ্রেণি বিভেদ, যে ভিত্তির উপর এই শ্রেণি বিভেদ দাঁড়িয়ে আছে সেই সমস্ত উৎপাদন সম্পর্কগুলি ও তার সাথে সাযুজ্যপূর্ণ সমস্ত সামাজিক সম্পর্কগুলি এবং এই সমস্ত সামাজিক সম্পর্কগুলি থেকে তৈরি হওয়া সমস্ত ধ্যান ধারণাকে" উচ্ছেদ করা। বিশেষ করে মহান সর্বহারা সাংস্কৃতিক বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে মাও সে তুং এই উপলব্ধিকে আরও গভীরতর করেন। এটা তাঁর সর্বহারা একনায়কত্বের অধীনে বিপ্লব চালিয়ে যাবার তত্ত্বকে সুনির্দিষ্ট ও সংহত করে। ভারতে সাম্যবাদ অব্দি বিপ্লবকে চালিয়ে যাবার কর্তব্যটা চূড়ান্তভাবে নির্ভর করছে ব্রাহ্মণ্যবাদ ও তার নির্দিষ্ট প্রকাশগুলির বিরুদ্ধে সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া ও গভীরতর করার উপর।

বিশ্বের মার্কসবাদী-লেনিনবাদী-মাওবাদী পার্টি ও সংগঠনগুলির এক আন্তর্জাতিক সম্মেলনের জন্য।

বিপ্লবী আন্তর্জাতিকতাবাদী আন্দোলনের অন্তর্ভুক্ত মার্কসবাদী-লেনিনবাদী-মাওবাদী পার্টি ও সংগঠনগুলির বিশেষ অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাব। বুধবার, ১৩ই জুন, ২০১২।

(এই লেখাটি thenaxalbari.blogspot.com থেকে নেওয়া হয়েছে।)

সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়নের ধ্বংসাত্মক প্রভাব, আগ্রাসী যুদ্ধ এবং সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থার বিধ্বংসী অর্থনৈতিক সংকট এবং সর্বহারা ও ব্যাপক জনগণের উপর এই সংকটের প্রভাব সারা দুনিয়াজুড়ে সংগ্রাম ও বিদ্রোহের একটা ঢেউকে জাগিয়ে তুলেছে।

এই প্রেক্ষাপটে বিশ্ব সর্বহারা বিপ্লবের শক্তিশালী সম্ভাবনাময় এক নতুন তরঙ্গের উত্থান হচ্ছে ও বিকশিত হচ্ছে, যার ভরকেন্দ্র ও রণনৈতিক নোঙর হিসাবে কাজ করছে মাওবাদী পার্টিগুলির পরিচালিত জনযুদ্ধগুলি। এই নতুন তরঙ্গের সম্ভাবনাময় শক্তির বাস্তবায়ন শেষ বিচারে নির্ভর করছে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী-মাওবাদী পার্টিগুলি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে কতটা সফলভাবে তাদের কর্তব্য পালন করছে তার উপর। মার্কসবাদী-লেনিনবাদী-মাওবাদী পার্টিগুলির উপলব্ধি ও অভিজ্ঞতাকে একজায়গায় করা ও বিশ্বজোড়া বিদ্রোহি জনতার কাছে একটা ঐক্যবদ্ধ বিপ্লবী আহ্বান নিয়ে যাবার জন্য তাদের সামর্থ্যকে বিকশিত করার নির্ধারক গুরুত্ব রয়েছে। দূর্ভাগ্যজনক ঘটনা এই যে, এই বিষয়ে বড় দূর্বলতা রয়েছে। ব্যাপারটা আরও মারাত্মক জটিল হয়েছে বিপ্লবী আন্তর্জাতিকতাবাদী আন্দোলনের (রিম) মধ্যেকার সংকটের জন্য, যার ফলে রিম বর্তমানে নিষ্ক্রিয় অবস্থায় রয়েছে।

এই পরিস্থিতিতে বিপ্লবী কর্তব্য পালনে সাহায্য করবে এবং সর্বহারা ও সংগ্রামী জনগণের কাছে মাওবাদীদের ঐক্যবদ্ধ আহ্বানকে পৌঁছে দেবে এমন একটা কার্যকরী আন্তর্জাতিক মার্কসবাদী-লেনিনবাদী-মাওবাদী সংগঠন গড়ে তোলার জন্য পদক্ষেপ নেবার দরকার আছে। সেজন্য সারা বিশ্বের মার্কসবাদী-লেনিনবাদী-মাওবাদী পার্টি ও সংগঠনগুলির একটা নতুন সম্মেলন করার লক্ষ্যে আমাদের এগিয়ে যাওয়া উচিত। এই সম্মেলনের উচিত মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-মাওবাদের ভিত্তিতে একটা আন্তর্জাতিক সংগঠন গড়ে তোলার দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেওয়া।

এই কর্তব্য পালনের ক্ষেত্রে রিমের ইতিবাচক ও নেতিবাচক অভিজ্ঞতাগুলি সম্পর্কে পরিস্কার ধারণা থাকা জরুরি কারণ প্রায় তিন দশকজোড়া অস্তিত্বের সময়কালে আন্তর্জাতিক সংগঠন গড়ে তোলা ও কাজ করার অভিজ্ঞতা রিমের রয়েছে। আন্তর্জাতিক সম্মেলন করা ও আন্তর্জাতিক সংগঠন গড়ে তোলার কাজের অংশ হিসাবে আমাদের প্রয়োজন – যে সমস্ত পার্টি ও সংগঠনগুলি রিমের অভিজ্ঞতার শরিক ছিল তাদের তরফ থেকে ঐ অভিজ্ঞতার একটা সারসংকলন। এখানে আমরা কিছু প্রাথমিক মতামত তুলে ধরছি।

(১) ১৯৭৬ সালে মাও সে তুংয়ের মৃত্যুর পর একটা সামরিক অভ্যুত্থানের মধ্যে দিয়ে চিনা শোধনবাদীরা রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করে চিনের কমিউনিষ্ট পার্টিকে একটা শোধনবাদী পার্টিতে পরিণত করে, সর্বহারার রাজনৈতিক ক্ষমতাকে উচ্ছেদ করে, সমাজতন্ত্রের পতন ঘটায় এবং বিপ্লবী চিনকে প্রতিক্রিয়াশীল চিনে পরিণত করে। এছাড়াও, আলবেনিয়ার শ্রমিক পার্টিতে হোজাবাদী শোধনবাদী লাইনের উত্থান ঘটে যা বিশ্বের কিছুসংখ্যক কমিউনিষ্ট পার্টি ও সংগঠনকে প্রভাবিত করে। এসবের পরিণতি হয় আন্তর্জাতিক কমিউনিষ্ট আন্দোলনের উপর এক গভীর ধাক্কা।

পরাজয়ের এই পরিপ্রেক্ষিতে সংখ্যায় কম হলেও কিছু মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টি ও সংগঠন যারা চিনা বা হোজা কোন ধরনের শোধনবাদকে অনুসরণ করেনি তারা ১৯৮০ সালে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টি ও সংগঠনগুলির প্রথম আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত করে এবং "বিশ্বের সর্বহারা এবং নিপীড়িত জনগণের কাছে আহ্বান" নামে একটি যৌথ বিবৃতি প্রকাশ করে। যদিও, এই সম্মেলনের মধ্যে দিয়ে একটা পাকাপোক্ত আন্তর্জাতিক সংগঠন গড়ে ওঠে নি, তাসত্ত্বেও এই সম্মেলন ১৯৮৪ সালের দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক সম্মেলনের ভিত্তি তৈরি করে দেয়।

এই দ্বিতীয় সম্মেলনে বিপ্লবী আন্তর্জাতিকতাবাদী আন্দোলন বা রিম গড়ে ওঠাটা ছিল একটা ইতিবাচক আন্তর্জাতিক, তত্ত্বগত ও ব্যবহারিক প্রয়াস যার মধ্যে দিয়ে চিন বিপ্লবের পরাজয়ের পর যখন গোটা কমিউনিষ্ট আন্দোলন গভীর সংকটের মধ্যে পড়েছে সেই সময়কালের পরিস্থিতিতে আন্তর্জাতিক কমিউনিষ্ট আন্দোলনের মতাদর্শগত, রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক চাহিদা ও প্রয়োজনীয়তাগুলিকে মোকাবিলা করা হয়।

মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-মাওবাদের (সেই সময় মাও সে তুং চিন্তাধারা বলা হত) ভিত্তিতে এবং আধুনিক রুশ ও চিনা শোধনবাদের (একইসাথে হোজাবাদী গোঁড়ামিবাদী শোধনবাদের) নীতিসম্মত বিরোধিতা করার মধ্যে দিয়েই এই দ্বিতীয় সম্মেলনে "বিপ্লবী আন্তর্জাতিকতাবাদী আন্দোলনের ঘোষণা" গৃহীত হয়েছিল। এই ঘোষণা আন্দোলনের (রিমের) ভিত্তির মৌলিক মতাদর্শগত ও রাজনৈতিক কাঠামো হিসাবে কাজ করে।

২. মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-মাওবাদের ভিত্তিতে গড়ে ওঠার ফলে গত তিন দশকের সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে বিপ্লবী আন্তর্জাতিকতাবাদী আন্দোলন গুরুত্বপূর্ণ তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক অগ্রগতি অর্জন করেছে যেগুলি নীতি সংক্রান্ত এবং আরও বিকাশের দাবি রাখে। কিছু কিছু খামতি ও দূর্বলতা সত্ত্বেও রিমের বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সম্মেলন ও বর্ধিত অধিবেশনে গৃহীত বিভিন্ন দলিলগুলির (যেমন, "বিপ্লবী আন্তর্জাতিকতাবাদী আন্দোলনের ঘোষণা", "মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-মাওবাদ দীর্ঘজীবী হোক" এবং "সহস্রাব্দের প্রস্তাব") প্রত্যেকটাই আন্তর্জাতিক কমিউনিষ্ট আন্দোলনের অংশ হিসাবে রিমের অগ্রগতির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান। আন্তর্জাতিক কমিউনিষ্ট আন্দোলনে রিম যে ভুমিকা পালন করেছে তার মধ্যে চোখে পড়ার মতো বৈশিষ্ট্যসূচক কাজ হলো – পেরুর কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বে পরিচালিত পেরুর জনযুদ্ধকে

আন্তর্জাতিকতাবাদী সমর্থন দেওয়া, ড: আবিমেল গুজমানের সমর্থনে ঐতিহাসিক প্রচার অভিযান, নেপালের দশ বছরের জনযুদ্ধের সূচনা ও বিকাশে অবদান রাখা ও সমর্থন দেওয়া, বিভিন্ন ভাষায় 'এ ওয়ার্ল্ড টু উইন' পত্রিকা প্রকাশ করা যার মাধ্যমে রিম ও তার অন্তর্ভূক্ত পার্টি ও সংগঠনগুলির মতাদর্শগত ও রাজনৈতিক ধ্যানধরণা ও বিশ্লেষণকে বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে দেওয়া এবং রিমের তরফ থেকে প্রকাশিত বিবৃতিগুলি।

৩. একটা নতুন ধরনের নতুন কমিউনিষ্ট আন্তর্জাতিক গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তাকে রিমের প্রতিষ্ঠা সম্মেলনেই চিহ্নিত করা হয়েছিল। এটাকে বাস্তবায়িত করার জন্য রিমের ঘোষণাতে সঠিক ভাবেই দ্বৈত কর্তব্যকে চিহ্নিত করা হয়েছিল – "বর্তমান বিশ্বের জটিল বাস্তবতা যে সমস্ত চ্যালেঞ্জ আমাদের সামনে তুলে ধরে তার সাথে খাপ খায় এমন একটি সঠিক ও কার্যকরী সাংগঠনিক রূপ এবং সাধারণ লাইন" গড়ে তোলা।

৪. রিমের অন্তর্বর্তীকালীন কমিটি (যাকে একটা রাজনৈতিক ভ্রূণকেন্দ্র হিসাবে ভাবা হয়েছিল) গড়ে তোলা হয় যার দায়িত্ব ছিল কমিউনিষ্ট আন্দোলনের সাধারণ লাইনের জন্য একটা খসড়া তৈরি করা সহ কমিউনিষ্টদের মতাদর্শগত, রাজনৈতিক এবং সাংগঠনিক ঐক্যেকে এগিয়ে নিয়ে যাবার প্রক্রিয়ার জন্য কাজ করা। কিন্তু, রিমের কমিটি (কো-রিম) এই দায়িত্ব পালন করতে ব্যর্থ হয় এবং রিমও এই লক্ষ্যে পৌঁছতে পারে নি।

৫. রিমের অভিজ্ঞতায় এরকম কেন্দ্রের (কো-রিম) অস্তিত্ব, যাকে গড়ে তোলা হয়েছিল রিমের জন্য একটা সংগতিপূর্ণ ও ঐক্যবদ্ধ ভূমিকা নেবার জন্য, মিশ্র ফল দিয়েছে। কিছু কিছু ভালো ফল পাওয়া গেছিল। এর পাশাপাশি আবার কিছু গুরূতর খামতি, কর্মপদ্ধতির মধ্যে আধিপত্যবাদী প্রবণতা দেখা দিয়েছিল যা রিমের যৌথ কর্মপদ্ধতিকে ক্ষতিগ্রস্থ করেছিল, রিমের ঐক্যে গভীর ধাক্কা পৌঁছেছিল, নতুন মার্কসবাদী-লেনিনবাদী-মাওবাদী পার্টিকে রিমে নিয়ে আসার ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করেছিল এবং এর ফলে যে লক্ষ্য অর্জনের কর্তব্য নির্ধারণ করা হয়েছিল সেগুলি পূরণের পথে বাধা সৃষ্টি হয়।

নতুন আন্তর্জাতিক সংগঠনের একটা কার্যকরী কেন্দ্র থাকা উচিত যার অভ্যন্তরীণ জীবন ও কর্মপদ্ধতি হওয়া উচিত যে সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলি একে গড়ে তুলেছে তারা এই ধরনের আন্তর্জাতিক সংগঠনের স্তর ও কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে যতদূর অব্দি ঐক্যমত তার সাথে সাযুজ্যপূর্ণ। আন্তর্জাতিকের সম্মেলন ও অন্যান্য অধিবেশনে গৃহীত সিদ্ধান্ত ও ঐক্যমতের কাঠামোর মধ্যেই দক্ষতা ও দায়বদ্ধতার সাথে আন্তর্জাতিকের কমিটির কাজ চালানো উচিত। অন্যান্য সকল বিষয়ের মতোই এক্ষেত্রেও চূড়ান্ত গ্যারান্টি হলো আন্তর্জাতিকের সদস্য আলাদা আলাদা পার্টিগুলির পক্ষ থেকে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-মাওবাদকে সংগতিপূর্ণভাবে রক্ষা করা, প্রয়োগ করা ও বিকশিত করা এবং তাদের নিজেদের আন্তর্জাতিকতাবাদী দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করা।

রিমের ইতিবাচক দিক থাকা সত্ত্বেও, রিম যে সমস্ত কর্তব্য কাঁধে তুলে নিয়েছিল তা পরিপূর্ণভাবে পালন করতে ব্যর্থ হয়েছে এবং একটা সংকটের মধ্যে পড়েছে। যখন আমেরিকার বিপ্লবী কমিউনিষ্ট পার্টিতে বব আভাকিয়ানের মার্কসবাদ–লেনিনবাদ-মাওবাদ পরবর্তী "নয়া সংশ্লেষণ" ধাঁচের শোধনবাদ আধিপত্যকারী অবস্থানে চলে এলো এবং যখন প্রচন্ড–বাবুরাম ধাঁচের শোধনবাদ ঐক্যবদ্ধ নেপালের কমিউনিষ্ট পার্টি (মাওবাদী)–এর মধ্যে আধিপত্যকারী অবস্থানে চলে এলো তখন কেবলমাত্র এই সমস্ত পার্টিগুলিই বিপ্লব ও সাম্যবাদের পথ থেকে বিচ্যুত হলো তাইই নয় তাদের প্রতি বিপ্লবী লাইনের ধ্বংসাত্নক এবং নোংরা প্রভাব ব্যাপক আকারে ও গভীরভাবে রিমের মধ্যেকার পার্টি ও সংগঠনগুলিকে, বিশেষ করে কো-রিমকে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করে। এটাই হলো রিমের বর্তমান সংকট ও ভেঙে পড়ার আশু মতাদর্শগত উৎস।

আন্তর্জাতিক সংগঠনকে পুনরায় জাগিয়ে তোলা ও সংগঠিত করার জন্য আমরা একটা আন্তর্জাতিক সম্মেলন আহ্বান করার প্রস্তাব করছি। আমরা বিশ্বাস করি যে, যেসব মাওবাদী পার্টি জনযুদ্ধ পরিচালনা করছেন এবং রিমের বাইরেও যে সমস্ত মাওবাদী শক্তিরা আছেন তাঁদের সহ সমস্ত মাওবাদী শক্তির অংশগ্রহণের মাধ্যমে এই কাজটাকে যৌথভাবে কাঁধে তুলে নিতে হবে যাতে এই সম্মেলন তাঁদের মতামত ও অভিজ্ঞতা থেকেও উপকৃত হতে পারে। এই লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য একটা মতাদর্শগত, রাজনৈতিক বিতর্ক অবশ্যই চালাতে হবে। আন্তর্জাতিক সম্মেলনের প্রস্তুতির জন্য ও এই সম্মেলন যে লক্ষ্যে পৌঁছতে চায় তাকে সেবা করার জন্য "রিম, আই সি এম এল এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক উদ্যোগগুলির অভিজ্ঞতার সারসংকলন" বিষয়ে একটা সেমিনার করা দরকার বলে আমরা মনে করি।

এই গোটা প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে ঐক্য ও পার্থক্যের বিষয়গুলিকে চিহ্নিত করা যাবে এবং একটা অপেক্ষাকৃত এগিয়ে থাকা মঞ্চ গড়ে তোলার জায়গায় পৌঁছানো যাবে, যে মঞ্চ হবে এক নতুন আন্তর্জাতিক ঐক্যে পৌঁছানোর ভিত্তি – যে ঐক্য মূর্ত রূপ পাবে একটা নতুন আন্তর্জাতিক সংগঠনের মধ্যে। আজকের পরিস্থিতিতে, এই বিপ্লবী কর্তব্য পালন করাটাই হয়ে উঠতে পারে "গোটা দুনিয়ার শ্রমিক ও নিপীড়িত জনগণ এক হও" এই আন্তর্জাতিকতাবাদী কমিউনিষ্ট শ্লোগানের বাস্তব প্রকাশ। এই কাজটা করার মধ্যে দিয়েই সম্ভব হবে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী-মাওবাদী পার্টিগুলির পক্ষে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-মাওবাদকে প্রতিষ্ঠিত ও বিকশিত করা, আন্তর্জাতিক কমিউনিষ্ট আন্দোলনে একটা নতুন ঐক্যকে বাস্তবায়িত করা এবং একে দুনিয়াজুড়ে জনগণের সংগ্রামের সামনের সারিতে প্রতিষ্ঠিত করা এবং বিশ্ব বিপ্লবের নতুন তরঙ্গের পুরো শক্তিকে উন্মুক্ত করা ও বাস্তবায়িত করা।

বিপ্লবী অভিনন্দন সহ,

সাক্ষরিত ও প্রচারিত :

আফগানিস্তানের কমিউনিষ্ট (মাওবাদী) পার্টি

ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি (মার্কসবাদী-লেনিনবাদী), নকশালবাড়ি

মাওবাদী কমিউনিষ্ট পার্টি – ইটালি

নেপালের কমিউনিষ্ট পার্টি –মাওবাদীর সপ্তম কংগ্রেসের উদ্দেশ্যে সি পি আই (এম-এল) নকশালবাড়ির বার্তা

(এই লেখাটি thenaxalbari.blogspot.com থেকে নেওয়া হয়েছে।)

প্রিয় কমরেড,

লাল সেলাম,

আপনাদের এই ঐতিহাসিক উপলক্ষ্যে আমরা আপনাদের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি এবং প্রতক্ষ্যভাবে অংশগ্রহণ না করতে পারার জন্য দুঃখ প্রকাশ করছি। দয়া করে আমাদের এই বার্তাকে গ্রহণ করবেন।

মতাদর্শগত ও রাজনৈতিক লাইনের নির্ধারক গুরুত্ব সম্পর্কে মাও সে তুং আমাদের শিক্ষা দিয়ে গেছেন। আপনাদের পার্টির ইতিহাস হলো এর সবচেয়ে বড় প্রমাণ। একটা সঠিক লাইন থাকার কারণেই আপনারা পেরেছিলেন তেং শিয়াও পিং শোধনবাদীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে, যারা ১৯৭৬ সালে সামরিক অভ্যুত্থানের মধ্যে দিয়ে চিনে ক্ষমতা দখল করে মহান সাংস্কৃতিক বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে যে সমস্ত ঐতিহাসিক অগ্রগতি অর্জিত হয়েছিল সেগুলিকে ধ্বংস করেছিল এবং সমাজতান্ত্রিক চিনে পুঁজিবাদ পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছিল। এইভাবে মাও সে তুং প্রদর্শিত পথে অবিচল থেকে আপনাদের পার্টি চিনের এই ধাক্কার সামনে দাঁড়িয়ে মাকর্সবাদ-লেনিনবাদ-মাওবাদের পতাকাকে উর্দ্ধে তুলে ধরার আন্তর্জাতিক সংগ্রামে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল, যে আন্তর্জাতিক সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে বিপ্লবী আন্তর্জাতিকতাবাদী আন্দোলন (রিম) গড়ে উঠেছিল। এছাড়াও, মাওবাদকে উর্দ্ধে তুলে ধরা ও প্রয়োগ করার সংগ্রামকে আরও গভীরতর করার মধ্যে দিয়ে আপনাদের পার্টি গোঁড়ামিবাদী শোধনবাদ যা বিপ্লবের অগ্রগতিকে আটকে রেখেছিল তার সাথে বিচ্ছেদ ঘটিয়েছিল। আপনাদের পার্টি একটা সঠিক লাইনকে গড়ে তুলেছিল এবং সাহসের সাথে জনযুদ্ধের সূচনা করেছিল। এই গৌরবজ্জল যুদ্ধের মহান বিজয়গুলি যেমন, "গণ মুক্তি বাহিনী গড়ে তোলা, ঘাঁটি এলাকা ও জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠা করা এবং শ্রমিক, কৃষক, নারী, নেপালের বিভিন্ন জাতিসত্তাগুলি ও দলিতরা বিপ্লবী সংগ্রামে যে ভূমিকা পালন করেছিলেন ও তাঁদের সচেতনতাকে এই গোটা বিপ্লবী প্রক্রিয়ার মধ্যে যেভাবে বিকশিত করা হয়েছিল" – এগুলি প্রধানত আপনাদের পার্টি যে সঠিক লাইন অনুসরণ করেছিল তার ফল। আজকে এসবের অধিকাংশই শেষ হয়ে গেছে। এটা প্রচন্ড–বাবুরাম চক্রের দ্বারা মাওবাদী লাইনকে ধ্বংস করা ও শোধনবাদী লাইন চাপিয়ে দেবার ফলাফল। অগ্রগতিই হোক বা ধাক্কা উভয়ক্ষেত্রেই আন্তর্জাতিক কমিউনিষ্ট আন্দোলন ও তার অংশ বিভিন্ন দেশের কমিউনিষ্ট পার্টিগুলির ইতিহাস থেকে এটা প্রমাণিত হয়েছে যে, "লাইনের সঠিকতা বা বেঠিকতাই সমস্ত কিছুর নির্ধারক"।

আপনারা প্রচন্ড–বাবুরাম শোধনবাদী লাইনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছেন। আপনাদের আজকের এই পার্টি কংগ্রেস ঐ বিদ্রোহের ফসল। এই কংগ্রেসের সামনে দায়িত্ব হলো প্রচন্ড–বাবুরাম শোধনবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামকে গভীরতর করা ও এই সংগ্রাম থেকে অর্জিত ফসল গুলিকে সংহত করা, একটা সঠিক লাইন গড়ে তোলা এবং আপনাদের দেশের জটিল রাজনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যে দাঁড়িয়ে পুনরায় বিপ্লবী পথে এগিয়ে যাবার জন্য নির্দিষ্ট পরিকল্পনা তৈরি করা। এই কাজগুলিকে সফলভাবে করাটা হলো মূলত জনযুদ্ধ এবং পার্টির মধ্যে দুই লাইনের সংগ্রাম - এই দুটি ক্ষেত্রে আপনাদের নিজেদের সংগ্রামের শিক্ষাগুলিকে সারসংকলিত করা। কিন্তু অবশ্যই শুধুমাত্র এটুকুর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকলে চলবে না। আন্তর্জাতিক কমিউনিষ্ট আন্দোলনের অংশ হিসাবে আপনাদের দায়িত্ব হলো আন্তর্জাতিক কমিউনিষ্ট আন্দোলনের আরও বড় অভিজ্ঞতা ও শিক্ষাগুলি থেকেও গ্রহণ করতে হবে। এখানে আমরা আমাদের পার্টির প্রতিষ্ঠাতা নেতা কমরেড চারু মজুমদারের সংকলিত একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা আপনাদের সাথে ভাগ করে নিতে চাই। দক্ষিণপন্থী নেতৃত্বের বিরুদ্ধে বহু বিদ্রোহের অভিজ্ঞতাগুলিকে সমালোচনামূলকভাবে সংশ্লেষিত করতে গিয়ে তিনি চিহ্নিত করেছিলেন যে, কিভাবে মধ্যপন্থী উপাদানরা এই সমস্ত বিদ্রোহগুলির সাথে বেইমানি করেছে ও ভোঁতা করে দিয়েছে। তিনি সতর্ক করেছিলেন যে, "মধ্যপন্থাই হলো শোধনবাদে যাবার সিঁড়ি" এবং তিনি নিচু তলার কর্মীদের কাছে মধ্যপন্থাকে উচ্ছেদ করার জন্য আহ্বান করেছিলেন। মধ্যপন্থা বিভিন্ন রূপে আসতে পারে। কিন্তু, এর অন্তর্বস্তু সব সময়ই এক – এটা মতাদর্শগত সংগ্রামকে বিপ্লবী সমাধানের দিকে নিয়ে যেতে ব্যর্থ হয়। এটা ভুল লাইন, পদ্ধতি এবং প্রয়োগ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ ঘটাতে কমিউনিষ্টদের বাধা দেয়। অবশেষে, পুরোনো পচা মালকে আবার নতুন পোশাক পরিয়ে আমদানি করে। সেজন্য শোধনবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামকে প্রসারিত করতে হবে মধ্যপন্থার নির্দিষ্ট প্রকাশগুলিকে খুঁজে খুঁজে বার করে সেগুলির আসল চরিত্রকে প্রকাশ করে দেওয়া এবং তার সাথে বিচ্ছেদ ঘটানো অব্দি। আমাদের দেশের কমিউনিষ্ট আন্দোলনের ইতিহাস থেকে আমরা এই শিক্ষাই পেয়েছি। আমাদের আশা যে, কংগ্রেসের আলোচনা চলার সময় আমাদের এই শিক্ষা আপনাদের কাজে লাগবে।

যখন আপনারা সঠিক লাইন অনুসরণ করে চলছিলেন তখন নেপাল ও গোটা দুনিয়ার জনগণের উপর আপনাদের পার্টির পরিপূর্ণ আস্থা ছিল। এটাই ছিল আপনাদের পার্টি পরিচালিত জনযুদ্ধের শক্তির ভিত। জনগণের উপর পরিপূর্ণভাবে নির্ভর করে ও অন্যান্য মাওবাদী পার্টির সাথে আন্তর্জাতিকতাবাদী সম্পর্কের ভিত্তিতে ঐ জনযুদ্ধ দেশের মধ্যেকার প্রতিক্রিয়াশীলদের ভালো মাত্রায় পরাজিত করতে পেরেছিল এবং সাম্রাজ্যবাদ ও ভারতীয় সম্প্রসারণবাদের শয়তানি চক্রান্তকে ব্যর্থ করে দিতে পেরেছিল। প্রচন্ড–বাবুরাম চক্র চেষ্টা করেছে শক্তির এই উৎসগুলিকে নষ্ট করে দেবার। দক্ষিণ এশিয়া ও অন্যান্য দেশের মাওবাদী পার্টিগুলির সাথে আন্তর্জাতিকতাবাদী সম্পর্কের উপর নির্ভর করার ব্যপারটাকে ক্রমাগত ধ্বংস করা হয়েছে এবং এর বদলে আমদানি করা হয়েছে সাম্রাজ্যবাদ ও ভারতীয় সম্প্রসারণবাদের সাথে আতাঁত করার জন্য বিভিন্ন কূটনৈতিক কৌশল। একটা সময়ে নেপালের জনগণের অফুরন্ত বিপ্লবী ইচ্ছাশক্তি ও দেশপ্রেমের উপর নির্ভর করার বদলে প্রচন্ড গোষ্ঠী ভারতীয় সম্প্রসারণবাদ / মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী বিপদের পাল্টা হিসাবে চিনা রাষ্ট্রের উপর নির্ভর করতে শুরু করে। এই বিচ্যুতি অবশ্যম্ভাবী ছিল। শোধনবাদ কখনোই জনগণের উপর নির্ভর করার সাহস দেখায় না। তারা কখনোই সর্বহারা আন্তর্জাতিকতাবাদ থেকে শক্তি সংগ্রহ করে না। আবার উল্টোদিকে, জনগণের উপর আস্থা রাখার বদলে প্রতিক্রিয়াশীল রাষ্ট্রের উপর নির্ভর করার কৌশল বা পলিসি, ভ্রাতৃপ্রতিম মাওবাদী পার্টিগুলির সাথে সর্বহারা আন্তর্জাতিকতাবাদী সম্পর্কের বদলে শোধনবাদী ও প্রতিক্রিয়াশীল পার্টিগুলির সাথে আঁতাত গড়ে তোলার উপর বেশি গুরুত্ব দেওয়ার কৌশল পরিষ্কারভাবে একটা

মতাদর্শগত ভুলকে প্রতিফলিত করে। বিষয়টাকে শুধুমাত্র বাহ্যিক রূপের দিক থেকে দেখলে চলবে না, "কৌশলগত পদক্ষেপের" নামে বা অন্য কোন মিষ্টি কথায় একে ন্যায় সংগত প্রতিপন্ন করার চেষ্টায় ভুললে চলবে না বরং শেষ বিচারে এর বিলোপবাদী অন্তর্বস্তুর মধ্যে দেখতে হবে। প্রচন্ড-বাবুরাম চক্রের বেইমানির ফলে নেপালের এবং আন্তর্জাতিক মাওবাদী আন্দোলনের ধাক্কার তিক্ত অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে আমরা এই গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা পেয়েছি। আমরা বিষয়টা আপনাদের সামনে এই বিশ্বাসে রাখছি যে, আপনাদের কংগ্রেস এই বিষয়টাকে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করবে কারণ আপনারাই এই ধাক্কাকে প্রত্যক্ষ্যভাবে অনুভব করেছেন।

আপনাদের কংগ্রেস এমন একটা সময় অনুষ্ঠিত হচ্ছে যখন বিশ্ব পরিস্থিতি ২০১২ সালে অনুষ্ঠিত রিমের পার্টি ও সংগঠনগুলির বিশেষ অধিবেশনের প্রস্তাবের প্রতিটি কথাকে সঠিক বলে প্রমাণ করছে। ঐ প্রস্তাবে বলা হয়েছে যে, " সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়নের ধ্বংসাত্মক প্রভাব, আগ্রাসী যুদ্ধ এবং সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থার বিধ্বংসী অর্থনৈতিক সংকট এবং সর্বহারা ও ব্যাপক জনগণের উপর এই সংকটের প্রভাব সারা দুনিয়াজুড়ে সংগ্রাম ও বিদ্রোহের একটা ঢেউকে জাগিয়ে তুলেছে। এই প্রেক্ষাপটে বিশ্ব সর্বহারা বিপ্লবের শক্তিশালী সম্ভাবনাময় এক নতুন তরঙ্গের উত্থান হচ্ছে ও বিকশিত হচ্ছে, যার ভরকেন্দ্র ও রণনৈতিক নোঙর হিসাবে কাজ করছে মাওবাদী পার্টিগুলির পরিচালিত জনযুদ্ধগুলি"। বিশ্বজোড়া আর্থিক সংকট সাম্রাজ্যবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে এক মন্দার মধ্যে এনে ফেলেছে। চিন ও ভারতের মত তৃতীয় বিশ্ব শক্তিগুলি, যাদের সম্পর্কে ভাবা হয়েছিল যে এরা সংকটের প্রভাব থেকে বেঁচে যাবে তারাও মন্দার কবলে পড়েছে। সারা দুনিয়াজুড়ে প্রতিক্রিয়াশীল শাসকরা সংকটের গোটা বোঝাটা জনগণের কাঁধে ফেলেছে। এবং সারা দুনিয়াজুড়ে একের পর এক দেশে জনগণ রাস্তায় নেমেছেন এই আক্রমণকে প্রতিহত করা ও পাল্টা আক্রমণ করার জন্য। যেখানে এমনকি কয়েক দশকের পুরোনো একনায়কতন্ত্রকে টেনে নামানো হয়েছে সেই আরব বিদ্রোহ সহ জনগণের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামগুলির ভেতর থেকে ছুরি মারা হয়েছে। এই সমস্ত বিদ্রোহগুলি আমূল বিপ্লবী পরিবর্তন অর্জন করতে ব্যর্থ হয়েছে। এই ব্যর্থতাগুলিকে হাতিয়ার করে শোধনবাদী ও গোঁড়ামিবাদীরা তাদের হতাশাবাদী সিদ্ধান্তগুলিকে সঠিক প্রমাণ করতে চাইছে। কিন্তু, মাওবাদীরা এই বিরাট আলোড়নের মধ্যে বিপ্লবের কার্যকরী সম্ভাবনাময় শক্তিকে দেখেন। কথায় ও কাজে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-মাওবাদের পতাকাকে উর্ধ্বে তুলে ধরে এই সম্ভাবনাকে উন্মুক্ত করার বিরাট দায়িত্বকে তাঁরা উপলব্ধি করেন।

গোটা দুনিয়ার জন্য যেটা সত্য সেটা দক্ষিণ এশিয়ার ক্ষেত্রেও সত্য। এই অঞ্চলে ভারতীয় সম্প্রসারণবাদই হলো প্রতিক্রিয়ার প্রধান স্তম্ভ। যেহেতু মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ একে খোলাখুলি মদত করছে সেজন্য ভারতীয় সম্প্রসারণবাদ আরও বেশি উগ্র ও আক্রমণাত্মক হয়ে উঠেছে। এটা খুবই সুস্পষ্ট যে, নেপালের রাজনৈতিক ব্যাপারে ভারতীয় সম্প্রসারণবাদীদের হস্তক্ষেপ এবং আপনাদের দেশের বিরুদ্ধে তারা যে সমস্ত অপরাধ সংঘটিত করেছে ও করছে তা ক্রমাগত বাড়ছে। দক্ষিণ এশিয়ার জাতিসত্তাগুলি ও জনগণের উপর ভারতীয় সম্প্রসারণবাদ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিকভাবে আধিপত্য করে। সাম্প্রতিককালে, ভারতীয় আমলাতান্ত্রিক পুঁজির স্বার্থকে সুরক্ষিত করার জন্য মালদ্বীপ সরকারের উপর ভারতীয় সম্প্রসারণবাদীদের পেশি প্রদর্শন এর একটা উদাহরণ। তাদের প্রতিক্রিয়াশীল চরিত্রের আর একটা দিক হলো ভারতের মধ্যে ভারতের শাসকশ্রেণির ক্রমবর্ধমান শোষণ ও দমন। সি পি আই (মাওবাদী) পরিচালিত জনযুদ্ধকে ধ্বংস করার জন্য তারা বিরাট আকারে "জনগণের বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ" শুরু করেছে সেটাই তাদের ক্রমবর্ধমান দমনের ভরকেন্দ্রে রয়েছে। এর কারণ হলো বিশ্বায়নের স্বার্থে আরও বেশি বেশি করে সাম্রাজ্যবাদী ও আমলাতান্ত্রিক পুঁজিবাদী অনুপ্রবেশের জন্য এদেশের দরজা আরও হাট করে খুলে দেবার ভারতীয় শাসকশ্রেণির পরিকল্পনার পথে সবচেয়ে বড় বাধা হিসাবে রয়েছে এই বিপ্লবী যুদ্ধ। ভারতের মধ্যে ও আশেপাশের দেশে ভারতের শাসকশ্রেণির শোষণ ও দমন সবসময়ই জনগণের দিক থেকে আরও তীব্র প্রতিরোধ তৈরি করেছে এবং আগামী দিনেও এটাই হবে। এর পাশাপাশি ভারতের আশেপাশের দেশের জনগণের তাঁদের দেশের শাসকশ্রেণির উপর গভীর ক্ষোভ আগামীদিনে দ্বন্দ্বগুলিকে আরও তীব্র করবে এবং বিপ্লবের জন্য জমি প্রস্তুত করবে।

আজকের দিনে দক্ষিণ এশিয়ার পরিস্থিতিকে বিচার করার সময় একটা নতুন বিষয়ের দিকেও আমাদের নজর দিতে হবে – ভারতীয় সম্প্রসারণবাদ (মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের মদতপুষ্ট) এবং চিনা সম্প্রসারণবাদের দ্বন্দ্ব। এটা কেবলমাত্র দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই, এটা দক্ষিণ পূর্ব এশিয়াতেও ছড়িয়েছে। এই অঞ্চলে ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকায় চিনের দিক থেকে যেকোন সম্ভাব্য বিপদকে মোকাবিলা করে নিজের আধিপত্যকে বজায় রাখা ও শক্তিশালী করার মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের রণনৈতিক পরিকল্পনার সাথে সম্পর্কিতভাবেই চিন ও ভারতের সম্প্রসারণবাদীদের এই বিরোধকে বিচার করতে হবে। দক্ষিণ এশিয়ার পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে, এই বিরোধ ছোট দেশগুলির মুৎসুদ্দি শাসকদের সামনে ভারতীয় সম্প্রসারণবাদীদের সামনে মাথা তোলার ও আরও জোরালো দর কষাকষির সুযোগ তৈরি করেছে। এটা ভারতের রাষ্ট্রের সামনে কিছু সমস্যা তৈরি করেছে এবং তাদের কিছু পরিকল্পনা মাঠে মারা গেছে। সেই মাত্রা অব্দি দক্ষিণ এশিয়ার জনগণ ভারতীয় সম্প্রসারণবাদের বিরুদ্ধে তাঁদের সংগ্রামে এই দ্বন্দ্বকে পরোক্ষভাবে ব্যবহার করতে পারেন। কিন্তু, মাও সে তুংয়ের শিষ্য হিসাবে আমাদের কখনোই ভোলা উচিত নয় তাঁর এই শিক্ষা : "সামনের দরজা দিয়ে বাঘ তাড়িয়ে দেবার সময় পিছনের দরজা দিয়ে নেকড়ে ঢোকার বিপদ সম্পর্কে সতর্ক থাকুন"। অন্য যেকোন মুৎসুদ্দি রাষ্ট্রের মতই চিনা শাসকশ্রেণিও একই রকম প্রতিক্রিয়াশীল। তাদের ইতিহাসও অন্যান্য শাসকদের মতই রক্তমাখা। ১৯৭৬ সালে সামরিক অভ্যুত্থানের পর তারা চিয়াং চিং, চ্যাং চুন চিয়াওয়ের মত সাহসী যোদ্ধা সহ হাজারে হাজারে মাওবাদীদের জেলে পুরেছিল ও খুন করেছিল। যখন তারা হাজার হাজার কোটি টাকা কামাচ্ছে তখন চিনা জনগণের ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ দারিদ্রের মধ্যে পচে মারা যাচ্ছে। এরকম অমানবিক অবস্থার বিরুদ্ধে জনগণের বিদ্রোহকে পাশবিক শক্তি দিয়ে দমন করা হচ্ছে। চিনা রাষ্ট্রের দ্বারা চাপিয়ে দেওয়া ও রক্ষা করা সর্বাধিক দমনমূলক শ্রম সম্পর্কের মধ্যে চিনা জনগণ বাধ্য হচ্ছেন সাম্রাজ্যবাদী বহুজাতিক সংস্থার দাসত্ব করতে। নিশ্চিতভাবেই, এই "নেকড়ে" কখনোই কোন দেশের বিপ্লবী জনগণের প্রকৃত বন্ধু হতে পারে না। আজকে এই বিষয়ে মাওবাদীদের সুস্পষ্ট ধারণা থাকাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং জনগণকে এই বিষয়ে শিক্ষিত করতে হবে। সত্তর ও আশির দশকে পূর্বতন সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদীরা কূটনৈতিক ও বস্তুগত সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবার নামে বিভিন্ন বিপ্লবী সংগ্রামগুলিতে অনুপ্রবেশ করেছিল এবং সেগুলিকে ভিতর থেকে ধ্বংস করেছিল। আগের ঐ সমস্ত তিক্ত অভিজ্ঞতাগুলি আমাদের এই শিক্ষা দেয় যে, সম্প্রসারণবাদীদের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব যখন বেড়ে চলেছে সেরকম পরিস্থিতিতে আজকের দক্ষিণ এশিয়ায় আমাদের রণনীতি ও রণকৌশল ছকে নেবার গোটা কাজে মাওয়ের সতর্কবাণীকে আমাদের পথপ্রদর্শক হিসাবে নিতে হবে।

বিপ্লবের সম্ভাবনা উজ্জ্বল। কিন্তু, মাওবাদীদের বিষয়গত শক্তির দূর্বলতাটা চোখে পড়ার মতো। তাদের আন্তর্জাতিকতাবাদী সংগঠন বিপ্লবী আন্তর্জাতিকতাবাদী আন্দোলন (রিম) এবং দক্ষিণ এশিয়ার মাওবাদী পার্টি ও সংগঠনগুলির কোঅর্ডিনেটিং কমিটি (কমপোসা) নিস্ক্রিয় হয়ে গেছে। রিম ধ্বংস করার কাজে প্রচন্ড–বাবুরাম চক্রের সাথে যোগ দিয়েছে বব আভাকিয়ানের শোধনবাদ। প্রতিক্রিয়ার কাছে খোলাখুলি আত্মসমর্পণ করার জন্য প্রচন্ড-বাবুরাম চক্র পুরোদস্তুর নাঙ্গা হয়ে গেছে। কিন্তু, অনেকেই আভাকিয়ানের মার্কসবাদ–লেনিনবাদ–মাওবাদ পরবর্তী সংশোধনবাদের দ্বারা বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছেন কারণ এই শোধনবাদ বড় বড় মার্কসবাদী শব্দের ফুলঝুরির ছদ্মবেশে এসেছে। কিন্তু, বাস্তবটা হলো এই যে, এই শোধনবাদ কোন অংশেই কম বিপদজ্জনক নয়। এই শোধনবাদ আন্তর্জাতিক কমিউনিষ্ট আন্দোলনের পরিচালক মতাদর্শ হিসাবে আভাকিয়ানবাদকে চাপিয়ে দিতে চায় এবং এভাবে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-মাওবাদের ভিত্তিকে ধ্বসিয়ে দিতে চায়। সুতরাং আজকে প্রকৃত মাওবাদীদের সামনে কর্তব্য হলো এই দুই ধরনের শোধনবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে আন্তর্জাতিক সংগঠনকে পুনরায় সংগঠিত করা।

অতীতে আপনাদের পার্টি আন্তর্জাতিকতাবাদী বন্ধনকে শক্তিশালী করা এবং রিম ও কমপোসা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে বড় আকারে অবদান রেখেছিল। এই আন্তর্জাতিকতাবাদী মাওবাদী সংগঠনগুলি "একই চিন্তার মানুষদের" ঐক্যের মধ্যে দিয়ে একটা বাস্তবতা হয়ে উঠেছিল। ফাঁকা প্রস্তাব নেবার দোকানের বদলে তারা সচেতনভাবে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-মাওবাদকে উর্ধ্বে তুলে ধরেছিল এবং বিপ্লবকে সাহায্য করেছিল। এর কারণ ছিল তাদের সাধারণ মতাদর্শগত ভিত্তি। আমরা কখনোই এই মূল্যবান শিক্ষাকে ভুলে যেতে পারি না। আজকে সারা দুনিয়াজুড়ে বিভিন্ন প্রগতিশীল, গণতান্ত্রিক শক্তি ও প্রবণতাকে দেখা যাচ্ছে যারা সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়ন, বিশেষ করে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতা করছেন। এটা বিভিন্ন মাত্রার ও রূপের ব্যপকতর ঐক্য গড়ে তোলার ভিত্তি যোগাচ্ছে। কিন্তু, এটা মাওবাদীদের আন্তর্জাতিক সংগঠনের বিকল্প হতে পারে না। বাস্তবত, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধি শক্তিদের ব্যপকতর ঐক্যের জন্যই প্রয়োজন মাওবাদী আন্তর্জাতিক সংগঠনের অগ্রণী ভূমিকা। এই সুযোগে আমরা পুনরায় রিমের পার্টি ও সংগঠনগুলির ২০১২ সালের বিশেষ অধিবেশনে গৃহীত আহ্বানকে আপনাদের সামনে উপস্থাপিত করছি – "আজকের দিনে রিমের সংকট ও ভেঙে পড়ার মুখে দাঁড়িয়ে আমাদের অবশ্যই রিমের ইতিবাচক ও নেতিবাচক অভিজ্ঞতাগুলির ভিত্তিতে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী-মাওবাদী পার্টি ও সংগঠনগুলির আন্তর্জাতিক সংগঠনকে নতুন করে গড়ে তুলতে হবে। বর্তমান পরিস্থিতি আমাদের সামনে এই দাবি তুলে ধরে যে, রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক উল্লম্ফন অর্জনের জন্য সমস্ত মাওবাদী পার্টি ও সংগঠনগুলিকে এই নতুন আন্তর্জাতিক সংগঠনে ঐক্যবদ্ধ করতে হবে। নতুন শতাব্দীর শ্রেণি সংগ্রামের সামনের সারিতে কমিউনিষ্ট আন্দোলনকে প্রতিষ্ঠা করতে হলে এটা প্রয়োজন"। ব্যাপকতর ঐক্যের প্রয়োজনটাকে মাথায় রেখে এই প্রস্তাবে চিহ্নিত করা হয়েছে – "সর্বহারা ও নিপীড়িত জনগণের আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী জোটের বা ফ্রন্টের কেন্দ্র হলো এবং হওয়া উচিত মার্কসবাদী–লেনিনবাদী-মাওবাদী কমিউনিষ্টদের আন্তর্জাতিক সংগঠন"।

প্রিয় কমরেডগণ,

আমরা আশা করি যে আমরা আপনাদের খুব একটা সময় নিইনি। নেপাল ও গোটা দুনিয়ার কমিউনিষ্ট ও বিপ্লবী জনগণ অনেক আশা নিয়ে আপনাদের দিকে তাকিয়ে আছে। আশা করি আপনারা এই কংগ্রেসকে আপনাদের পার্টির ও আন্তর্জাতিক মাওবাদী আন্দোলনের নির্ধারক মূহুর্ত করে তুলবেন। আপনারা যে কর্তব্য হাতে তুলে নিয়েছেন তার সাফল্য কামনা করে আমরা আমাদের বার্তা এখানেই সমাপ্ত করছি।

কমিউনিষ্ট অভিনন্দন সহ,

ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি (মার্কসবাদী-লেনিনবাদী)

কেন্দ্রীয় সংগঠনি কমিটি, ৯ই জানুয়ারী, ২০১৩